শতবর্ষের
শ্রেষ্ঠ প্রেমের কাহিনী

সম্পাদনা

তুষারকান্তি পাণ্ডে এম. এ. (ডবল)

ও

ডঃ আশা দেবী পি. এইচ. ডি

পরিবেশক : গ্রন্থনা

৮/বি কলেজ রো

কলিকাতা-৯

প্রকাশক : অন্বেষা
৫২/১ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

অলঙ্করণ—পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম প্রকাশ—বড়দিন ১৯৬২

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রণবেশ কুমার জানা
কমলা প্রেস
৭/৮, নারকেল ডাঙা মেন রোড
কলিকাতা-১১

॥ সূচীপত্র ॥

প্রসঙ্গ : দেশ বিদেশের প্রেমের গল্প—সম্পাদক

"পরাণ কান্দে বঁধু তোমা না দেখিয়া
অন্তরে দগধে প্রান বিদরয়ে হিয়া"

"নব নীবিবন্ধ খসাওল কান।
তোহর শপথ হম কিছু যদি জান ॥ ৪ ॥"

"ন জানিয় পেমরস নহি রতিরঙ্গ।
কৈসে মিলব হম সুপুরুখ সঙ্গ ॥ ১ ॥"

প্রসঙ্গঃ দেশ বিদেশের প্রেমের কাহিনী

প্রেমের গল্পে যে বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে প্রেমের অভাব। প্রেমের গল্পে প্রেমের অভাবই সর্ব্বকালে ও সর্ব্বযুগে গল্পের প্রধান উপজীব্য। যে গল্পে প্রেমের স্বাভাবিক বিকাশ ও সমাপ্তি তাকে আর যাই বলা যাক প্রেমের গল্প বলা যাবে না। প্রেমহীনতাই প্রেমের গল্পের একমাত্র ও প্রধানতম পাথেয়।

বিরহের বেদনাই প্রেম। আর এই বেদনামণ্ডিত প্রেম অভিজ্ঞতাই প্রেমের গল্পের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রায় সার্ধ সহস্র বৎসর পূর্বে জনৈকা জাপানী লেখিকা মুরাসাকি "টেলস অব গেঞ্জি" নামক যে গল্প লেখেন সম্ভবতঃ তা আমাদের পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম ছোট গল্প। আর এই প্রথম ছোট গল্পের মূল উপজীব্য হচ্ছে প্রেম।

তবে এর আগে অনেক গল্পই বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আসন লাভ করেছে তাতে প্রেম বা প্রেমের নানা বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি মুখ্য ভূমিকা গ্রহন করেছে। আরব্য উপন্যাসে বা আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে যে সব গল্প বিশেষ করে আদিরসের কাহিনী আছে তাতে প্রেমের গল্পের স্বাদ বর্তমান। তবে এই গল্পগুলি সাধারণতঃ কোন বস্তু

কাব্যের অন্তর্গত ও তা Digression হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী আমাদের মহাকাব্যের আদি প্রেমিকাগণ যাঁরা প্রেমের তাড়নায় রাজবাড়ীর নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে নির্ব্বাসিত স্বামী (প্রেমিক) অথবা মৃত স্বামী (প্রেমিক) এর সহগামী হয়ে ধন্য হয়েছেন। শকুন্তলা তার বাল্য প্রেমের অগ্নিশিখায় ঋষি কন্যার মান, সম্মান ও মর্য্যাদাকে ভূলুন্ঠিত করে আত্মসমর্পণ করেছেন এক বাসন বিলাসী শিকারী রাজকুমারের নিকট। ফলে যে অবজ্ঞা অগ্নিপরীক্ষা অতিক্রম করে তাঁকে খামখেয়ালী রাজকুমারকে পেতে হয়েছে তা আজকের দিনে অচিন্তনীয়। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের কাব্যকলায় মেঘমেদুর পরিবেশে যে প্রেমের বর্ণনা তা-ও ত এই বিরহী যক্ষের বেদনা ভরা অশ্রুসজল চক্ষের কথাই আমাদের স্মরণ করায়। তাইত বলি যে সার্থক প্রেমের গল্পে যা একান্ত ভাবে অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক বস্তু তা হচ্ছে বেদনা ও বিরহ। অর্থাৎ প্রেমবঞ্চনাই প্রেমের গল্পের অপরিহার্য অঙ্গ।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমে যে সামাজিক বাধা, নৈতিক নিষেধ ও কুলত্যাগিনীর অবমাননা এ সব কিছুই পাঠক পাঠিকার নিকট রাধিকাকে প্রেমিকা হিসাবে অসাধারন আকর্ষন ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

তাই প্রেমের উদ্দামতা ও দুর্নিবার আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ মহিমায় সমুজ্জল। পৃথিবীতে যত প্রেম উপাখ্যান আছে যত প্রেমের বর্ণনা আছে সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মনোমুগ্ধকর, বৈচিত্র্যময় ও অবিস্মরণীয়। তাই কালের যাত্রা পথে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের প্রেম কাহিনী বিশ্বসাহিত্যের যে কোন প্রেম কাহিনীকে অতিক্রম করে গেছে।

লায়লা মজনু, রোমিও জুলিয়েট, কচদেবযানী অথবা লেডী অব দি শ্যালটের প্রেম গাথা নিঃসন্দেহে কালের জয়যাত্রায় জয়ী হয়েছে। তবে সাহিত্যের রসে জারিত হয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেম তার বর্ণ বৈচিত্র্যের বর্ণালী সমাবেশে রাধার কামবেগ তাড়িত হয়েও লেখার প্রসাদগুণে কালক্রমে কামগন্ধহীন ঈশ্বরীয় প্রেমে পর্যবসিত হয়েছে।

তবে আধুনিক ছোট গল্পের যে ধারা ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরম্ভ হয়ে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে পূর্ণতা লাভে ধন্য হয়েছে তাতে প্রেমের গল্প ও প্রেমকে উপজীব্য করে গল্পের বিন্যাস এক অভিনবরস সমৃদ্ধি লাভ করেছে। আজকের দিনে প্রেমের গল্প ছোট গল্পের আঙ্গিকে ধরা দিলেও প্রেম ও প্রেমোপাখ্যান সর্বকালের সর্বযুগের সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই যুগে যুগে দেশে ও বিদেশে যে সব মহাকাব্য লিখিত হয়েছে তার মূল বা কেন্দ্রানুগ

বিষয় হচ্ছে প্রেম। নর নারীর প্রেম। মানব মানবীর প্রেম। কখন সখনও মানব মানবীর বিপরীতে এসেছে দেবতা বা দেবারিগণ। তাইত দেখি আমাদের রামায়ণ কাহিনীর শুরু সূর্পনখার লক্ষ্মণ প্রীতির মধ্যে।

রাক্ষস তনয়া প্রথম দর্শনেই ভালবাসলেন দেবসন্তান লক্ষ্মণকে। রাক্ষসীর সাথে দেব সন্তানের এই অসবর্ণ প্রেম পরিণতির পথ পেল না; মহাযুদ্ধের পথে প্রেম বিপর্যস্ত হল

রাম, রাবণ ও সীতা এ সবই নর নারীর প্রেম-সম্পর্কের নানা জটিল কমপ্লেক্সের এক বিপর্যয়কর প্রকাশ।

তা ছাড়া ইলিয়াড ওডেসার কাহিনীর মূলসুরও এই প্রেম। নারী প্রীতি। সত্যিকথা বলতে কি যুদ্ধ চলাকালেও গ্রীক ও ট্রোজান রণশিবিরে যা সব থেকে অধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করেছিল তা রণদামামা যতখানি প্রেমবন্যা তার চেয়েও অনেক বেশী।

ক্যাসান্দ্রার ভবিষ্যতবাণী, হেক্টরের নিষেধ কোন কিছুইত প্রেম বিলাসী প্যারিসকে হেলেনের প্রেমের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে নি। "The face that launched thousand ships" একটি সুন্দর নারীর মুখ কি বিপর্যয়কর পরিণতির মাধ্যে একটি সাম্রাজ্যের পতন ঘটাতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হেলেন অব ট্রয় এর যুদ্ধ। প্রেমের আবেদন চিরায়ত—চিরন্তন। প্রেম আছে নিরবধিকাল। নরনারীর প্রেম সেই অনন্ত কাল ধরে আদিরসের ভাণ্ডারকে উজার করে এগিয়ে চলেছে। সমাজ সংস্কার, লজ্জা, আবরণ ও আভরণ এসবই প্রেমিক প্রেমিকাকে আরও মোহময়ী ও আবর্ষণীয় করে তুলেছে। তাই যুগে যুগে প্রেমের বেদিতে মানব মানবী আত্মাহুতী দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "যে প্রেম উদ্দাম বেগে নরনারীকে চারিদিকের সহস্র বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, তাহাদিগকে সংসারের চিরকালের অভ্যস্ত পথ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়।" নরনারীর প্রেম ও দৈহিক আকর্ষণ এমন এক দুর্লঙ্ঘ্য দুরতিক্রম্য যা অনেক সময় সমাজ সংস্কার ও আপনজনের নিষিদ্ধ রক্ত সম্পর্কের গণ্ডীর মধ্যেও সঙ্ঘটিত হয়ে যায়।

তাই গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের "ইডিপাস" নাটকের ঘটনা বিন্যাসে মাতা পুত্রের প্রেম ও দৈহিক মিলনও বিজ্ঞান ভিত্তিক এক সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে গেছে।

এ ছাড়া 'ইলেকট্রা'র মধ্যে এক নাগিনী কন্যার যে প্রেমের ফাঁদ তাও আমাদের চমৎকৃত করে।

প্রখ্যাত গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডিসের 'মিডিয়া'তে এক বন্যরমণী তার প্রেম পিপাসা ও দুরন্ত দৈহিক আবেগের তাড়ণায় বিধর্মী ভিন্নদেশী পলাতক রাজকুমারকে প্রেমিক হিসাবে কেবল বরণই করে নি, তার স্বজাতি ও স্বউপজাতি যারা তার

রাজ্য উদ্ধার করে দিয়েছে। কিন্তু যখন রাজপুত্র রাজ্য ফিরে পেয়ে বন্য রমণীকে রাজকীয় অবহেলায় ত্যাগ করতে উদ্যত তখন প্রতিশোধের আগুনে রাজকুমারের ঔরষ জাত নিজগর্ভজাত সন্তানদের নিষ্ঠুর নিধনের মধ্যদিয়ে ভয়াল জিঘাংসা প্রতিশোধের পথ পায়।

এখানে মাতৃত্বের প্রবল আকর্ষণও প্রেম বঞ্চিতাকে কোন শান্তিবারি সিঞ্চন করতে পারে নি। ফলে মাতৃত্বের পরাভব ঘটে দৈহিক প্রেমের যূপকাষ্ঠে। যদিও আমাদের পারিপার্শ্বের সমাজে এ ঘটনার জিঘাংসার তুলনা সাধারণত খুব কমই দেখা যায়। তবে প্রেমিকের আকর্ষণে নিজ সন্তান সন্ততি ত্যাগ করে সমাজচ্যুত হয়েও এক ধরণের সুখী জীবন যাপন আমাদের পরিচিত পরিজনদের মধ্যেও হয়ত কখনও সখনও দেখা যায়।

আর আমাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা পাই তাওত কোন কুমারী মেয়ের শকুন্তলা সুলভ নিষ্পাপ প্রথম প্রেম নয়।

রাধিকা এক নামী লোকের মেয়ে আর এক সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ। কিন্তু সমস্ত সমাজ সংস্কার ও পাপাপাপের ঊর্দ্ধে উঠে একমাত্র দৈহিক সম্ভোগের তাড়নাতেই গোপ বালকের প্রেমে পাগল হয়েছে।

অর্থাৎ কিনা এক বিবাহিতা নারী বিনা দোষে তাঁর স্বামীর সোহাগের, সম্পদের সুরক্ষিত প্রাসাদ ত্যাগ করে কি যেন কিসের টানে পরপুরুষের প্রেমে পাগল হল। এ প্রেম কেবল নিষিদ্ধই নহে। এর মধ্যে যে উদ্দাম ব্যাভিচারের পূর্ণায়ত প্রকাশ তা আধুনিক সাহিত্যেও সহজ লভ্য নহে। রাধিকার স্বামী আয়ান ঘোষ তেজে বীর্যে সৌন্দর্যে সম্পদে সম্ভ্রান্ততায় ও জীবনের সর্বাঙ্গীন সাফল্যে অতুলনীয় হওয়া সত্ত্বেও কেবল মাত্র পৌরুষত্ব হীনতায় হীনমন্য হয়ে উঠেছে। একটি বিশেষ রিপু ও বিশিষ্ট অনুভূতিকে কেন্দ্রকরে সবকিছু আবর্ত্তিত হয়েছে। যে রিপু ও অনুভূতির তাড়নায় বহু নরনারীই ঘরছাড়া ছন্নছাড়া হয়েগেছে, একেইত বলে প্রেম।

আর প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের আকুতির মধ্যে যুগে যুগে শিল্পী, সাহিত্যিক তথা সমাজ বিজ্ঞানীরা দেখেছে এক ঐশ্বরিক ঐকান্তিকতা। তাই প্রেম নানা জনের কাছে নানা ভাবে উপস্থিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতকের সাহিত্য সাধনায় প্রেম এক উল্লেখ্য সূচনা লাভ করে।

কিন্তু এ সূচনা পাশ্চাত্য সাহিত্যের ও শিক্ষার ফলশ্রুতি মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বের বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যে প্রেমের গল্পের বা উপাখ্যানের প্রচলন

নিতান্তই দুর্লভ। কারণ সামাজিক শাসন ও বিকৃত রুচিবোধ আমাদের সাহিত্যে প্রেম উপাখ্যানের স্বাভাবিক বিকাশে বিমুখ। তবে পূর্ব্বেই বলেছি যে প্রাচীন কাব্যে বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লেখা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যে রাধা কৃষ্ণের কাম সর্ব্বস্ব প্রেম কাহিনীও তার দুরন্ত আবেগ ও দুর্মদ প্রেরণায় ঐশ্বরিক প্রেমে উত্তীর্ণ হয়েছে।

পরকীয়া প্রেমের মধ্যেই সত্যিকারের প্রেমের গল্পের স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। প্রেম যখন তার স্বাভাবিক গতিপথ ত্যাগ করে বিপথে বিভুঁয়ে এগিয়ে যায় প্রেম তখনই আমাদের কল্পনাশ্রয়ী অনুভূতির আগল উন্মুক্ত করে এগিয়ে চলে। তবে আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা দিয়েই প্রেমের আবির্ভাব ঘটে। ধূর্যটিপ্রসাদ সত্যিই বলেন যে "বাংলাদেশে প্রেম নামক পদ্ধতিটি আবিষ্কার করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ......তারপর এলেন রবি বাবু। তিনি আমাদের সকলকে প্রেমে পড়তে শিখিয়েছিলেন। তারই ভাষা দিয়ে আমরা প্রেম করি তারই ভাব দিয়ে আমরা প্রেমে পড়ি।"

তাই মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা সাহিত্যে প্রেমের পাদটিকা রচিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবার প্রেমকে আশ্রয় করে গল্প বিন্যাস সৃষ্টি করলেন। কিন্তু কখনও প্রচ্ছন্নভাবেও বিধবার প্রেমকে প্রশ্রয় দেন নি। আর তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকগণের ত কথাই নেই। বৈধব্যের একমাত্র বিধান কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন। আর বিবাহিত রমণীর পরকীয়া প্রেমও কঠোরভাবে দণ্ডনীয় অপরাধ ও নিষিদ্ধ বস্তু। কি সমাজে কি সাহিত্যে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতেও যেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব তার নায়ক নায়িকার গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণের নিগরে আবদ্ধ করে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের তিন সঙ্গী, নষ্টনীর, চারঅধ্যায় প্রমুখ নানা গল্পে আপনজন ও আত্মীয় স্থানীয় জনের সাথে নিষিদ্ধ ত্রিকোণ প্রেমের বিন্যাস আমাদের সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের উপন্যাসের তুলনায় গল্পগুচ্ছের গল্পমালায় সামাজিক, অসামাজিক পরকীয়া বাল্যপ্রেম বা বিধবা প্রেম কোন বিষয়ই অস্পৃশ্য নহে।

পরবর্ত্তীকালে কল্লোল পর্বের লেখকগণের লেখায় বিশেষ করে অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখায় প্রেম, নিষিদ্ধ প্রেম, পরকীয়া প্রেম তার সমগ্র বিষয় বৈচিত্র্যআবেগ নিয়ে উপস্থিত হয়। শ্লীল ও অশ্লীলের সমস্ত কূট প্রশ্নকে যখন লরেন্স, এমিলি জোলা প্রমুখ সাহিত্যিকগণ

মন্তাৎ করে যথাক্রমে সনস্ অ্যাণ্ড লভার্স ইত্যাদি গ্রন্থ লিখে চলেছেন তখন আমাদের সাহিত্যেও তার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

দেহগত প্রেমের লীলাখেলায় এদের পথ ধরে আরও অধিক অগ্রসর হন অন্নদাশঙ্কর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকগণ।

তবে কল্লোল পর্বের লেখকগণ ছাড়াও কিছু দিকপাল প্রতিভাধর উত্তর ত্রিরিশে বাংলা সাহিত্যকে গল্পের ডালিতে সাজিয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। চল্লিশের দশকে শ্লীল ও অশ্লীলের বেড়া ডিঙ্গিয়ে যে সমস্ত কথাশিল্পী বঙ্গলক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে প্রেমের গল্পের ও সার্থক গল্পের ডালিতে সাজিয়েছেন তাঁরা হলেন সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্য সাধকগণ।

ফরাসী দেশে প্রেমের কাহিনীর স্ফুরণ ও প্রসার ঘটেছে সেই বালজাকের যুগ হতে। অবৈধ প্রেম ইউরোপিয় সাহিত্যে রাজসভা ও অভিজাত তন্ত্রের এক অবিমিশ্র আঙ্গিক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সে দেশের সাধারণ মানুষ সমাজ-সংস্কার ও চার্চের নির্দেশ ও আদেশ কায়মনবাক্যে মেনে প্রেম প্রীতি ও বিবাহকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তবে সে যুগে এবং এযুগেও যে জিনিস ঘটে চলেছে তা অর্থশালী অভিজাত শ্রেণীর মানুষের নৈতিক তথা সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা সম্বন্ধে অবহেলা। ফলে ফরাসী সাহিত্যের ন্যায় Restoration পর্বের নাটকে যার একান্ত প্রাদুর্ভাব তা হচ্ছে অবৈধ প্রেম, বিধবার প্রেম অথবা পরকীয়া প্রেম। ফরাসী ও রুশ সাহিত্যের ন্যায় ইংরাজী সাহিত্যেও কনগ্রেভ, সেরিডন, পোপ, প্রভৃতির লেখায় যে রস ও রঙ্গ তাতে পরকীয়া প্রেমের ইঙ্গিত সতত: বর্তমান। রুশ গল্পের টুর্গেনিভ, চেখব ও পুশকিন বিশ্ব সাহিত্যে প্রেমের গল্পের ক্রমবিকাশে এক উল্লেখ্য সংযোজন।

সেদিনের ফরাসী লেখক বালজাক, জোলা, মোঁপাসা, ফ্লবার্ট ও আজকের লেখিকা ফাঁসোয়া সাগার লেখায় প্রেম ও কাম অভিজ্ঞতার সুখানুভূতি পাঠক পাঠিকাকে মুগ্ধ করেছে।

নভোকভের লোলিতা, ডিএইচ লরেন্সের সন অ্যাণ্ড লাভার্স হতে আরম্ভ করে আজকের বহুল প্রচারিত মার্কিন হেডলী চেস বা নিক কার্টারেও যে প্রেমের ফাঁদ তা যেন রোমাঞ্চকর পরিবেশ সম্পর্কে ইঙ্গিতবহ হয়ে পাঠক চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

তবে বিদেশী প্রেমের গল্পের পটভূমিকায় যে সব কথা সব প্রথম আলোচনা হওয়া দরকার তা হচ্ছে ছোট গল্পের গতি প্রকৃতি ও স্ফুরণের ইতিবৃত্ত। বিশ্বসাহিত্যে ছোট গল্পের বিকাশে দুইজন দিকপাল গল্পকার স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা হচ্ছেন

রুশ গগোল ও মার্কিন অ্যালেন পো। জন্মলাভ উভয়ের ১৮০৯ খৃঃ। বালজাক, জোলা, ফ্লবার্ট, ছাড়াও ফরাসী সাহিত্যে মোঁপাসা প্রমুখ লেখকের আবির্ভাবে ছোট গল্প যে বেগ ও প্রবণতা লাভ করে তা প্রেমের গল্পের ভাণ্ডারকেও অফুরন্ত ডালিতে সাজিয়ে তোলে। তবে সমকালে ইংরাজী সাহিত্য রুশ ও মার্কিন সাহিত্যের ন্যায় ছোটগল্পে বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে না পারার পেছনে ভিক্টোরিয় ইংলণ্ডে উপন্যাসনামক এক অভিনব সাহিত্য মাধ্যমের যুগান্তকারী সাফল্য। বৃহদায়তন উপন্যাস প্রণয়নের দুর্বার প্রেরণা ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ ইলিয়ট, হার্ডি, জেনঅসটিন, মেরিডিথ প্রভৃতি সাহিত্যিকদের অধিক অনুপ্রাণিত করে।

তবে জ্ঞানস্থায়ী ও সংস্কার পন্থী ভিক্টোরিয় ইংরাজী সাহিত্যের অস্তাচলের সাথে সাথে ইংলণ্ডীয় ইংরাজী সাহিত্যে ছোট গল্পের যে পথ পরিক্রমা তাতে রুডিয়ার্ড কিপলিং, কোনানডয়েল, এইচ জি ওয়েলস, প্রমুখ উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেন।

আর ডি. এইচ. লরেন্স, ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড, জোসেফ কনরড, সমারসেটমম প্রমুখ গল্পকারগণ ইংলণ্ডীয় ইংরাজী প্রেমের গল্পে যে বিষয় বৈচিত্র্য ও আঙ্গিকের অভিনবত্ব দেখিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। প্রথম মহাযুদ্ধের অবক্ষয় ও হতাশাযুক্ত মুক্ত পৃথিবীতে যৌনতার মুক্তি ও স্বাভাবিক স্ফুরণ ও বিকাশে এঁদের ভূমিকা সত্যই উল্লেখযোগ্য।

বিশেষ করে সিগমণ্ড ফ্রয়েডের মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ আমাদের মনন ও চিন্তা-রাজ্যে যুগান্তকারী বিপ্লব সঙ্ঘটিত করে। ফলে ছোট গল্পের বিকাশ ও বিন্যাসেও তা যথেষ্ট ক্রিয়াশীল হয়। এ ছাড়া বার্নাডশ ও ইবসেনের নাটকগুলি ইউরোপিয় নারীমুক্তির আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

ফলে প্রেম, বিবাহ ও নারী ও নরের সম্পর্ক এক নতুন পথের দিশায়ী লাভ করে।

ইংরাজী ছোট গল্পের বিকাশে হাক্সলে, ভার্জিনিয়া উলফ, জেমস জয়েসের সাথে যে নাম সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বের সাথে উচ্চারিত হবে ও আজও হচ্ছে তা ডি, এইচ লরেন্স ও সমারসেট মম।

শেষোক্ত এই দুই লেখকের প্রেম ও যৌনতা যুগসঞ্চিত সংস্কারের নিগড় অতিক্রম করে প্রাণবন্ত জীবনমুখী গর্বোদ্ধত গতিবেগ লাভ করে।

ওধারে আটলান্টিকের ওপারে ও হেনরী, ফকনার এবং আর্নষ্ট হেমিংওয়ের বলিষ্ঠ লেখনী সঞ্চালন বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে প্রেমের কাহিনীকে এক অসাধারণ মহিমায় সমুজ্জ্বল করে তোলে। তবে আমাদের ভারতীয় সাহিত্যের অঙ্গনে বাঙ্গলা ছাড়াও

হিন্দি, উর্দু ও তামিল, সাহিত্যে যথাক্রমে, বিশেষ করে প্রেমচন্দ, কৃশনচন্দর, রাজেন্দ্র বেদী, ইস্মত চুগতাই, ডঃ ত্রিপুরাসুন্দরী ও অকুরায় নাগন প্রভৃতি লেখকগণ বেশ কিছু প্রেমের কাহিনী লিখেছেন যা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পরিবেশিত হওয়ার দাবি রাখে।

আমাদের সাহিত্যে কল্লোলকালের লেখায় যে নব চেতনার উন্মেষ তা অনেক অংশে লরেন্সের প্রত্যক্ষ প্রভায় প্রভাবিত। তাই বুদ্ধদেব বোসের রাতভোর বৃষ্টি, সমরেশ বোসের শাম্ব, বিবর বা প্রজাপতি শ্লীল অশ্লীলের সীমারেখাকে অতিক্রম করে মোরাভিয়ার উওম্যান অব রোম, নভোকভের লোলিতা, ফ্রাসোয়া সাগার সাগৈন স্টাইলের ন্যায় শিল্প সৌকর্য্যের দ্যোতক হয়ে উঠেছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পূর্বগোলার্ধের সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ও পশ্চিম গোলার্ধে গণতন্ত্র ও নারী-মুক্তি নরনারীর দৈহিক ও মানসিক সম্পর্কের দিগন্তরেখায় এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করেছে। ফলে আজকে সমস্যা সঙ্কুল, সমাজ চেতনা পুষ্ট ব্যক্তিস্বাধীনতাকামী মানুষের পৃথিবীতে যে নবচেতনার উন্মেষ দিকে দিকে দেখা যাচ্ছে তাতে ভাবীকালের গল্পকারগণ নিশ্চয় নরনারীর প্রেম ও ভালবাসাকে কেন্দ্র করে নতুন দিনের প্রেক্ষাপটে নতুন স্বাদের গল্পের জাল বুনবেন। এই প্রসঙ্গে আর অধিক অগ্রসর না হয়ে এবিষয়ে স্থানান্তরে বিস্তারিত আলোচনা করার দুরন্ত পিপাসা নিয়ে আজকের এই স্বল্প পরিসর নিবন্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। পাঠক পাঠিকাগণ এই নীরস আলোচনার বিরস মরু প্রান্তর পার হয়ে প্রেমের গল্প গুলির রসানুভূতিতে আপ্লুত হলে শ্রম সার্থক বোধ করব। শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কাহিনী, শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভৌতিক কাহিনী ও শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সরস গল্পের ন্যায় পাঠক পাঠিকাগণের সহৃদয় প্রশ্রয় লাভ করলে অধিক আনন্দিত হব।

বিনীত

তুষারকান্তি পাণ্ডে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

গল্প যখন সত্য হয়

শরৎচন্দ্রকে একটি গল্প লিখতে অনুরোধ করেছিল একটি মেয়ে। সনির্বন্ধ অনুরোধ। মেয়েটি কিন্তু কাল্পনিক। রবীন্দ্রনাথই তাকে কল্পনায় সৃষ্টি করে তার জবানীতে শরৎচন্দ্রের কাছে তাঁর নিজের অভিলাষের কথা জানিয়েছিলেন। আমার কাছে ওই রকমই একটি অনুরোধ নিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় একজন এসেছিলেন। কাল্পনিক নয়, সত্যিই রক্তমাংসের একটি মেয়ে। আমার সম্পূর্ণ অচেনা।

শরীরটা ভাল ছিল না। মাত্রাছাড়া লোডশেডিং-এ মনটাও ছিল



বিগড়ে। পশ্চিমের খোলা ছাদে এসে বেশ একটু অপ্রসন্ন মনেই বসেছিলাম।

এরই ওপর বাড়ির কাজের লোকটির কাছে কে একজন আমার সঙ্গে এই সন্ধ্যায় দেখা করতে এসেছেন খবর পেয়ে একেবারেই খুশি হতে পারলাম না। বিরক্তির স্বরেই জানাতে বললাম যে এ রকম অসময়ে আমার পক্ষে কারুর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়, যিনি এসেছেন তিনি

যেন আর কোন দিন সকালের দিকে দেখা করতে না আসেন আর আসবার আগে ফোন করে সময়টা ঠিক করে যেন।

আমার নির্দেশটা শুনেও আমার অনুচরটিকে কেমন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে বললাম, কি হল অমন করে দাঁড়িয়ে রইলি ?

আজ্ঞে—আমার অনুচর তার মনের কথাটা প্রকাশ করেই ফেলল, কতদূর থেকে এসেছে। ভদ্দর বাড়ির এমন সুন্দর মেয়েলোক। তাঁকে ফিরে যেতে বলব ? আপনি তো এমনি বসেই আছেন···

ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিতে পারতাম তা আর দিলাম না। ভদ্দর বাড়ির মেয়ে, আবার সুন্দর বলতে কি দেখে আমার অনুচরটির এত সহানুভূতি হয়েছে সে বিষয়ে একটু কৌতূহলই তখন জেগেছে।

ধমক না দিলেও গলায় একটু বিরক্তির সুরই রেখে বললাম, তা তোমার অত যখন ভক্তি তখন একটা চেয়ার এনে এখানে পেতে দাও। তারপর ডাক তাকে।

বাড়ির মধ্যে আলো না থাকলেও আমার এই খোলা ছাদে রাস্তার নিয়ন বাতির আলো একটু পাই। এদিকের ঘোড়ানো সিঁড়ি দিয়ে যিনি এরপর উঠে এলেন রাস্তার বাতির অপ্রচুর আলোতেই তাঁকে যেটুকু দেখতে পেলাম তাতে বুঝলাম আমার অনুচরের বর্ণনা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। এই নাতিস্পষ্ট দেখাতেই তাঁর দেহ-সৌষ্ঠবের সঙ্গে একটু কমনীয় আভিজাত্যের আভাস পেলাম।

আমার সামনে এনে রাখা চেয়ারটিতে তাঁকে বসতে বলার পর আমি আর কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, আপনাকে একটু বিরক্ত করছি জানি, কিন্তু আমার সমস্ত কথা শুনলে আশা করি আমায় ক্ষমা করতে পারবেন।

না ? ক্ষমা-টমা চাইবার মত অপরাধ আপনি কিছু করেন নি, আমি আলাপটা হালকা সহজ সুরে রাখবার জন্যে একটু হেসে বললাম, তবে দেখা করতে আসার আগে ফোন করে এলে আমার একটু সুবিধা হয়।

ফোন? ফোন তো আমি আপনাকে করেছি, ভদ্রমহিলা একটু ক্ষুব্ধ স্বরে তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

ফোন করেছেন? আমিও অবাক আর মনে করতে না পারায় একটু লজ্জিত। হ্যাঁ, পরশু বিকেল বেলায়। ভদ্রমহিলা আমায় মনে করিয়ে দিলেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই বলায় আপনি সঠিক তারিখ দিতে পারেন নি। হপ্তা খানেক বাদে আবার ফোন করতে বলেছিলেন। কিন্তু অত দিন অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আর আমার দেখা করতে চাওয়ার কারণটা একটু অদ্ভুত হলেও আমার দিক থেকে অত্যন্ত জরুরী বলায় দু' তিন দিন বাদে সন্ধ্যের দিকে এসে দেখা পান কি না দেখতে বলেছেন। নিশ্চিত কিছুর আশা অবশ্য আপনি দেননি। আমার আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয় বলে আমি আজ তাই ভাগ্য পরীক্ষা করতেই এসেছি।

প্রায় এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলার পর একটু থেমে মেয়েটি আবার বললে, আমার নামটাও চিনে যদি রাখেন এই আশায় আপনাকে জানিয়েছিলাম।

কথাগুলো শুনতে শুনতে সবই আমার তখন মনে পড়েছে। বিকেলের দিকেই ফোনটা এসেছিল ঠিকই, আমার এক নাতনী ফোনটি ধরে কে একজন অচেনা মহিলা আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন বলে আমায় ডেকে দিয়েছিল। কাগজে লেখা দু'পাতার নিজের লেখা গল্প কি কবিতা দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আকুল আবেদন কেউ করছে, অনুমান করে তারই উপযুক্ত যান্ত্রিক গলায় সারা দিয়ে ফোন ধরেছিলাম।

ও-প্রান্তের গলাটা শুনেই কিন্তু একটু চমকে উঠতে হল। গলাটি মধুর। কিন্তু শুধু মাধুর্য নয় তার আরো এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যাতে তার প্রতি একটু অতিরিক্ত মনোযোগ আপনা থেকেই আকৃষ্ট হয়। না, লেখা ছাপাবার বা দেখাবার অনুরোধ নয়, কথাগুলি যা শুনলাম সম্পূর্ণ আলাদা জাতের।

প্রথমে আমিই ফোনটা ধরেছি কি না জিজ্ঞাসা করে নিয়ে ও প্রান্তের মেয়েটি বললেন দেখুন, একটা বিশেষ কারণে আপনার সঙ্গে যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি দেখা করতে চাই। ভক্ত না হলেও আমি আপনার একজন অনুরাগী পাঠিকা। সেই হিসাবে দেখা করবার একটা দিন ও সময় জানাবেন কি ?

দেখা করবার প্রয়োজনটা যা-ই হোক তার জন্যে অনুরোধের ধরণটা ঠিক সাধারণ নয়। তাই গলাটা নেহাৎ যান্ত্রিক ও শুষ্ক না রেখেই বললাম, একেবারে সঠিক তারিখ আর সময় বলে দেওয়াও হপ্তাখানেকের আগে সম্ভব হচ্ছে না।

না, তাতে বড় বেশী দেরী হয়ে যাবে, ও প্রান্তের গলায় অধৈর্যের সঙ্গে একটু কাতরতাই যেন ফুটে উঠল।

একটু সহানুভূতির সঙ্গেই তাই জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা আপনার দরকারটা কি রকম তা একটু জানতে পারি ?

না। এবার শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে মেয়েটি জানালে, আমার যা দরকার তা সামনাসামনি ছাড়া বলা যাবে না।

তাহলে দু-চার দিনের মধ্যে সন্ধ্যের দিকে এসে খোঁজ করতে পারেন। বাড়িতে যে থাকবই সে কথা কিন্তু দিতে পারছি না। হয়তো ফিরেও যেতে হতে পারে। তা হোক—মেয়েটি মন স্থির করে নিয়েই জানালেন, দেখা না পেতে পারি জেনেও দু-চার দিনের মধ্যে আমি যাব। আমার নামটা হয়তো মনে থাকবে না তবু বলছি। মেয়েটি ফোনে জানালো নামটি। সমস্ত ঘটনার সঙ্গে এখন মনে পড়ায় আগ্রহ-ভরেই জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নাম তো অপালা।

আর আপনি কেন ? মেয়েটি প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, আমায় তুমি-ই বলুন। আর নামটা সেদিন অপালা বলেছিলাম বটে কিন্তু সেটা শুধু এই ভেবে যে নামটা মামুলী না হলে মনে রাখতে পারেন, আমার আসল নাম বিশাখা।

সেটাও তো খুব মামুলী নাম নয়। আপনি থেকে তুমি যাবার জন্যে দ্বিধাটা কাটাতে একটু থেমে তারপর বললাম, এটাও ঠিক নাম বলছ কি ?

হ্যাঁ ঠিক বলছি, বললে বিশাখা, আর আমি যে জন্যে এসেছি, তাতে নামের ঠিক বেঠিক কিছু আসে যায় না।

কি জন্যে এসেছ। সেইটেই তাহলে এবার শুনি। রাস্তার আলোয় বিশাখার মুখটার ওপরে যতটা সম্ভব ভালো করে লক্ষ্য রাখবার চেষ্টা রেখে বললাম।

বিশাখা কয়েক মুহূর্তের জন্যে একটু ইতস্ততঃ করল বটে কিন্তু তার পরে প্রায় সহজ শান্ত গলাতেই বললে, আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করতে এসেছি, আমায় নিয়ে একটা গল্প লেখবার জন্যে অনুরোধ।

মনে মনে হেসে একটু চুপ করে থেকে বললাম, তোমার বদান্যতার জন্যে ধন্যবাদ! কিন্তু এ রকম দয়া কেন? আমার গল্পের পুঁজি কি ফুরিয়ে গেছে মনে হচ্ছে?

এরকম রূঢ় বিদ্রূপে যতটা আহত হবে ভেবেছিলাম, বিশাখা তা কিন্তু মোটেই হল না। বরং অবিচলিতভাবে আমাকে উল্টে আঘাত দিয়ে বললে, অমন সস্তা নাটকের মার্কামারা লেখক চরিত্রের মত কথা বলছেন কেন? ও ধরণের কথা আপনার মুখে সাজে না।

এ আঘাতটা আমার প্রাপ্যই ছিল। তাই রাগ না করলেও সেটা সামলে উঠে উচিতমত কিছু বলার আগেই বিশাখা আবার বললে, আপনার কাছে আমার আসার কারণ এই যে এমন একটা জট আমার জীবনে পাকিয়ে গেছে যা খোলবার কোন উপায়ই আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি লেখক। অনেক রকম মানুষের অনেক রকম জীবনের জটিলতর টানা-পোড়েন দিয়ে আপনাকে গল্প বুনতে হয়। আমার জীবনের জটটা নিয়ে গল্প বুনতে বুনতে হয়তো আপনি জটের গেরোটা কি ধরণের আর তা খোলবার ফাঁসটা কোথায় বার করে ফেলতে পারেন। যে অনুরোধ আজ আপনাকে করতে এসেছি, তা যে কতখানি অন্যায় আবদার তা তো ভাল করেই বুঝি, তবু এমন সর্বনাশের মুখে আজ দাঁড়িয়েছি যে হয়তো আপনার কাছেই নিজেকে বাঁচাবার পথের দিশা পাব এই আশায় নিরুপায় হয়ে সাহায্য ভিক্ষা না করে পারছি না।

বিশাখার জীবনে কি জট যে পড়েছে তা জানি না তবে তার মনেও

সে জটের পাক যে লেগেছে তা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, নিজের কথাগুলোই সে ভাল করে গুছিয়ে বলতে পারছে না। তবু তার সমস্যাটা যে কাল্পনিক কিছু নয় তা বুঝে সহানুভূতির স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম, সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়েছ বলছ। কি সর্বনাশ তা একটু বোঝাতে পারো ?

পারি বোধ হয়। বিশাখা একটু চুপ করে থেকে চাপা কেমন একটু ধরা গলায় বললে, মেয়েদের জীবনে যার চেয়ে লজ্জার আর গ্লানির আর কিছু নেই আমার সেই পদস্খলনই প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এমন অবস্থায় আমি পোঁছেছি যে এ পরিণাম রোধ করবার চেষ্টাটুকু পর্যন্ত আর বোধহয় আমি করতে পারব না। কথাগুলো বলে বিশাখা আমার দিক থেকে মুখটা খানিকক্ষণ ফিরিয়ে রাখল। এরপর বেশ কয়েক মুহূর্ত সেও যেমন চুপ তেমনি আমিও।

বিশাখাই প্রথম মুখ ফিরিয়ে মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করলে, শুনবেন আমার কথা ? বললাম, শুনব। বল।

বিশাখা তার এখনকার সঙ্কট বোঝাতে তার সমস্ত জীবনের গল্পই আমায় সেদিন বলেছিল। রাত বেড়েছিল। লোডশেডিং শেষ হয়ে বাড়ির ভেতরে আলো জ্বলেছিল। আমরা কিন্তু ছাদ থেকে উঠিনি।

বিশাখা চলে গিয়েছিল রাত প্রায় দশটায়। তার আগে দীর্ঘ প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে সে তার জীবনের যত খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়েছিল এ কাহিনীর পক্ষে সে সব অবান্তর। সে বিবরণের সার কথা এই যে শিক্ষা-দীক্ষা চাল-চলনে আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল রেখে চললেও বিশাখার যে পরিবারে জন্ম তা ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত গোঁড়া ও রক্ষণশীল। স্কুল থেকে কলেজ-জীবন পর্যন্ত বিশাখা তাই এক কলেজে সাতায়াত ছাড়া স্বাধীনভাবে চলাফেরা বা সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশার কোন সুযোগ পায়নি। তবু এই বাঁধাবাঁধি নিয়মের জীবনেও মনে রঙ একবার একটু লেগেছিল।

যার সম্বন্ধে মনে রঙ লেগেছিল তার নাম অতীশ, সে বিশাখার দাদারই এক সহপাঠী। জ্ঞাতিত্বের একটু সম্বন্ধও তাদের পরিবারের

সঙ্গে আছে। তাই আসা-যাওয়া ও একটু-আধটু কথাবার্তা বলায় খুব বাধা-বন্ধ ছিল না, পাল্টা ঘর হিসেবে বিশাখার সঙ্গে তার বিয়ের সম্ভাবনার কথা গুরুজনদের নিজেদের মধ্যে আলাপে কখনো সখনো তার কানে এসেছে।

তার নিজের মনের রঙের কোন আভাস বিশাখা অবশ্য অতীশকে কোন দিন পেতে দেয়নি। এদিক দিয়ে অতীশের একদিনের একটি কথা শুধ্ মনে আছে। খুব মনে রাখবার মত কথা হয়তো নয়, তবু বিশাখার নিজের মনের রঙের দরুণই কথাটা তুচ্ছতার অনেক ওপরে উঠেছে।

বড় অভিধান এনসাইক্লোপিডিয়া ধরণের সব বই দাদার ঘরে থাকে। সেদিন সকালে সংস্কৃত অভিধানে একটা শব্দের সঠিক মানে জানবার জন্যে দাদার ঘরে গিয়েছিল। একটু চমকে উঠেছিল ঘরে ঢুকেই। দাদা ঘরে ছিলেন না। অতীশই একা ঘরের টেবিলে বসে কি লিখছিল।

ঘরে একা অতীশকে দেখে প্রথমে ফিরে আসতেই যাচ্ছিল, কিন্তু আসেনি। বইয়ের র‍্যাকগুলোর দিকে এগিয়ে গিয়েছিল এক রকম ধীর-স্থিরভাবেই।

অতীশ টেবিলের ওপরকার লেখা থেকে মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে বলেছিল, কি? অভিধান দেখতে তো? কোন্ কথাটা আটকাল এবার?

ভেতরে আড়ষ্ট বোধ করলেও বিশাখা প্রায় সহজ গলাতেই বলতে পেরেছিল, আপনাকে বলে কি হবে? আপনি কি সংস্কৃত কথার মানে পারবেন?

অতীশ দু'হাত তুলে যেন ভয়ের ভঙ্গি করে বলেছিল, রক্ষা কর! সংস্কৃতের অনুস্বর বিসর্গ দেখলেই আমার পেট কন্‌কন্ করে। তুমি অভিধানই দেখ।

একটু হেসে তাই দেখেছিল বিশাখা। শব্দটা দেখা হয়ে যাবার পর অভিধানটা বন্ধ করে র‍্যাকে-এ রাখবার সময় বেশ একটু অস্বস্তির সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিল যে অতীশ তার দিকেই চেয়ে আছে। সে চেয়ে থাকাটা যেন লক্ষ্য না করেই উঠে ঘর থেকে বেড়িয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াতে

অতীশ বলেছিল বিশাখা, তুমি এরকম বেগ্‌নি রঙের শাড়ি আর পরবে না, আমার ভাল লাগে না।

এরকম অদ্ভুত কথা অতীশ হঠাৎ বলতে পারে, ভাবতেই পারেনি বিশাখা। তার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল লজ্জায়, অস্বস্তিতে। দু-এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে থেকে সে তারপর ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল।

মনে যে স্বপ্নের আবেশটুকু লেগেছিল তা কিন্তু আর গাঢ় হতে পারেনি। তা ক্রমে ভেচেই গিয়েছিল চারিদিকের আঘাতে।

কিছুদিন বাদেই তার নতুন এক জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ হবার কথা শুনেছিল। সম্বন্ধ নাকি অত্যন্ত ভাল। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান প্রাচীন পণ্ডিত বংশ তো বটেই তার ওপর পাত্র নিজেই বংশের মুখোজ্জ্বল করা অত্যন্ত কৃতী পুরুষ। অধ্যাপনাই তার বৃত্তি। বয়স হিসাবে অধ্যাপকের অনেক উচ্চ পদে সে প্রতিষ্ঠিত।

এরকম একটা ভাল সম্বন্ধের সম্ভাবনা হওয়ার দরুণ অতীশের কথাটা চাপাই পড়েছিল একেবারে। নতুন পাত্রের চেনাশোনা আপনার জনেদের কারুর কারুর সঙ্গে বিশাখারও যোগাযোগ হয়েছে। তার সহপাঠিনীদের একজনই নতুন পাত্রের আত্মীয়-স্থানীয় হবার দরুণ খবরটা জেনে তাকে ঠাট্টা করেছে। কি রে দীনু গোঁসাইদের বাড়ির বৌ হচ্ছিস।

হ্যাঁ, হলামই না হয়। বিশাখাও ঠাট্টার সুরে বলেছিল, তাতে দোষটা কি ?

দোষ! সহপাঠিনী গলায় প্রতিবাদের সুর তুলে বলেছিল, ও-বাড়ির বৌ, অনেক পুণ্যিতে হয়। ওরা যেমন পণ্ডিত তেমনি নৈকষ্য কুলীন বংশ, শুধু আচার-বিচার নিয়ম নিষ্ঠার ঠেলা বড় বেশী।

তার মানে—বিশাখা ঠাট্টার সুরেই বলেছিল, যেন ঠাকুর ঘরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, অবস্থাটা এই রকম হবে কেমন ?

এক রকম তাই বলতে পারিস। সহপাঠিনী হেসে বলেছিল, ওদের

জ্ঞাতি-গোত্তর হয়ে আমরাই বলি যে ওরা টাকা-কড়িতো বটেই কাগজের নোট-টোটও গঙ্গাজলে না ধুয়ে শুকিয়ে সিন্দুকে তোলে না।

খুব ভাল খুব ভাল, বিশাখা হাসতে হাসতেই বলেছিল, ও-বাড়ির বৌ হলে কি করব জানিস, কারুর সঙ্গে প্রেম করে পালিয়ে যাব।

বিশাখার সেই বাড়িতেই শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়েছিল। আচার-বিচার নিয়ম-নিষ্ঠা বাড়াবাড়ি নিয়ে যা সব শুনছিল তা সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত রটনা বলে বুঝতে পেরেছে কিছু দিনের মধ্যেই।

কিন্তু তার স্বামী এ রকম সৃষ্টিছাড়া কেন?

এ বাড়িতে বিয়ে হবার আগেই অনেক কিছুই সে মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। মেনে, নিজেকে মানিয়ে নিয়েওছিল অনেকে কিছুতে আর তাতে খুব কষ্টও যে পেয়েছে তাও বলতে পারবে না মোটেই। শুধু তার স্বামীর বেলায় সব ধারণা কল্পনা নিষ্ঠুর ভাবে মিথ্যে হয়ে গিয়ে তার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সব সঙ্কল্পও চুরমার হয়ে যাবার অবস্থা হয়েছে।

স্বামী যেমন মহাপণ্ডিত তেমনি শুদ্ধ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান শাস্ত্রাচারী মানুষ বলে সে শুনেছিল। নিজেকে তাঁর সহধর্মিণী হবার মত করে তৈরি করে নেবে এ রকম একটা প্রতিজ্ঞাও করেছিল মনে মনে।

সত্যি কথা বলতে গেলে বিয়ের রাত্রে শুভদৃষ্টির সময় দেখে আশাতীত ভাবে ভাল লেগেছিল স্বামীকে। বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় চেহারায় সত্যিই সুপুরুষ। আপত্তিকর এক জোড়া ঝাঁপলা গোঁফ। মনে মনে তখনই ঠিক করেছিল ও-গোঁফ খুব বেশীদিন চক্ষুপীড়া হয়ে থাকতে দেবে না।

কিন্তু স্বামী ক্রমশ দুর্বোধ্য প্রহেলিকা হয়ে উঠে তার আশা আকাঙ্ক্ষা কল্পনা ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এক ঘরে একই ছাদের তলায় বাস করেও স্বামী যেন তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে ভিন্ন জগতের মানুষ।

ঘুমোতে বিশাখা চায়নি। ঘুমোয়ওনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত, কিন্তু স্বামীর স্নান সেরে আসতে অসম্ভব দেরী হয়েছে। সারাদিন ফুলশয্যার এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে শরীরের ওপর যে চাপ গেছে তাতে এক সময়ে

দু' চোখের পাতা আপনা থেকে গেছে জড়িয়ে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে জানতে পারে নি।

প্রায় শেষ রাত্রে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে দেখেছে সে প্রশস্ত বিছানায় গুটিসুটি পাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল বটে কিন্তু স্বামী বিছানায় শুতেই আসেননি। ঘরের এক ধারের একটি ডিভানে আধশোয়া অবস্থায় ঘুমেই চোখ বুজে আছেন মনে হয়। স্বামীর সঙ্গে তার এ দূরত্ব তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত আর ঘোচেনি।

স্বামী যেন দূরত্বটা বাড়াবার চেষ্টাই করেছেন ইচ্ছা করে। সকাল সন্ধ্যায় পূজা আহ্নিক যেন শেষ হতে চায় না। বিশাখার সঙ্গে দেখাই হয় নামমাত্র। কথাবার্তা দু-চারটের বেশী হয় না। সে কথাবার্তা নব বিবাহিতা স্বামী-স্ত্রীর বলে মনে করার কোন কারণ নেই।

আজ আর একটু চন্দন ঘষে রেখো শ্বেত আর রক্ত চন্দন দুই-ই। বিকেলে পাশের বাড়িতে আজ রামায়ণ পাঠ হবে। ইচ্ছে করলে পিসিমার সঙ্গে যেতে পারো।

এ রকম একটু আধটু আলাপের বেশী দুজনের মধ্যে আর কোন যোগাযোগই ছিল না। স্বামীর আপনার লোকজনের মধ্যেও এ ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা যে একেবারে হয়নি এমন নয়। আত্মীয় স্থানীয় বিশাখার সমবয়সী মেয়েদের একজন তো বলেই ফেলেছিল বিশাখার কাছে, বিয়ের পরই তো জগুদার পূজোপাঠ ধর্ম-কর্মের বাসনা কেন যে এত বেড়েছে জানি না ভাই।

ওই রকম আরেকটি সমবয়সী মেয়ে ঠাট্টাচ্ছলে যা বলেছে তাতে বিশাখা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায়নি। তার স্বামী নাকি বিয়ের আগে কবে জোর গলায় বন্ধুদের কাছে বলেছিল. প্রেম না করে সে বিয়ে করবে না।

মনের বিষাদটা যখন হতাশায় গিয়ে নামার আর দেরী নেই, তখনই সেই প্রথম চিঠিটা এসেছিল অজানা কারুর কাছ থেকে। চিঠিটা ইংরেজিতে লেখা। ছোট চিঠি, মাত্র ক' লাইনের—চিঠি না লিখে

পারলাম না বিশাখা, সব কিছু শূন্যময় হয়ে গেছে। এই শূন্যতা নিয়েই কি জীবন কাটবে।

বাড়ির ঝি দুপুরবেলা এ বাড়ির নিজস্ব ডাকবাক্স থেকে সব চিঠি এনে বড় দালানের একটি টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে রেখে যায়! বাপের বাড়ি থেকে কোন চিঠি এসেছে কিনা দেখতে গিয়ে ইংরেজিতে ঠিকানা লেখা চিঠি দেখে অবাক হয়েছে। ঘরে এসে চিঠি খুলে পড়ে কাঠ হয়ে গেছে ভয়ে। এ চিঠি যদি আর কারুর হাতে পড়ত!

কিন্তু এমন চিঠি কে তাকে লিখতে পারে?

ভাবতে গেলে একজন, হ্যাঁ শুধু একজনেরই কথা ভাবা যায়।

তার হাতের লেখা বিশাখা জানে না। কিন্তু হাতের লেখা যদি তারই হন, তাহলেও এমন একটা চিঠি সে লিখবে একথা বিশ্বাস করাই যে শক্ত।

তাহলে? কি এখন সে করবে? কি তার করা উচিত? স্বামীকে চিঠিটা দেখানো? তাই দেখাবে বলেই সে ঠিক করেছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পারেনি। পারেনি দ্বিধায় সঙ্কোচে, স্বামী কি বুঝবেন সেই অনিশ্চয়তার ভয়ে। তা ছাড়া যে স্বামী পূজা পাঠ ইত্যাদি ব্যাপারে তাকে দিয়ে দু-একটা সামান্য কাজ করাবার প্রয়োজনে ছাড়া তার সঙ্গে কোন আলাপই করে না, তাকে সে কেমন করে হঠাৎ এ চিঠির কথা বলবে? বলবেই বা কি—বলবে কি যে, তার নামে কে একজন ইংরেজি একটা চিঠি পাঠিয়েছে? না তা বলতে সে পারেনি।

এ রকম চিঠি সম্বন্ধে কিন্তু খুব সাবধান হয়েছে। প্রতিদিন দুপুরে ঝি বাইরের ডাকবাক্স থেকে চিঠিপত্র এনে বালানে রাখার পরেই বিশাখা সেখানে গিয়ে চিঠিগুলো হাতড়ে দেখেছে।

তিন-চার দিন ও রকম কোন চিঠি আসেনি, বিশাখা একবার ভেবে ছিল ওরকম চিঠি আর হয়তো থাকবে না। না এলে, নিশ্চিন্ত হবারই কথা, নিশ্চিন্ত আর খুশি। কিন্তু তা ঠিক হয়েছিল কি? চিঠি আসতে পারে বলে যেমন উদ্বেগ আর ভয়, তেমনি একটা ঔৎসুক্যও কি মন থেকে মুছে ফেলতে পেরেছিল!

চিঠি কিন্তু আবার এলো দিন পাঁচেক বাদে। সংক্ষিপ্ত চিঠি কিন্তু তীব্র আবেগে যেন কাঁপছে—'আর পারছি না বিশাখা আর পারছি না। এক মিথ্যা অন্ধ সংস্কারের কাছে বলি হবার জন্যেই কি জন্মেছি? বিশাখা সাহস কর।'

পরের চিঠি তিন দিন বাদেই—তোমায় একটু দেখতে চাই বিশাখা একবার ক্ষণিকের জন্য। তোমার এ বাড়িতে গোঁড়ামি যাই থাক তোমার স্বাধীন ভাবে বাইরে যাওয়া আসা সম্বন্ধে বাধা নিষেধ নেই বলে জানি। কাল একবার পোস্ট অফিসের সামনে ফুটপাথে ডাকবাক্সে একটা চিঠি ফেলবার ছলে এসো। আমি পথ চেয়ে থাকব।

সমস্ত রাত সেদিন ঘুমোতে পারিনি বিশাখা। কি সে করবে ঠিক করতে না পেরে। শেষ পর্যন্ত মন শক্ত করে ঠিক করেছিল যে যাবে। গেলে অতীশের সঙ্গে দেখা হবে এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। তাই যাবে দেখা দেওয়ার জন্যে নয়, অতীশকে এ রকম চিঠি লিখতে বারণ করবার জন্যেই।

বিশাখা সত্যিই গিয়েছিল তার পরদিন। ইচ্ছে করেই শাড়িটা পরে গিয়েছিল বেগুনী রঙের। অতীশের সঙ্গে কিন্তু দেখা হয়নি। যে কোন কারণে হোক অতীশ দেখা দিতে চায়নি বলে বুঝেছে বিশাখা।

চিঠি অবশ্য দু'দিন বাদে ঠিক পেয়েছে। চিঠিতে বেগুনী-রঙের শাড়িটা সম্বন্ধে একটু কিছু লেখা থাকবে মনে করেছিল বিশাখা। কিন্তু সে রকম কোন উল্লেখই ছিল না তাতে। শুধু তিনটি আকুল ছত্র—'তোমাকে দেখলাম বিশাখা। এ দেখা যে কতখানি যন্ত্রণা আর কি তীব্র আনন্দ তা বোঝাতে পারব না। কাছে গেলে কি করে বসতে পারি জানি না বলে দূর থেকেই চলে এলাম। আমি তৈরি হচ্ছি বিশাখা। পরের চিঠির জন্যে অপেক্ষা কর।'

এই চিঠি পাবার পরই বিশাখা আমার কাছে এসেছিল আর এ পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী শুনিয়ে তাকে নিয়ে একটি গল্প লিখতে বলেছিল। বলেছিল, আমি দিশাহারা, আমায় নিয়ে গল্প লিখলে আপনি হয়তো আমার এ নিদারুণ সঙ্কট থেকে মুক্তির একটা পথ পেয়ে যেতে পারেন।

দোহাই আপনার, আপনি আমায় নিয়ে একটা গল্প লিখুন। আমি সে গল্প শুনতে আসব দু'হপ্তা বাদে ঠিক এমনি সময়ে।

আমি সে গল্প লিখতে পারিনি। বিশাখাও আসেনি দু-হপ্তা বাদে। তার বদলে একমাস বাদে তার একটি চিঠি পেয়েছি। তাতে সে লিখেছে, আপনি গল্প লিখেছেন কিনা জানি না তবে আমার আর তা শোনবার দরকার নেই। নিজের সমস্যা আমি নিজেই সমাধান করেছি। আমি পালিয়ে এসেছি আমায় যে চিঠি লিখত তারই সঙ্গে।

আপনার সঙ্গে দেখা করে আসবার পর দুটি অমনি বেনামী চিঠি আমি পাই। দ্বিতীয় চিঠিটি আমার নিয়তিরই পাঠানো বলতে পারি। সে চিঠিতে বেশি কিছু লেখা ছিল না। শুধ্ লেখা ছিল, 'সব ব্যবস্থা পাকা বিশাখা। এই খামের মধ্যে একটি টিকিট পাবে। রাত সাড়ে সাতটায় হাওড়া আট-নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে যে ট্রেন ছাড়বে, তার একটি ফার্স্ট ক্লাস ক্যুপে রিজার্ভ করে রেখেছি। আমার দেখা পাও বা না পাও তুমি সোজা গিয়ে সেই ক্যুপে বসবে টিকিট দেখিয়ে। সঙ্গে কোন কিছু আনার দরকার নেই। আমি সময়ে যাব-ই জানিয়ে।'

এ চিঠি পেয়ে তখনই মনস্থির করে ফেলেছিলাম। এবার যা হয় হোক স্বামীকে এ চিঠি দেখাইব। সেদিন রাত্রে সেই চেষ্টাই করেছিলাম। স্বামী পূজোর কি আয়োজনের কথা বলতে আমায় ডেকে কথা বলতেই বাধা দিয়ে বলেছিলাম, শোন, একটা দারুণ দরকারী কথা তোমাকে আমার বলবার আছে। আর এখুনি তা না বললেই নয়, কারণ আমাদের জীবনের বর্তমান ভবিষ্যৎ সব কিছু তার ওপর নির্ভর···

আর কিছু বলতে পারিনি। স্বামী অধৈর্যের সঙ্গে আমার কথায় বাধা দিয়ে বলেছেন, যাক যাক, ও কথা কাল রাত্রে কি পরশু সকালে বোলো। এখন যা বলছি শোন।

স্বামী এর পর তাঁর পূজোর জন্যে একটি করনীয় আমায় বিশদ করে বুঝিয়েছেন। আমিও তৎক্ষণাৎ মন স্থির করে নিয়ে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেছি।

পরেরদিন ঠিক সময়ের মিনিট কুড়ি আগে হাওড়া স্টেশনে গেছি।

টিকিট দেখিয়ে কামরা খুঁজতে গিয়ে জেনেছি ক্যুপেটা সাধারণ ফার্স্ট ক্লাশের নয় এয়ারকণ্ডিশনড্ ফার্স্ট ক্লাস।

কয়েক মিনিটের দ্বিধাদ্বন্দ্ব করে তারপর কোচটি খুঁজে নিয়ে তাতে ঢুকেছি। এয়ার-কণ্ডিশনড কোচের বাইরের দরজা যেন নিশ্চিদ্র হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। কনডাকটার গার্ড ক্যুপেটি দেখিয়ে দিয়েছেন আমায়। যেন এক মৃত্যুর দরজা পার হয়ে সেখানে গিয়ে ঢুকেছে।

না, কেউ তখনও সেখানে নেই। কামরা বেশ ঠাণ্ডা, তবু কামরার ভেতরকার বেসিনের কল টিপে কিছু জল মুখে আর কপালে লাগিয়ে জানালার ধারে গিয়ে বসেছি। স্থির হয়ে বসতে পারিনি কিছুতেই। নিজের হাতঘড়িটা দেখেছি, সময় হয়ে এসেছে। চার···তারপর তিন··· তারপর, মাত্র দু·মিনিট আর—অস্থির হয়ে উঠে পড়েছি।

কিছুতেই আর থাকতে পারব না এখানে। কিছুতেই না। দরজা খুলে ফেলে অস্থির ভাবে বাইরে বার হতে গেছি কিন্তু পারিনি। চিৎকার করে বলেছি, আমি নেমে যাব।

নেবে যাবেন, কে একজন আমায় বাধা দিচ্ছে।

কনডাকটার গার্ডের কথাও শুনতে পেয়েছি, কোথায় যাচ্ছেন, ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। আর একজন আমায় বাধা দিয়ে ধীরে ধীরে ক্যুপের ভেতর ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে বলেছে কোথায় যাচ্ছ কোথায়? এই তো আমি রয়েছি।

তুমি? কে তুমি? অবাক হয়ে চেয়ে দেখে বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে গেছি। যে সযত্নে অথচ দৃঢ়ভাবে ভেতরে নিয়ে এসেছে তাকে আমি চিনতে পেরেছি। কামানো গোঁফ আর পোষাক আশাকের সম্পূর্ণ বদল সত্বেও। সে বিশ্রী গোঁফ তার মুখে নেই, পরণেও চমৎকার মানানসই পাজামা পাঞ্জাবী মুখে মধুর একটি হাসি। হ্যাঁ, আমি যার সঙ্গে অভিসারে যাচ্ছি, তিনি আমার স্বামী ছাড়া আর কেউ নয়। তিনিই এতদিন আমায় বেনামী প্রেমপত্র লিখে উদ্‌ভ্রান্ত করেছেন।

মনোজ বসু

বন মর্ম্মর

মৌজাটি নিতান্ত ছোট নয়। অগ্রহায়ণ হইতে জরিপ চলিতেছে, খানাপুরি শেষ হইল এতদিনে। হিঞ্চে-কলমির দামে আঁটা নদীর কূলে বটতলার কাছাকাছি সারি সারি তিনটি তাঁবু পড়িয়াছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ।

শঙ্কর ডেপুটি—সদর ক্যাম্প হইতে আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে।



উপলক্ষ একটা জটিল রকমের মকদ্দমা। ছোকরা মানুষ, ভারি চটপটে—পত্নী বিয়োগের পর হইতে চাঞ্চল্য যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। আসিয়াই আমিনের তলব পড়িল।

আমিনকে ডাকিতে পাঠাইয়া একটা চুরুট বাহির করিল। চুরুটের

কৌটায় সেই সাত মাস আগেকার শুকনো বেলের পাতা ক-টি এখনও রহিয়াছে।

সাত মাস আগে একদিন বিকেলবেলা তাহাদের দেশের বাড়িতে দোতলার ঘরে ঢুকিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলঃ সুধারাণী। কালকে কি বার?

সুধা বলিয়াছিল, পাঁজি দেখগে যাও, আমি জানি নে। তারপর হাসিয়া চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া ছিল, চলে যাবেন, তাই ভয় দেখানো হচ্ছে! ভারি কিনা ইয়ে—

শঙ্করও খুব হাসিয়াছিল। বলিয়াছিল, যদি মানা করো, তবে না হয় যাই নে।

থাক!

কোনো জবাব না দিয়া সুধারাণী অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় কোঁচাইয়া পাট করিতে লাগিল। শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া কাছে আনিল।

শোনো সুধারাণী, উত্তর দাও।

বা—রে, পরের মনের কথা আমি জানি বুঝি!

নিজের তো জান?

তবু কথা কহে না দেখিয়া শঙ্কর বলিতে লাগিল, আমি চলে যাব বলে তোমার কষ্ট হচ্ছে কিনা সেই কথাটা বলো আমায়, না বললে শুনছি নে কিছুতে।

—না।

সত্যি বলছ?

না—না—না। বলিয়া হাত ছাড়াইয়া সুধা বাহির হইয়া যাইতে ছিল। শঙ্কর পলায়নপরার সামনে গিয়ে দাঁড়াইল।

মিছে কথা। দেখি, আমার দিকে চাও—কই, চাও দিকি সুধারাণী।

সুধা তখন দুই চক্ষু প্রাণপণে বুজিয়া আছে। মুখ ফিরাইয়া ধরিতেই ঝর ঝর করিয়া গাল বাহিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িল। আঁকিয়া বাঁকিয়া পাশ কাটাইয়া বধু পলাইল।······

শেষ রাতে বৃষ্টি নামিয়াছে। লক্ষ্মণ বাহির হইতে ডাকিল, ছোটবাবু, ঘাটে ষ্টিমার সিটি দিতেছে।

সুধারানী গলায় আঁচল বেড়িয়া প্রণাম করিল। কহিল, দাঁড়াও একটু। তাড়াতাড়ি কুলুঙ্গির কোণ হইতে সন্ধ্যাকালে গোছাইয়া-রাখা বিল্বপত্র আনিয়া হাতে দিল।

দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা! হপ্তায় একখানা করে চিঠি দিও, যখন যেখানে থাক, বুঝলে?

আরও একটা দিনের কথা মনে পড়ে, এমনি এক বিকালবেলা মামুদপুর ক্যাম্পে সে জরিপের কাজ করিতেছে, এমন সময় চিঠি আসিল, সুধারানী নাই।

ইতিমধ্যে নকশা ও কাগজপত্র লইয়া ভজহরি আমিন সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দু-শ দশ—এগারো—তার উত্তরে এই হলে গে দু-শ বারো নম্বর প্লট—বলিয়া ভজহরি নকশার উপর জায়গাটা চিহ্নিত করিল। বলিতে লাগিল, অনাবাদী বন-জঙ্গল একটা, মানুষজন কেউ যায় না ওদিকে, তবু এই নিয়ে যত মামলা!

হঠাৎ একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, সে-ই কেবল বকিয়া মরিতেছে, শঙ্কর বোধকরি একবারও কাগজপত্রের দিকে তাকায় নাই—সামনের উত্তরের মাঠের দিকে এক নজরে তাকাইয়া আপন মনে দিব্য শিষ দিতে শুরু করিয়াছে, চুরুটের আগুন নিভিয়া গিয়াছে।

বলিল, হ্যাঁ, ঐ যে তালগাছ ক'টার ওধারে কালো কালো দেখা যাচ্ছে—জঙ্গলের আরম্ভ ঐখানে। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক, কিন্তু ওর মধ্যে জমি অনেক···এইবারে রেকর্ড একবার দেখবেন হুজুর, ভারি গোলমেলে ব্যাপার।

হাঁ হাঁ না—এই রকম বলিতে বলিতে একটু অপ্রস্তুত হইয়া শঙ্কর কাগজপত্রে মন দিল। পড়িয়া দেখিল, দুশ বারোর খতিয়ানে মালিকের নাম লেখা হইয়াছে, শ্রীধনঞ্জয় চাকলাদার।

ভজহরি বলিতে লাগিল, আগে ঐ একটা নাম শুধু লিখেছিলাম। তারপর দেখুন নিচে নিচে উডপেন্সিল দিয়ে আরও সাতটা নাম লিখতে হয়েছে। রোজই এই রকম নতুন নতুন মালিকের উদয় হচ্ছে। আজ অবধি একুনে আটজন তো হলেন—যে রেটে ওঁরা আসতে লেগেছেন দু-একদিনের মধ্যে কুড়ি পুরে যাবে বোধ হচ্ছে, এই পাতায় কুলোবে না।

শঙ্কর কহিল, কুড়ি পুরে যাবে, যাওয়াচ্ছি আমি—রোসো না। আজই খতম করে দেব সব। তুমি ওদের আসতে বললে কখন ?

সন্ধ্যের সময়। গেরস্ত লোক সারাদিন কাজকর্মে থাকে—একটু রাত হয় হবে, জ্যোৎস্না রাত আছে—তার আর কি ?

আরও খানিকটা কাজকর্ম দেখিয়া শঙ্কর সহিসকে ঘোড়া সাজাইতে হুকুম দিল।

বলিল, মাঠের দিক দিয়ে চক্কোর দিয়ে আসা যাক একটা—এ রকম হাত-পা কোলে করে তাঁবুর মধ্যে কাঁহাতক বসে থাকা যায়! এ জায়গাটা কিন্তু তোমরা বেশ সিলেক্ট করেছ, আমিন মশাই। ওগুলো ভাঁটফুল, না ? কিন্তু গাঙের দশা দেখে হাসি না কাঁদি—

বলিতে বলিতে আবার কি ভাবিল। বলিল, ঘোড়া থাকগে, এক কাজ করলে হয় বরং—চলো না কেন, দু-জনে পায়ে পায়ে জঙ্গলটা ঘুরে আসি। মাইলখানেক হবে—কি বল ? বিকেলে ফাঁকায় বেড়ালে শরীর ভালো থাকে। চলো—চলো—

মাঠের ফসল উঠিয়া গিয়াছে। কেনোদিকে লোক-চলাচল নাই। শঙ্কর আগে আগে যাইতেছিল, ভজহরি পিছনে। জঙ্গলের সামনেটা খাতের মতো—অনেকখানি চওড়া, খুব নাবাল। সেখানে ধান হইয়া থাকে, ধানের গোড়াগুলা রহিয়াছে। পাশ দিয়া উঁচু আল বাঁধা।

সেখানে আসিয়া শঙ্কর কহিল, গাঙের বড় খাল-টাল ছিল এখানে ?

ভজহরি কহিল, না হুজুর, খাল নয়—এটা গড়খাই। সামনের জঙ্গলটা ছিল গড়।

গড় ?

আজ্ঞে হ্যাঁ রাজারামের গড়। রাজারাম বলে নাকি কে-একজন

কোনকালে এখানে গড় তৈরী করেছিলেন। এখন তার কিছু নেই, জঙ্গল হয়ে গেছে সব।

তারপর দু-জনে নিঃশব্দে চলিতে লাগিল।

মাঝে একবার শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—বাঘ-টাঘ নেই তো?

ভজহরি তাচ্ছিল্যের সহিত জবাব দিল, বাঘ! চারিদিকে ধুধু করছে ফাঁকা মাঠ, এখানে কি আর···তবে হ্যাঁ, অন্যান্যবার শুনলাম কেঁদো-গোবাঘা দু—একটা আসত। এবারে আমাদের জ্বালায়—।

বলিয়া হাসিল। বলিতে লাগিল, উৎপাতটা আমরা কি কম করছি হুজুর? সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই—কম্পাস নিয়ে চেন ঘাড়ে করে করে সমস্তটা দিন। ঐ পথ যা দেখছেন, জঙ্গল কেটে আমরাই বের করেছি, আগে পথঘাট কিছু ছিল না—এ অঞ্চলের কেউ এ বনে আসে না।

বনে ঢুকিয়া খানিকটা যাইতেই মনে হইল, এই মিনিট দুয়ের মধ্যেই বেলা ডুবিয়া রাত্রি হইয়া গেল।

ঘন শাখাজাল-নিবদ্ধ গাছপালা, আম আর কাঁঠাল গাছের সংখ্যাই বেশি। পুরু বাকল ফাটিয়া চৌচির হইয়া গুঁড়িগুলি পড়িয়া আছে যেন এক-একটা অতিকায় কুমির, ছাতাধরা সবুজ, ফাঁকে ফাঁকে পরগাছা। ··একদা মানুষেই যে ইহাদের পুতিয়া লালন করিয়াছিল আজ আর তাহা বিশ্বাস হয় না। কত শতাব্দীর শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা মাথার উপর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, তলার আঁধারে এইসব গাছপালা আদিম কালের কত সব রহস্য লুকাইয়া রাখিয়াছে, কোনো দিন সূর্য্যকে উঁকি মারিয়া কিছু দেখিতে দেয় নাই।

এই রকম একটানা কিছুক্ষণ চলিতে চলিতে শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল। ওখানটায় তো ফাঁকা বেশ! জল চকচক করছে—না?

আমিন বলিল, ওর নাম পঙ্কদীঘি।

খুব পাঁক বুঝি?

তা হবে। কেউ আবার বলে, পক্ষী-দীঘির থেকে পঙ্কদীঘি হয়েছে।

বলিয়া ভজহরি গল্প আরম্ভ করিল ঃ

সেকালে এই দীঘির কালো জলে নাকি অতি সুন্দর ময়ূরপঙ্খী ভাসিত। আকারেও সেটি প্রকাণ্ড—তুই কামরা, ছয়খানি দাঁড়। এত বড় ভারী নৌকা, কিন্তু তলির ছোট্ট একখানা পাটা একটুখানি ঘুরাইয়া দিয়া পলকের মধ্যে সমস্ত ডুবাইয়া ফেলা যাইত। দেশে সে সময় শাসন ছিল না, চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগেরা আসিয়া লুটতরাজ করিত, জমিদারদের মধ্যে রেষারেষি লাগিয়াই ছিল। প্রত্যেক বড়লোকের প্রাসাদে গুপ্তদ্বার ও গুপ্তভাণ্ডার থাকিত, মান-সম্ভ্রম লইয়া পলাইয়া যাইবার—অন্ততপক্ষে মরিবার—অনেক সব উপায় সম্ভ্রান্ত লোকেরা হাতের কাছে ঠিক করিয়া রাখিতেন। কিন্তু নৌকার বহিরঙ্গ দেখিয়া এসব কিছু ধরিবার জো ছিল না। চমৎকার ময়ূরকণ্ঠী রঙে অবিকল ময়ূরের মতো করিয়া গলুইটি কুঁদিয়া তোলা—শোনা যায়, এক—একদিন নিঝুম রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে রাজারামের বড় ছেলে জানকীরাম তাঁর তরুণী পত্নী মালতী-মালাকে লইয়া চিত্রবিচিত্র ময়ূরের পেখমের মতো পাল তুলিয়া ধীর বাতাসে ঐ নৌকায় দীঘির উপর বেড়াইতেন। এই মালতীমালাকে লইয়া এ অঞ্চলের চাষারা অনেক ছড়া বাঁধিয়াছে, পৌষ-সংক্রান্তির আগের দিন তাহারা বাড়ি বাড়ি সেই সব ছড়া গাহিয়া নূতন চাউল ও গুড় সংগ্রহ করে, পরদিন দল বাঁধিয়া সেই গুড়-চাউলে আমোদ করিয়া পিঠা খায়।

গল্প করিতে করিতে তখন তাহারা সেই দীঘির পাড়ের কাছে আসিয়াছে। ঠিক কিনার অবধি পথ নাই, কিন্তু নাছোড়বন্দা শঙ্কর ঝোপঝাড় ভাঙিয়া আগাইতে লাগিল। ভজহরি কিছুদূরে একটা নিচু ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নল-খাগড়ার বন দীঘির অনেক উপর হইতে আরম্ভ হইয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে, তারপর কুচো-শেওলা শাপলার ঝাড়। ঝুঁকিয়া-পড়া গাছের ডাল হইতে গুলঞ্চলতা ঝুলিতেছে। একটু দূরের দিকে কিন্তু কাকচক্ষুর মতো কালো জল। সাড়া পাইয়া ক-টা ডাকপাখি নলবনে ঢুকিল। অল্প খানিকটা ডাইনে বিড়ালআঁচড়ায় কাঁটাঝোপের নিচে এককালে যে বাঁধানো ঘাট ছিল, এখন বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সেই ভাঙাঘাটের অনতিদূরে পাতলা পাতলা সেকেলে ইটের পাহাড়। কতদিন পূর্বে বিস্মৃত শতাব্দীর কত কত নিভৃত সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রে জানকীরাম হয়তো প্রিয়তমাকে লইয়া ওখান হইতে টিপিটিপি এই পথ বহিয়া এই সোপান বহিয়া দীঘির ঘাটে ময়ূরপঙ্খীতে চড়িতেন। গভীর অরণ্যছায়ে সেই আসন্ন সন্ধ্যায় ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের সমস্ত সংবিৎ হঠাৎ কেমন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

ধ্যেত, আমার ভয় করে—কেউ যদি দেখে ফেলে!

কে দেখবে আবার? কেউ কোথাও জেগে নেই, চলো মালতীমালা—লক্ষ্মীটি, চলো যাই।

আজ থাক, না না—তোমার পায়ে পড়ি, আজকের দিনটে থাক শুধু।

ঐ যেখানে আজ পুরানো ইটের সমাধিস্তূপ, ওখানে বড় বড় কক্ষ অলিন্দ বাতায়ন ছিল, উহারই কোনোখানে হয়তো একদা তারা-খচিত রাত্রে ময়ূরপঙ্খীর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা শুনিতে শুনিতে এক তম্বঙ্গী রূপসী রাজবধূর চোখের তারা লোভে ও কৌতুকে নাচিয়া উঠিতেছিল, শব্দ হইবে বলিয়া স্বামী হয়তো বধূর পায়ের নূপুর খুলিয়া দিল, নিঃশব্দে খিড়কি খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া দুইটি চোর সুপ্তপুরী হইতে বাহির হইয়া ঘাটের উপর নৌকায় উঠিল, রাজবাড়ীর কেউ তা জানিল না। ফিসফাস কথাবার্তা···স্বচ্ছ মেঘের আড়ালে চাঁদ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল··· শব্দ হইবার ভয়ে দাঁড়ও নামায় নাই···এমনি বাতাসে বাতাসে ময়ূরপঙ্খী মাঝদীঘি অবধি ভাসিয়া চলিল—

ভাসিতে ভাসিতে দূরে—বহুদূরে—শতাব্দীর আড়ালে কোথায় তাহারা ভাসিয়া গিয়াছে!

ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের কেমন ভয় করিতে লাগিল। গভীর নির্জনতার একটি ভাষা আছে, এমন জায়গায় এমনি সময় আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তাহা স্পষ্ট অনুভব হয়। চারিপাশের বনজঙ্গল অবধি ঝিম-ঝিম করিয়া যেন এক অপূর্ব ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভয় হইল, আরও কিছুক্ষণ সে যদি এখানে এমনিভাবে চুপ করিয়া

দাঁড়াইয়া থাকে, জমিয়া নিশ্চয় গাছের গুঁড়ির মতো হইয়া এই বন-রাজ্যের একজন হইয়া যাইবে ; আর নড়িবার ক্ষমতা থাকিবে না।··· সহসা সচেতন হইয়া বার বার সে নিজের স্বরূপ ভাবিতে লাগিল, সে সরকারি কর্মচারী···তার পসার প্রতিপত্তি···ভবিষ্যতেরআশা··· মনকে ঝাঁকা দিয়া দিয়া সমস্ত কথা স্মরণ করিতে লাগিল। ডাকিল ঃ আমিন মশাই !

ভজহরি কহিল, সন্ধ্যে হয়ে গেল, হুজুর।

যাচ্ছি।

ক্যাম্পের কাছাকাছি হইয়া শঙ্কর হাসিয়া উঠিল। কহিল, ডাকাত পড়েছে নাকি আমাদের তাঁবুতে ? বাপরে বাপ ? এবং হাসির সহিত ক্ষণপূর্বের অনুভূতিটা সম্পূর্ণরূপে উড়াইয়া দিয়া বলিতে লাগিল, চুরুট টেনে টেনে তো আর চলে না—হুঁকো-কলকের ব্যবস্থা করতে পার আমিন মশাই, খাঁটি স্বদেশি মতে বসে বসে টানা যায় ?

আমিনও হাসিয়া বলিল, অভাব কি ? মুখের কথা বেরুতে গাঁ থেকে বিশটা রুপোবাঁধা হুঁকো এসে হাজির হবে, দেখুন না একবার—

গ্রামের ইতর-ভদ্র অনেকে আসিয়াছিল, উহাদের দেখিয়া তটস্থ হইয়া সকলে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। মিনিট দশেক পরে শঙ্কর তাঁবুর বাহিরে আসিয়া মামলার বিচারে বসিল। বলিল, মুখের কথায় হবে না কিছু, আপনাদের দলিলপত্তোর কার কি আছে দেখান একে একে ! ধনঞ্জয় চাকলাদার আগে আসুন।

ধনঞ্জয় সামনে আসিল। কোষ্ঠীর মতো জড়ানো একখানা হলদে রঙের কাগজ, কালো ছাপ-মারা পোকায় কাটা, সেকেলে বাংলা হরফে লেখা। শঙ্কর বিশেষ কিছু পড়িতে পারিল না, ভজহরি কিন্তু হেরিকেনটা তুলিয়া ধরিয়া অবাধে আগাগোড়া পড়িয়া গেল। কে-একজন দয়ালকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামজাদা রাজারামের গড় একশ বারো বিঘা নিষ্কর জায়গা-জমি মায় বাগিচা-পুষ্করিণী তারণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়ের নিকট সুস্থ শরীরে সরল মনে খোশকোবলায় বিক্রয় করিতেছে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল: ঐ তারণচন্দ্র চাকলাদার আপনার কেউ হবেন বুঝি ধনঞ্জয়বাবু?

ধনঞ্জয় সোৎসাহে কহিতে লাগিল, ঠিক ধরেছেন হুজুর, তারণচন্দোর আমার প্রপিতামহ। পিতামহ হলেন কৈলাসচন্দোর—তাঁর বাবা। তিরাশি সন থেকে এই সব নিষ্করের সেস গুনে আসছি কালেক্টরিতে, গুডিভ সাহেবের জরিপের চিঠে রয়েছে। কবলার তারিখটে একবার লক্ষ্য করে দেখবেন, হুজুর—

আরও অনেক কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু উপস্থিত অনেকে না না—করিয়া উঠিল। তাহারাও রাজারামের গড়ের মালিক বলিয়া নাম লেখাইয়াছে, এতক্ষণ অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরিয়া শুনিতেছিল, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না।

ধমক খাইয়া সকলে চুপ করিল। শঙ্কর ভজহরিকে চুপিচুপি কহিল তুমি ঠিকই লিখেছ, চাকলাদার আসল মালিক, আপত্তিগুলো ভুয়ো—ডিসমিস করে দেব।

ভজহরি কিন্তু সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক বার তুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আসল মালিক ধরা বড় শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে, হুজুর—

বারো-শ উনিশ সনের পুরোনো দলিল দেখাচ্ছে যে!

ভজহরি কহিতে লাগিল, এখানে আটঘরা গ্রামে একজন লোক রয়েছে, ন-সিকে কবুল করুন তার কাছে গিয়ে—উনিশ সন তো কালকের কথা, হুবহু আকব্বর বাদশার দলিল বানিয়ে দেবে। আসল নকল চেনা যাবে না।

বস্তুত ধনঞ্জয়ের পর অন্যান্য সাতজনের কাগজপত্র তলব করিয়া দেখা গেল, ভজহরি মিথ্যা বলে নাই—ঐ রকম পুরাণো দলিল সকলেরই আছে। এবং বাঁধুনিও প্রত্যেকটির এমনি নিখুঁত যে যখনই যাহার কাগজ দেখে একেবারে নিঃসন্দেহ বুঝিয়া যায়, রাজারামের গড়ের মালিক একমাত্র সেই লোকটাই। এ যেন গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া গেল। বিস্তর ভাবিয়া-চিন্তিয়া সাব্যস্ত হইল না কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখা যায়।

হাল ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে শঙ্কর বলিল, দেখুন মশাইরা, আপনারা ভদ্রসন্তান—

হাঁ—হাঁ—করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল।

এই একটা প্লট একসঙ্গে ঐরকম ভাবে আটজনের তো হতে পারে না?

সকলেই ঘাড় নাড়িল। অর্থাৎ, নয়ই তো—

আপনারা হলফ করে বলুন, এর সত্যি মালিক কে।

ভদ্রসন্তানেরা তাহাতে পিছপাও নহেন। একে একে সামনে আসিয়া ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিল, দু-শ বারোর প্লট একমাত্র তাহারই, অপর সকলে চক্রান্ত করিয়া মিথ্যা কথা কহিতেছে।

লোকজন বিদায় হইয়া গেলে শঙ্কর বলিল, না, এরা পাটোয়ারি বটে। দেখে-শুনে সম্ভ্রম হচ্ছে।

ভজহরি মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, এ রকম সে অনেক দেখিয়াছে।

শঙ্কর বলিতে লাগিল, তোমার কথাই মেনে নিলাম যে কাঁচা দলিল-গুলো জাল। কিন্তু যেগুলো রেজেস্ট্রি? দেখ, এদের দূরদৃষ্টি কত দেখ একবার—কবে কি হবে, দু-পুরুষ আগে থেকে তাই তৈরি হয়ে আসছে। চুলোয় যাকগে দলিলপত্তোর—তুমি গাঁয়ে খোঁজখবর করে কি পেলে বল? যা হোক একরকম রেকর্ড করে যাই—পরে যেমন হয় হবে।

ভজহরি বলিল, কত লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আসবার আগে কত সাক্ষিসাবুদ তলব করেছি, সে আরও মজা—এক-একজনে এক-এক রকম বলে। বলিয়া সহসা-প্রচুর হাসিতে হাসিতে বলিল, নরলোকে আশকারা হল না, এখন একবার কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করতে পারলে হয়।

শঙ্কর কথাটা বুঝিতে পারিল না।

ভজহরি বলিতে লাগিল, কুমার বাহাদুর মানে জানকীরাম। সেই যে তখন ময়ূরপঙ্খীর কথা বলছিলাম, গাঁয়ের লোকেরা বলে—আশপাশের গ্রাম নিশুতি হয়ে গেলে জানকীরাম নাকি আসেন—উত্তর মাঠের ঐ

নাককাটির খাল পেরিয়ে তেঘরা-বকচরের দিক থেকে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে রোজ রাত্তিরে মালতীমালার সঙ্গে দেখা করে যান—সে ভারি অদ্ভুত গল্প—কাজকর্ম নেই তো এখন?

* * *

তারপর রাত্রি অনেক হইল। তিনটি তাঁবুরই আলো নিভিয়াছে, কোনো দিকে সাড়াশব্দ নাই। শঙ্করের ঘুম আসিতেছিল না। একটা চুরুট ধরাইয়া বাহিরে আসিল, আসিয়া মাঠে খানিক পায়চারি করিতে লাগিল।

ভজহরি বলিয়াছিল, কেবল জঙ্গল নয় হুজুর, এই মাঠেও সন্ধ্যের পর একলা কেউ আসে না। এই মাঠ সেই যুদ্ধক্ষেত্র, নদীপথে শত্রুরা এসেছিল। বেলা না ডুবতে রাজারামের পাঁচশ ঢালী ঘায়েল হয়ে গেল, সেই পাঁচ-শ মড়ার পা ধরে টেনে টেনে পরদিন ঐ নদীতে ফেলে দিয়েছিল···

উলুঘাসের উপর পা ছড়াইয়া চুপটি করিয়া বসিয়া শঙ্কর আনমনে ক্রমাগত চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

চার-শ বৎসর আগে আর একদিন সন্ধ্যায় গ্রামনদীকূলবর্তী এই মাঠের উপর এমনি চাঁদ উঠিয়াছিল। তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়া সমস্ত মাঠে ভয়াবহ শান্তি থমথম করিতেছে। চাঁদের আলোয় স্তব্ধ রণভূমির প্রান্তে জানকীরামের জ্ঞান ফিরিল। দূরে গড়ের প্রাকারে সহস্র সহস্র মশালের আলো···আকাশ চিরিয়া শত্রুর অশ্রান্ত জয়োল্লাস···দুই হাতে ভর দিয়া অনেক কষ্টে জানকীরাম উঠিয়া বসিয়া তাঁহারই অনেক আশা ও ভালবাসার নীড় ঐ গড়ের দিকে চাহিতে চাহিতে অকস্মাৎ দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। ললাটের রক্তধারা ডান হাতে মুছিয়া ফেলিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন, কেবল কয়েকটা শিয়াল নিঃশব্দে শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—কোনো দিকে কেহ নাই···

সেই সময়ে ওদিকে অন্দরের বাতায়নপথে তাকাইয়া মালতীমালাও চমকিয়া উঠিলেন, তবে কি একেবারেই—? অবমানিত রাজপুরীর

উপরেও গাঢ় নিঃশব্দতা নামিয়া আসিয়াছে। দাসী বিবর্ণমুখে পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মালতীমালা আয়ত কালো চোখে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন: শেষ?

খবর আসিল, গুপ্তদ্বার খোলা হইয়াছে, পরিজনেরা সকলে বাহির হইয়া যাইতেছে।

দাসী বলিল, বউমা, উঠুন—

বধূ বলিলেন, নৌকা সাজানো হোক।

কেহ সে কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। নদীর ঘাটে শত্রুর বহর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সে সন্ধানী-দৃষ্টি ভেদ করিয়া জলপথে পলাইবার সাধ্য কি?

মালতীমালা বলিলেন, নদীর ঘাটে নয় রে, দীঘির ময়ূরপঙ্খী সাজাতে হুকুম দিয়েছি। খবর নিয়ে আয়, হল কি না।

সেদিন সন্ধ্যায় রাজোদ্যানে কনকচাঁপা গাছে যে ক-টি ফুল ফুটিয়াছিল তাড়াতাড়ি সেগুলি তুলিয়া আনা হইল, মালতীমালা লোটন-খোঁপা ঘিরিয়া তার কতকগুলি বসাইলেন, বাকিগুলি আঁচল ভরিয়া লইলেন। সাধের মুক্তাফল দুটি কানে পরিলেন, পায়ে আলতা দিলেন, মাথায় উজ্জ্বল সিঁদুর পরিয়া কত মনোরম রাত্রির ভালোবাসার স্মৃতি-মণ্ডিত ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে গিয়া বসিলেন।

নৌকা ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূর গেল। তখন বিজয়ীরা গড়ে ঢুকিয়াছে, নদীর পাড় দিয়া দলে দলে রক্তপতাকা উড়াইয়া জনমানবশূন্য প্রাসাদে ঢুকিতে লাগিল। সমস্ত পুরবাসী গুপ্তপথে পলাইয়াছে।

বিশ-পঁচিশটি মশালের আলো দীঘির জলে পড়িল।

ধর, ধর নৌকা—

মালতীমালা তলির পাটাখানি খুলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ মাস্তুলটিও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নৌকা কেহ ধরিতে পারিল না, কেবল কেমন করিয়া কোন ফাঁক দিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিল আঁচলের চাঁপাফুল কয়েকটি।

তারপর ক্রমে রাত্রি আরও গভীর হইয়া গড়ের উঁচু চূড়ার আড়ালে

চাঁদ ডুবিল। আকাশে কেবল উজ্জ্বল তারা কয়েকটি পরাজিত বিগত-গৌরব ভগ্নজানু জানকীরামের ধূলিশয্যার উপর নির্নিমেষ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছিল। সেই সময় কে একজন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া অতি সন্তর্পণে আসিয়া রাজকুমারকে ধরিয়া তুলিল।

চলুন, প্রভু—

কোথা ?

বটতলায়। ওখানে ঘোড়া রেখেছি, ঘোড়ায় তুলে নিয়ে চলে যাব।

গড়ের আর আর সব ?

বিশ্বস্ত পরিচালক গড়ের ঘটনা সব কহিল। বলিল, কোনো চিহ্ন নেই আর জলের উপর কনকচাঁপা ছাড়া—

কই ? বলিয়া জানকীরাম হাত বাড়াইলেন। বলিলেন, আনতে পারিনি ? ঘোড়ায় তুলে দিতে পার আমায় ? দাও না আমায় তুলে দয়া করে—আমি একটা ফুল আনব শুধু।

নিষেধ মানিলেন না। খটখট খটখট করিয়া সেই অন্ধকারে উত্তরমুখো বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিল। সকালে দেখা গেল, পরিখার মধ্যে যেখানে আজকাল ধান হইয়া থাকে—জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া আছেন, ঘোড়ার কোন সন্ধান নাই।

সেই হইতে নাকি প্রতি রাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে। রাত দুপুরে সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন মধ্য-আকাশে আসিয়া পৌছে, আশেপাশের গ্রামগুলিতে নিষুপ্তি ক্রমশ গাঢ়তম হইয়া উঠে, সেই সময়ে রাতের পর রাত ঐ গভীর নির্জন জঙ্গলের মধ্যে চার-শ বছর আগেকার সেই রাজবধূ পঙ্কদীঘির হিম-শীতল অতল জলশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান, ভাঙা ঘাটের সোপান বহিয়া বিড়ালআঁচড়ার গভীর কাঁটাবন দুই হাতে ফাঁক করিয়া সাবধানে লঘু চরণ মেলিয়া তিনি ক্রমশ আগাইতে থাকেন। তবু বনের একটানা ঝিঁঝিঁর আওয়াজের সঙ্গে পায়ের নূপুর ঝুন ঝুন করিয়া বাজিয়া উঠে। কুঙ্কুমে-মাজা মুখ, গায়ে শ্বেতচন্দন আঁকা সিঁথায় সেই চার শতাব্দী আগেকার সিঁদুর লাগানো, পায়ে রক্তবরণ আলতা, অঙ্গে চিত্র-বিচিত্র কাঁচলি ও মেঘডম্বুর শাড়ি হইতে জল ঝরিয়া ঝরিয়া বনভূমি

সিক্ত করে—বনের প্রান্তে আমের গুঁড়ি ঠেস দিয়া দক্ষিণের মাঠে তিনি তাকাইয়া থাকেন…

আবার বর্ষায় যখন ঐ গড়খাই কানায় কানায় একেবারে ভরিয়া যায়, ঘোড়া তখন জল পার হইয়া বনের সামনে পৌঁছিতে পারে না, মালতীমালা সেই কয়েকটা মাস আগাইয়া ফাঁকা মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ান। দুধসর ধানের সুগন্ধি ক্ষেতের পাশে পাশে ভিজা আলের উপর হিম-রাত্রির শিশিরে পায়ের আলতার অস্পষ্ট ছোপ লাগে, চাষারা সকাল বেলা দেখিতে পায়, কিন্তু রোদ উঠিতে না উঠিতে সমস্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যায়।

চুরুটের অবশিষ্টটুকু ফেলিয়া দিয়া শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। মাঠের ওদিকে মুচিপাড়ায় পোয়ালগাদা, খোড়ো ঘর, নূতন বাঁধা গোলাগুলি কেমন বেশ শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। চৈত্রমাসের সুশুভ্র জ্যোৎস্নায় দূরের আবছা বনের দিকে চাহিতে চাহিতে চারদিককার সুপ্তিরাজ্যের মাঝখানে বিকালের দেখা সেই সাধারণ বন হঠাৎ অপূর্ব রহস্যময় ঠেকিল, ঐখানে এমনি সময়ে বিস্মৃত যুগের বধূ তাকাইয়া আছে, নায়ক তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া সেই দিকে যাইতেছে, কিছুই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মনে হয়, সন্ধ্যাকালে ওখানে সে যে অচঞ্চল নিষ্ক্রিয় ভাব দেখিয়া আসিয়াছে, এতক্ষণ জঙ্গলের সে রূপ বদলাইয়া গিয়াছে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি আজও যাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই তাহারই কোনও একটা অপূর্ব ছন্দ-সঙ্গীতময় গুপ্ত রহস্য এতক্ষণ ওখানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার সুধারাণীর কথা মনে পড়িল—সে যা-যা বলিত, যেমন করিয়া হাসিত, রাগ করিত, ব্যথা দিত, প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ সেই সব কথা। ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের চোখে জল আসিয়া পড়িল। জাগরণের মধ্যে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া কোনদিন সে আর আসিবে না। ·· ক্রমশ তাহার মনে কারণ-যুক্তিহীন একটা অদ্ভুত ধারণা চাপিয়া বসিতে লাগিল। ভাবিল, সে দিনের সেই সুধারাণী, তার হাসি চাহান, তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রত্যেকটি স্পন্দন পর্যন্ত এই জগত হইতে হারায় নাই—

কোনোখানে সজীব হইয়া বর্তমান রহিয়াছে, মানুষ তার খোঁজ পায় না। ঐ সব জনহীন বন-জঙ্গলে এইরূপ গভীর রাত্রে একবার খোঁজ করিয়া দেখিলে হয়। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, কেবল মালতীমালা সুধারাণী নয়, সৃষ্টির আদিকাল হইতে যত মানুষ অতীত হইয়াছে, যত হাসি-কান্নার ঢেউ বহিয়াছে, যত ফুল ঝরিয়াছে, যত মাধবী-রাত্রি পোহাইয়াছে, সমস্তই যুগের আলো হইতে এমনি কোথাও পলাইয়া রহিয়াছে। তদ্‌গত হইয়া যেই মানুষ পুরাতনের স্মৃতি ভাবিতে বসে অমনি গোপন আবাস হইতে তারা টিপিটিপি বাহির হইয়া মনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। স্বপ্নঘোরে সুধারাণী এমনি কোনখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কত রাতে তার কাছে আসিয়া বসিয়াছে, আদর করিয়াছে, ঘুম ভাঙিলে আবার বাতাসে মিশাইয়া পলাইয়া গিয়াছে!···

বটতলায় বটের ঝুরির সঙ্গে ঘোড়া বাঁধা ছিল, ঐখানে আপাতত আস্তাবলের কাজ চলিতেছে, পৃথক ঘর আর বাঁধা হয় নাই। নিজে নিজেই জিন কষিয়া স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো শঙ্কর ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। ঘোড়া ছুটিল। সুপ্ত গ্রামের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনুকম্পা হইতে লাগিল—মুর্খ তোমরা, জঙ্গলের বড় বড় কাঁঠাল গাছগুলাই তোমাদের কেবল নজরে পড়িল এবং গাছ মারিয়া তক্তা কাটাইয়া দু পয়সা পাইবার লোভে এত মকদ্দমা মামলা করিয়া মরিতেছ। গভীর নিঝুম রাত্রে ছায়ামগ্ন সেই আম-কাঁঠাল-পিত্তিরাজের বন, সমস্ত ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল, পঙ্কদীঘির এপার-ওপার যাঁদের রূপের আলোয় আলো হইয়া যায়, এতকাল পাশাপাশি বাস করিলে একটা দিন তাঁদের খবর লইতে পারিলে না!

গড়খাই পার হইয়া বনের সামনে আসিয়া ঘোড়া দাঁড়াইল। একটা গাছের ডালে লাগাম বাঁধিয়া শঙ্কর আমিনদের সেই জঙ্গল-কাটা সঙ্কীর্ণ পথের উপর আসিল। প্রবেশমুখের দুইধারে দুইটি অতিবৃহৎ শিরীষ গাছ, বিকালে ভজহরির সঙ্গে কথায় কথায় এসব নজর পড়ে নাই, এখন বোধ হইল মায়াপুরীর সিংহদ্বার উহারা। সেইখানে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সে সেই ছায়াময় নৈশ বনভূমি দেখিতে লাগিল। আর তাহার অণুমাত্র

সন্দেহ রহিল না, মৃত্যু-পারের গুপ্ত রহস্য আজি প্রভাত হইবার পূর্বে ঐখান হইতে নিশ্চয় আবিষ্কার করিতে পারিবে। আমাদের জন্মের বহুকাল আগে এই সুন্দরী পৃথিবীকে যারা ভোগ করিত, বর্তমান কালের দুঃসহ আলো হইতে তারা সব তাদের অদ্ভুত রীতি-নীতি বীর্য ঐশ্বর্য প্রেম লইয়া সৌরালোকবিহীন ঐ বন-রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। আজ জনহীন মধ্যরাত্রে যদি এই সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া নাম ধরিয়া ধরিয়া ডাক দেওয়া যায়, শতাব্দীপারের বিচিত্র মানুষেরা অন্ধকারের যবনিকা তুলিয়া নিশ্চয় চাহিয়া দেখিবে।

কয়েক পা আগাইতে অসাবধানে পায়ের নিচে শুকনা ডালপালা মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া যেন মর্মস্থানে বড় ব্যথা পাইয়া বনভূমি আর্তনাদ করিয়া উঠিল। স্থির গম্ভীর অন্ধকারে নির্নিরীক্ষ্য সান্ত্রিগণ তাহাকে বাক্যহীন আদেশ করিল ঃ জুতা খুলিয়া এসো।

শুকনা পাতা খসখস করিতেছে, চারিপাশে কত লোকের আনাগোনা ···জ্যোৎস্নার আলো হইতে আঁধারে আসিয়া শঙ্করের চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছে বলিয়াই সে যেন কিছু দেখিতে পাইতেছে না। মনের ঔৎসুক্যে উদ্বেগাকুল আনন্দে কম্পিত হস্তে পকেট হইতে তাড়াতাড়ি সে টর্চ বাহির করিয়া জ্বালিল।

জ্বালিয়া চারিদিক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে—শূন্য বন। বিশ্বাস হইল না, বারংবার দেখিতে লাগিল।···আর একটা দিনের ব্যাপার শঙ্করের মনে পড়ে। দুপুরবেলা, বিয়ের কয়েকটা দিন পরেই, সুধারানী ও আর কে-কে তার নূতন দামি তাসজোড়া লইয়া চুরি করিয়া খেলিতেছিল। তখন তার আর-এক গ্রামে নিমন্ত্রণে যাইবার কথা, সন্ধ্যার আগে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কি গতিকে যাওয়া হইল না। বাহির হইতে খেলুড়েদের খুব হৈ-চৈ শোনা যাইতেছিল, কিন্তু ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতে সকলে কোন দিক দিয়া কি করিয়া যে পলাইয়া গেল—শঙ্কর দেখিয়াছিল, কেবল তাসগুলি বিছানার উপর ছড়ানো···

টর্চের আলোয় কাঁটাবনের ফাঁকে ফাঁকে সাবধানে দীঘির সোপানের

কাছে গিয়া সে বসিল। জলে জ্যোৎস্না চিকচিক করিতেছে। আলো নিভাইয়া চুপটি করিয়া অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল।

ক্রমে চাঁদ পশ্চিমে হেলিয়া পড়িল। কোনো দিকে কোনো শব্দ নাই, তবু অনুভব হয়—তার চারিপাশের বনবাসীরা ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে। প্রতিদিন এই সময়ে তারা একটি অতি দরকারি নিত্যকর্ম করিয়া থাকে, শঙ্কর যতক্ষণ এখানে থাকিবে ততক্ষণ তা হইবে না—কিন্তু তাড়া বড্ড বেশি। নিঃশব্দে ইহারা তার চলিয়া যাওয়ার প্রতীক্ষা করিতেছে।

হঠাৎ কোনদিক হইতে হু-হু করিয়া হাওয়া বহিল, এক মুহূর্তে মর্মরিত বনভূমি সচকিত হইয়া উঠিল। উৎসবক্ষেত্রে নিমন্ত্রিতেরা এইবার যেন আসিয়া পড়িয়াছে, অথচ এদিকে কোনো কিছুর যোগাড় নাই। চারিদিকে মহা শোরগোল পড়িয়া গেল। অন্ধকার রাত্রির পদধ্বনির মতো সহস্রে সহস্রে ছুটাছুটি করিতেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে কম্পমান ক্ষীণ জ্যোৎস্না, সে যেন মহামহিমার্ণব যারা সব আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গের সিহাহিসৈন্যের বল্লমের সুতীক্ষ্ণ ফলা। নিঃশব্দচারীরা অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শঙ্করকে দেখাইয়া দেখাইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল: এ কে? এ কোথাকার কে—চিনি না তো?

উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শ্রবণশক্তি দিয়া শঙ্কর আরও যেন শুনিতে লাগিল, কিছুদূরে সর্বশেষ সোপানের নিচে কে যে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে! কণ্ঠ অনতিস্ফুট, কিন্তু চাপা কান্নার মধ্য দিয়া গলিয়া গলিয়া তার সমস্ত ব্যথা বনভূমির বাতাসের সঙ্গে চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্ধকারলিপ্ত প্রেতের মতো গাছেরা মুখে আঙ্গুল দিয়া তাহাকে বারংবার থামিতে ইশারা করিতেছে—সর্বনাশ করিল, সব জানাজানি হইয়া গেল!···

কিন্তু কান্না থামিল না। নিশ্বাস রোধ করিয়া ঐ অতল জলতলে চার-শ বছরের জরাজীর্ণ ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে যে মাধুরীমতী রাজবধূ সারাদিনমান অপেক্ষা করে, গভীর রাতে এইবার সে ঘোমটা খুলিয়া

বাহিরে আসিয়া নিত্যকার মতো উৎসবে যোগ দিতে চায়। যেখানে শঙ্কর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল, তাহার কিছু নিচে জলে-ডোবা সিঁড়ির ধাপে মাথা কুটিয়া কুটিয়া বোবার মতো সে বড় কান্না কাঁদিতে লাগিল।

তারপর কখন চাঁদ ডুবিয়া দীঘিজল আঁধার হইল, বাতাসও একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, গাছের পাতাটিরও কম্পন নাই—কান্না তখনও চলিতেছে। অতিষ্ঠ হইয়া কাহারা দ্রুতহাতে চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে ঘন কালো পর্দা খাটাইয়া দিতে লাগিল—শঙ্কর বসিয়া থাকে, থাকুক—তাহাকে কিছুই উহারা দেখিতে দিবে না।

আবার টর্চ টিপিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল। আলো জ্বলিতে না জ্বলিতে গাছের আড়ালে কি কোথায় সব যেন পলাইয়া গিয়াছে, কোনোদিকে কিছু নাই।

তখন শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে কহিতে লাগিল, আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি আর কাঁদিও না হে লজ্জারুণা রাজবধূ, মৃণালের মতো দেহখানি তুমি দীঘির তল হইতে তুলিয়া ধরো, আমি তাহা দেখিব না। অন্ধকার রাত্রি, অনাবিষ্কৃত দেশ, অজানিত গিরিগুহা, গভীর অরণ্যভূমি এ সব তোমাদের। অনধিকারের রাজ্যে বসিয়া থাকিয়া তোমাদের ব্যাঘাত ঘটাইয়া কাঁদাইয়া গেলাম, ক্ষমা করিও—

যাইতে যাইতে আবার ভাবিল, কেবল এই সময়টুকুর জন্য কাঁদাইয়া বিদায় লইয়া গেলেও না-হয় হইত। তাহা তো নয়। সে যে ইহাদের একেবারে উদ্বাস্তু করিতে এখানে আসিয়াছে। জরিপ শেষ হইয়া একজনের দখল দিয়া গেলে বন কাটিয়া লোকে এখানে টাকা ফলাইবে। এত নগর-গ্রাম মাঠ-ঘাটেও মানুষের জায়গায় কুলায় না—তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে, পৃথিবীতে বন-জঙ্গল এক কাঠা পড়িয়া থাকিতে দিবে না। তাই শঙ্করকে সেনাপতি করিয়া আমিনের দলবল যন্ত্রপাতি নকশা কাগজপত্র দিয়া ইহাদের এই শত শত বৎসরের শান্ত নিরিবিলি বাসভূমি আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দিয়াছে। শাণিত খড়্গের মতো ভজহরির সেই সাদা সাদা দাঁত মেলিয়া হাসি—উৎপাত কি আমরা কম

করছি হুজুর? সকাল নেই, সন্ধে নেই, কম্পাস নিয়ে চেন ঘাড়ে করে করে····

কিন্তু মাথার উপরে প্রাচীন বনস্পতিরা ভ্রূকুটি করিয়া যেন কহিতে লাগিল, তাই পারিবে নাকি কোনো দিন? আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাল ঠুকিয়া জঙ্গল কাটিতে কাটিতে সামনে তো আগাইতেছ আদিকাল হইতে, পিছনে পিছনে আমারাও তেমনি তোমাদের তাড়াইয়া চলিয়াছি। বনকাটা রাজ্যে নূতন ঘর তোমরা বাঁধিতে থাক, পুরনো ঘড়বাড়ি আমরা ততক্ষণ দখল করিয়া বসিব।····

হা-হা-হা-হা-হা তাহাদেরই হাসির মতো আকাশে পাখা ঝাপটাইতে ঝাপটাইতে কালো এক ঝাঁক বাদুড় বনের উপর দিয়া মাঠের উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল ঃ ···

বনের বাহির হইয়া শঙ্কর ঘোড়ায় চাপিল। ঘোড়া আস্তে আস্তে হাঁটাইয়া ফিরিয়া চলিল।—মিদনের বনে ডালে ডালে ঝাঁক-বাঁধা জোনাকি ; আলের গুটি ঝড়িতেছে তার টুপটাপ শব্দ, অজানা ফুলের গন্ধ···বারবার পিছন দিকে সে ঘিরিয়া ঘিরিয়া তাকাইতে লাগিল। অনেক দূরে কোথায় কুকুর ডাকিতেছে। কাহাদের বাড়িতে আকাশ প্রদীপ আকাশের তাহার সহিত পাল্লা দিয়া দপাদপ করিতেছে··· ····এইবার গিয়া সেই নিরালা তাঁবুর মধ্যে ক্যাম্পে ঘরটির উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুম দিতে হইবে। যদি এই সময় মাঠের এই অন্ধ-কারের মধ্যে সুধারাণী আসিয়া দাঁড়ায়···কপালে জ্বল জ্বলে সিঁদুর, একপিঠ চুল এলাইয়া টিপটিপি দুষ্টামির হাঁসি হাসিতে হাসিতে যদি সুধারাণী ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুই চোখ ভরিয়া তার দিকে তাকাইয়া থাকে····মাথার উপর তারাভরা আকাশ, কোন দিকে কেউ নেই—ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া ফেলিবে, হাত ধরিয়া কঠোর স্বরে শুনাইয়া দিবে—কে শুনাইবে সে? শুধু তাহাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিবে: কি করেছি আমি তোমার?

এই সময় হঠাৎ লাফ দিয়া ঘোড়া একটা আল পার হইল। শঙ্করের হুঁশ হইল, এতক্ষণের মধ্যে এখনও গড়খাই পার হয় নাই—ক্রমাগত বেড়িয়া ঘোড়া ক্রমাগত ধান ক্ষেত্রের উপর দিয়াই চলিয়াছে। জুতা পায়ে জোরে ঠোক্কর দিল, আচমকা আঘাত পাইয়া ঘোড়া ছুটিল। গড়খাইয়ের যেন শেষ নাই, যত চলে ততই ধান বন, দিক ভুল হইয়া গিয়াছে, মাঠে না উঠিয়া ধানবন ঘুরিয়া মরিতেছে। শঙ্করের মনে হইতে লাগিল, যেমন এখানে যে মজা দেখিতে আসিয়াছিল, ঘোড়া যুদ্ধ তাহাকে ঐ ধরনের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সমস্ত রাত ছুটিলে কেবল বন প্রদক্ষিণ করিতে হইবে—নিষ্কৃতি নাই—গড়খাই পার হইয়া মাঠে পৌঁছানো রাত পোহাইবার আগে ঘটবে না। জেদ চাপিয়া গেল, ঘোড়া জোরে আরোও জোরে বিদ্যুতের বেগে ছুটাইল, ভাবিল এমনি করিয়া সেই অদৃশ্য ভয়ানক বাঁধন ছিঁড়িবে। আরও একটা উঁচু আল, অন্ধকারে ঠাহর হইল না, ছুটিতে ছুটিতে হুমড়ি খাইয়া ঘোড়া সমেত তাহার উপর পড়িল। শঙ্করের মনে হইল, ঘোড়ার ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে আলের উপর কে জোরে আছাড় মারিল। তীব্র আর্তনাদ করিতে করিতে সে নিচে গড়াইয়া পড়িল। ঘোড়াও ভয় পাইয়া গেল, শঙ্করকে মাড়াইয়া ফেলিয়া ঝড়ের মতো মাঠে গিয়া উঠিল, শুকনা মাঠের উপর দ্রুতবেগে খুর বাজাইতে লাগিল—খটখট খটখট। রাত্রির শেষ প্রহর, আকাশে শুকতারা জ্বলিতেছে। চারশ বছর আগে যেখানে একদা জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া ছিলেন, সেইখানে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, সেই জানকীরাম কোন দিক হইতে আসিয়া তাহাকে ফেলিয়া ঘোড়া কাড়িয়া লইয়া উত্তর মাঠের ওপারে তেঘরা বকচরের দিকে চলিয়া যাইতে লেন। ঘোড়ার খুরের শব্দ আঁধার মাঠে ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

বনফুল

চিঠি পাওয়ার পর

১

সমস্ত দিনটা যেন আর কাটিতে চাহিতেছে না।

তাহাকে আর একবার দেখিতে পাঁইব এই আশায় বিভোর হইয়া রহিয়াছি। যাহাকে জন্মের মত ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, আবার যে তাহাকে দেখিতে পাইব এ কল্পনাও করি নাই। সে যে এ-পথে আসিতে পারে তাহার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত ছিল না। অসম্ভব কিন্তু সম্ভব হইয়াছে। সে আসিতেছে এবং আমি তাহার দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়া



উঠিয়াছি। আমার বিগত স্বপ্ন-জীবন পুণরায় স্বপ্নায়িত হইয়া উঠিয়াছে। যদিও মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য, যদিও তাহার স্বামী সঙ্গে থাকিবে, তথাপি এই ঘটনাকে আমার জীবনের বৃহত্তম ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছে। যত কম সময়ের জন্যই হউক এবং যে-ভাবেই হউক তাহাকে আর একবার দেখিতে পাইব ত'! তাহাই যে পরম লাভ। চিঠিখানা আবার খুলিয়া পড়িলাম।

শ্রীচরণেষু,

উনি লক্ষ্ণৌ বদলি হয়েছেন। পাটনা হয়েই আমরা যাব। আমাদের গাড়ি পাটনায় রাত্রি সাড়ে আটটায় পৌঁছবে। পাঁচ মিনিট মাত্র থামবে। আপনি যদি স্টেশনে আসেন সুখী হব। অনেকদিন আপনাকে দেখিনি। দেখতে ইচ্ছা করে। আসবেন ত'? আশা করি আমাকে একেবারে ভুলে যাননি।

২

কিছুই ভুলি নাই।

অতীতের সেই স্বপ্নময় দিনগুলি তাহাদের সমস্ত বর্ণসুষমা লইয়া আবার ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে সেই দিনটির কথা, যে-দিন অনেক ইতস্ততঃ করিয়া আশা-আশঙ্কা-উদ্বেল হৃদয়ে তাহাকে প্রথম প্রণয়-নিবেদন করিয়াছিলাম। মনে ভয় ছিল যদি সে ভুল বোঝে—যদি সে রাগ করে। কিন্তু সে কিছুই করে নাই। স্মিতমুখে সহজভাবে সে আমার নিবেদন শুনিয়াছিল। তাহার লজ্জারুণ কপোল, আকম্পিত অধর, আনন্দিত নয়ন—তাহার সেইদিনকার সম্পূর্ণ আলেখ্যখানি আমার মনের পরতে পরতে উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা রহিয়াছে। কখনও বিলুপ্ত হইবে না। পরিপূর্ণ সুখ মানুষের জীবনে বহুবার আসে না। আমার জীবনে একবাব মাত্র আসিয়াছিল। আর আসিবে না তাহাও জানি। স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইতে হইবে। ভুলিলে চলিবে কেন! ভুলি নাই! এক দণ্ডের জন্যেও তোমাকে ভুলি নাই, ভুলিতে পারি না।

এ-জীবনে বহির্লোকে পাই নাই তাহা সত্য, কিন্তু আমার অন্তর-লোকে যে-আসন তুমি অলঙ্কৃত করিবে সে আসন এখনও অবিচলিত আছে এবং চিরকাল থাকিবে। তুমি ত' আমাকে চাহিয়াছিলে,—সমস্ত প্রাণ দিয়াই চাহিয়াছিলে, কিন্তু-আমি তোমাকে লইতে পারিলাম কই? তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই তোমাকে ছাড়িয়া আসিতে হইল।

আমার দুর্ভাগ্য আমি একাই বহন করিব। ইহাই আমার ললাটলিপি। তোমাকে ইহার অংশভাগিনী করিব কেন? তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম বলিয়াই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।

৩

ভগবান্ বলিয়া কেহ আছেন হয়ত। এই নিখিল বিশ্বের কার্য্য-কলাপ তাঁহারই অমোঘ বিধানে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এই ধারণা করিয়া নির্ম্মম নির্য্যাতনের মধ্যেও আমরা কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করি। তাহা না হইলে অসহায় মানব অকারণ দুঃখের বোঝা বহিতে পারিত না। কে একজন মনীষী নাকি বলিয়াছেন যে, ভগবান্ যদি না-ও থাকেন, নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে একটা ভগবান্ আমাদের সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। মানুষের পক্ষে ভগবান্‌হীন জীবন অশান্তিজনক। আমিও আমার এই দুর্ভাগ্যটাকে অমোঘ বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলাম। মানিয়া লইয়াছিলাম যে, যিনি আমার স্বপ্ন-সৌধ শীর্ষে নিদারুণ বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তৃষিত-অধর-সমীপবর্ত্তী সুধা-পাত্রকে যিনি অপ্রত্যাশিত রূঢ় আঘাতে বিচূর্ণিত করিয়াছিলেন, তিনি করুণাময় পরমেশ্বরই। যাহা করিয়াছেন তাহা উচিত বলিয়াই করিয়াছেন। ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া আমরা তাঁহার বিধানের নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারি না। সুতরাং তাঁহার কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিতে আমরা যে শুধু অপারগ তাহাই নয়—অনধিকারীও। নিরুপায় মনে এই যুক্তি মানিয়াছিল। অমিতাকে ভালবাসিয়াছিলাম। অমিতাও আমাকে ভালবাসিয়াছিল। অমিতার পিতামাতার আপত্তি ছিল না। আমার দিকে পিতামাতাই ছিল না। তবু বিবাহ হইল না। সমস্ত যখন ঠিকঠাক, হঠাৎ একদিন কাশিতে এক ঝলক রক্ত আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। জীবাণুতত্ত্ববিৎ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে সমস্ত শুনিয়াও অমিতা কিন্তু আমাকে চাহিয়াছিল। কিন্তু পারিলাম না।

বিবেকে রাখিল।

৪

অমিতার অন্যত্র বিবাহ হইয়া গেল।

অমিতার মত পাত্রী পড়িয়া থাকে না। সুন্দর স্বভাব, সুন্দর চেহারা, সুন্দর শিক্ষা। অমিতার মত মেয়ে বাংলা দেশে বেশী নাই। আমার চোখে ত' আর একটিও পড়িল না। রূপসী শিক্ষিতা মেয়ে হয়ত অনেক আছে, কিন্তু অমন স্নিগ্ধ, অমন সুরভিত সুমিষ্ট স্বভাব ত' আর দেখিলাম না। অমিতার পিতামাতা অমিতার জন্য যে পাত্রটিকে নির্ব্বাচিত করিলেন তিনিও অমিতার উপযুক্ত। বড় বংশের ছেলে, বড় চাকুরি করেন। স্বাস্থ্যবান্, সুরূপ ভদ্রলোক। কোন দিক্ দিয়াই কোন খুঁৎ নাই। আইনতঃ অমিতার সুখে থাকিবার কথা। হয়ত সুখেই আছে। কিন্তু কেন জানি না আমার অন্তরনিবাসী অবুঝ ব্যক্তিটির বিশ্বাস, অমিতা সুখে নাই! আমার ধারণা, অমিতা আমাকে পাইলেই বেশী সুখী হইত। যদিও আমি অমিতার স্বামীর অপেক্ষা সব দিক্ দিয়াই নিকৃষ্ট, তথাপি মনে হয় অমিতা এখনও মনে মনে আমারই প্রতীক্ষা করিতেছে। অত্যন্ত যুক্তিহীন এই স্বপ্নটিকে আমি মনে মনে আঁকড়াইয়া আছি যে, তাহার স্বামীর বড় বংশ, ভাল চাকুরি, সুন্দর রূপ, অটুট স্বাস্থ্য সত্ত্বেও সে ততটা সুখী নয়, যতটা সুখী সে হইতে পারিত যদি আমি তাহাকে বিবাহ করিতাম। হয়ত ইহা আমার অহমিকা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই অহমিকাটুকুকে আশ্রয় করিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি। সর্ব্বগ্রাসী জলপ্লাবনে সমস্ত ডুবিয়া গিয়াছে, অহমিকার ক্ষুদ্র দ্বীপটুকু শুধু জাগিয়া আছে। অত্যন্ত নিঃসঙ্গভাবে তাহারই উপর দাঁড়াইয়া আমি বাঁচিয়া আছি।...

আবার তাহার চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলাম।

৫

দেখা হইলে কি বলিব তাহাকে

এত দিন পরে দেখা—পাঁচ মিনিটের জন্য। স্টেশনের ভিড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কি তাহাকে বলিব! অথচ কত কথাই মনের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত কথা গুছাইয়া বলিব কেমন করিয়া! হয়ত কিছুই বলা হইবে না। হয়ত অতি সাধারণ কুশল প্রশ্নের ভিতর দিয়াই এই অতিশয় মূল্যবান্ পাঁচটি মিনিট অতিবাহিত হইয়া যাইবে। জীবনে হয়ত তাহার সহিত আর দেখাই হইবে না। হয়ত···সহসা মনে হইল তাহার স্বামী সঙ্গে থাকিবে। আবার পত্রখানি খুলিয়া পড়িলাম।

৬

সমস্ত দিন বাজারে ঘুরিয়াছি।

কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের ডালমুট অমিতার বড় প্রিয়-বস্তু ছিল। নানা স্থানে ঘুরিয়াও ঠিক সে রকম ডালমুট যোগাড় করিতে পারিলাম না। হয়ত এখানকার জিনিস তাহার পছন্দ হইবে না। একজনকে ফরমাস দিয়াছি। সে আশ্বাস দিয়াছে সন্ধ্যা নাগাদ ভাল ডালমুট প্রস্তুত করিয়া দিবে। ডালমুট ছাড়া অমিতার জন্য আর যে কি লইয়া যাইব স্থির করিতে পারিতেছি না।

* * *

জামা কাপড় ময়লা হইয়া গিয়াছে।

মেসের চাকরটাও ছুটি লইয়া বাড়ি গিয়াছে। নিজেই একটা জামা ও কাপড়ের সাবান দিতে বসিলাম। ময়লা জামা কাপড় পরিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে পারিব না।

* * *

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ মনে পড়িল কিছু গোলাপ ফুল যোগাড় করিয়া লইয়া গেলে

হয়। লাল নয়—শাদা গোলাপ। নরেনদের বাড়িতে আছে··· গেলেই পাইব। হাত ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম সাড়ে ছয়টা বাজিয়াছে। এখনও দেরি আছে। নরেনের বাড়ির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম।

৭

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

নরেনদের বাড়ি হইতে যখন বাহির হইলাম, তখন চতুর্দ্দিক অন্ধকার। বড় বড় শাদা গোলাপগুলি অতি সুন্দর। অমিতা নিশ্চয়ই খুশি হইবে। ফুলগুলি পাইতে কিন্তু দেরি হইয়া গেল। নরেন বাড়ি ছিল না, মালীটাও বাহিরে গিয়াছিল। রাস্তায় নামিয়া হাতঘড়িটা আর একবার দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

ট্রেনের এখনও এক ঘণ্টা দেরি আছে। মাত্র সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে। যে লোকটিকে ডালমুটের ফরমাস দিয়াছিলাম সে এখান হইতে কিছু দূরে একটি গলির মধ্যে থাকে। গেলাম সেখানে।

৮

স্টেশন।

নানা ধরনের যাত্রী জিনিসপত্র লইয়া ট্রেনের অপেক্ষা করিতেছে। ডালমুট ও গোলাপ লইয়া আমিও অন্যমনস্কভাবে প্ল্যাটফর্ম্মে পায়চারি করিতেছি। সমস্ত অন্তর জুড়িয়া একটা বেদনাময় অনুভূতি ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইতেছে। কতক্ষণে আসিবে ট্রেনটা? একজন রেলওয়ে-কর্ম্মচারী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম লক্ষ্ণৌ-গামী ট্রেনটির আসিবার কত দেরি আছে?

তিনি নির্ব্বিকার ভাবে বলিলেন—"সে ট্রেন ত' আটটা পঁয়ত্রিশে ছেড়ে গেছে। এ অন্য ট্রেন আসছে। এখন ত' সাড়ে ন'টা!"

সে কি!

নিজের হাত-ঘড়িটা দেখিলাম।

সাড়ে সাতটা বাজিয়া রহিয়াছে!

সহসা মনে হইল আজ সকালে ঘড়িতে দম দিই নাই!

অমিতার চিঠি পাইয়া এমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম যে ঘড়িতে দম দেওয়ার কথা মনেই ছিল না।

বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অন্নদাশঙ্কর রায়

ল্যাভেণ্ডার

১

সন্ধ্যাবেলাটা বেশ আনন্দে কাটল। ভদ্রলোক স্বয়ং ইংরেজী গান গেয়ে শোনালেন। হাসির গান, কিন্তু নিছক হাসির নয়। ফল্গু ধারার মতো প্রচ্ছন্ন ছিল একটা করুণ মধুর সুর। আর তাঁর স্ত্রী শোনালেন সেকালের রবীন্দ্রসঙ্গীত। 'মায়ার খেলা' তিনি অভিনয় করেছিলেন প্রথম বয়সে। তারই অবিস্মরণীয় অবশেষ। আর তাঁর দুই কন্যা শোনালেন মীরার ভজন। দিলীপকুমারের ঢঙে।



মাতানো গান 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী'। মনে মনে আমিও তাঁদের সঙ্গে মিলে গেলুম।

দেশবন্দনার রেশ যখন নিঃশেষ হয়ে এলো তখন আমি ধীরে ধীরে বিদায় নিতে উঠলুম। এসে ছিলুম তাঁদের ওখানে, কল' করতে।

তার পরে তাঁরা চার জনে মিলে গাইলেন অতুলপ্রসাদের গান-

পরিচয় দিতে ও নিতে। ভদ্রলোক ওখানকার কলেজের প্রিন্‌সিপাল। আর আমি ভ্রাম্যমাণ ভ্যাকেশন জজ।

"সে কী! আপনি খেয়ে যাবেন না?" বললেন ভদ্রমহিলা। "আপনার জন্যে সমস্ত তৈরি।"

আশ্চর্য হয়ে বললুম, "কিন্তু ওদিকে সারকিট হাউসে—"

"আমি আগে থাকতে বারণ করে পাঠিয়েছি।"

শুধু তাই নয়। ইতিমধ্যে তিনি আমার হাঁড়ির খবর বার করেছিলেন। আমি যে নিরামিষ খাই তাও তাঁর অজানা নয়। আমার কোনো অজুহাত খাটল না। বসতেই হলো আবার।

খাবার টেবিলে দেখলুম ভদ্রলোক খোশগল্পের রাজা। মণ্টোগোমরী কী বলেছিলেন চার্চিলকে। চার্চিল কী বলেছিলেন তার উত্তরে। এসব তো শুনতে হলোই, তার উপর শুনতে হলো স্টালিন কেমন হারিয়ে দিয়েছিলেন চার্চিলকে ভোজন-প্রতিযোগিতায়। সে ভারী মজার কথা। তাঁর মতো রসিয়ে রসিয়ে বলতে পারব না তো, গল্পটা মাটি করব। থাক, বলব না।

আহারান্তে অমনি চলে যেতে নেই, একটু দেরি করতে হয়। বসবার ঘরের এক প্রান্তে বিশাল বুকশেল্‌ফ্‌ ছিল। সেখানে গিয়ে বইপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। ইংরেজী ও ফরাসী বই বেশীর ভাগ। কত কালের পুরোনো বই। আজকাল সে-সব বই দেখাও যায় না। দেখতে দেখতে একখানা বইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা ল্যাভেণ্ডারের পল্লব। শুকিয়ে মুড়মুড়ে হয়ে গেছে। হাত দিলে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে।

ভদ্রলোক আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমার হাতে ল্যাভেণ্ডারের পল্লব পড়তে যাচ্ছে দেখে হাঁ হাঁ করে উঠল। অপ্রস্তুত হয়ে নামিয়ে রাখলুম বইটা। অমনি তিনি ওখানা সরিয়ে রাখলেন একেবারে নাগালের বাইরে। একটা টুলের সাহায্যে।

হঠাৎ তাঁর এই ব্যবহারে আমি হতভম্ব হয়েছিলুম। তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আমার দুটি হাত ধরে মাফ চাইলেন।

তখন তাঁর দুই চোখের চাউনি যা হলো তা চিরদিন আমার মনে থাকবে। কী যে করুণ আর কাতর আর তৃষিত! আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "আপনি এখনো যুবক। দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে আপনার সামনে। আর আমি বিগতযৌবন। আমার জীবনও তো শেষ হয়ে এলো।"

কেন ও কথা বললেন ভাবছি। তিনি বলতে লাগলেন, "আমার জীবনে যা গেছে তা গেছে, তা আর ফিরে আসবেনা। ওই যে ল্যাভেণ্ডার ও যদি ধুলো হয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে যায় তা হলে আর এ-জীবনে ল্যাভেণ্ডার উপহার পাব না।"

এবার মার্জনা চাইবার পালা আমার। বললুম, "আমাকে ক্ষমা করবেন। বুঝতে পারিনি। না বুঝে অপরাধ করেছি।"

"না, না, অপরাধ কিসের! বলতে গেলে আমারই অপরাধ, আমি ওটা অতিথির হাত থেকে কেড়ে নিয়েছি। ক্ষমা করবেন তো!" রুদ্ধ কণ্ঠে আবেদন করলেন।

আমি তাঁর স্ত্রীর কাছে বিদায় চাইলুম। ভদ্রমহিলা কফি তৈরি করছিলেন। শুনতে পাননি আমাদের কথাবার্তা। তাঁর হাত থেকে কফির পেয়ালা নিয়ে দু'এক চুমুক দিয়ে শুভরাত্রি জানালুম। তাঁকে ও তাঁর কন্যাদের। ভদ্রলোকের দিকে ফিরতেই তিনি বললেন, "চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই।"

এগিয়ে দিতে গিয়ে তিনি আমার সঙ্গে সারকিট হাউস পর্যন্ত হাঁটলেন। বেশী দূর নয়, তা হলেও প্রত্যাশার বাইরে। সারকিট হাউসে পৌঁছে আমি বললুম, "বেয়াদবি মাফ করবেন। সারা সন্ধ্যা মনে হচ্ছিল আপনার মতো সুখী কে! কিন্তু সেই ল্যাভেণ্ডারের ঘটনার পর অন্য রকম মনে হচ্ছে। ওটা না ঘটলেই ভালো হতো।"

তিনি একটু বিশ্রাম করবেন বলে বসলেন। ধীরে ধীরে বললেন, "সুখ অনেক রকম আছে। এক রকম সুখ আজ আপনি দেখলেন। সত্যি তার মতো সুখ নেই। কিন্তু সেও তার মতো নয়। সেই ল্যাভেণ্ডার উপহার পাওয়ার মতো।"

আমি তাঁকে একটু উস্কে দিলুম। তিনি বললেন, শুনবেন নাকি ও কথা?”

বললুম, “আপনার যদি আপত্তি না থাকে।”

তিনি এক গ্লাস জল চেয়ে নিলেন। জল রইল তাঁর হাতের কাছে। মাঝে মাঝে ভিজিয়ে নেন আর গল্প বলেন।

২

দু'চোখ বুজে দুই চোখের উপর দুই হাত রেখে টেবিলের উপর কনুই ভর দিয়ে বসলে প্রথমটা সব অন্ধকার দেখায়। তার পরে ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে ফুটে ওঠে সাঁঝের শুকতারা। সাঁঝের শুকতারার মতো শুভ্র সুন্দর একখানি মুখ। শুভ্র সুন্দর শুচি। অন্ধকারে ঐ একটি মাত্র তারা।

তার সঙ্গে আমার দেখা হয় পঁচিশ বছর আগে। লণ্ডনে তখনকার দিনে আমাদের বাঙালী সমাজের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল বেলসাইজ পার্কে মিস্টার ও মিসেস তরফদারের বাড়ী। প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যায় তাঁরা রিসিভ করতেন। সকলে অবশ্য সব শনিবার যেত না। কিন্তু অন্য কোথাও এনগেজমেণ্ট না থাকলে আমি অন্তত আধ-ঘণ্টার জন্যে হাজিরা দিয়ে আসতুম।

এমনি এক সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আমার দেখা। মিস তরফদারের বান্ধবী বলে তার পরিচয়। শুনলুম বেডফোর্ড কলেজে পড়ে। শনিবারটা প্রায়ই তরফদারদের সঙ্গে কাটায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি তার মেয়াদ। সাধারণতঃ ছ'টার মধ্যে ফিরে যায়। কিন্তু সেদিন কী জানি কেন আটটা পর্যন্ত আটকা পড়েছিল।

আমি উঠছি দেখে মিসেস তরফদার বললেন “বরুণ, তোমাকে একটা কাজ দিতে পারি? কিছু মনে করবে না তো?”

“কাজ দেবেন, সে তো আমার সৌভাগ্য, মাসিমা। কিছু মনে করব কেন।”

"তা হলে শোন। এই যে পূরবী দেখছ একে পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। আজ এর খুব দেরি হয়ে গেছে। তুমি যদি দয়া করে পৌঁছে দাও তো—"

"চিরকৃতজ্ঞ হবেন তো? আচ্ছা, আমি এই সুখকর কর্তব্য স্বীকার করছি।"

সেখানে আরো কয়েক জন গ্যালাণ্ট যুবা ছিল। তারা কেবল ফষ্টি-নষ্টি করতে জানে, কিন্তু হাতের তাস ফেলে একজনও উঠবে না। বসে বসে দু'কথা শুনিয়ে দিল আমাকে। আমি তাদের কথায় কান না দিয়ে পূরবীকে তার ফারকোট গায়ে দিতে সাহায্য করলুম ও বাইরে যাবার জন্যে দরজা খুলে ধরলুম।

সেদিন বেশ বৃষ্টি পড়ছিল মনে আছে। ছাতা ছিল আমার সঙ্গে। তুলে ধরলুম ওর মাথায়। ওর ছাতা ও সঙ্গে আনতে ভুলে গেছল। ফিরে গিয়ে নিয়ে আসবার মতো সময় ছিল না। বেলসাইজ পার্ক টিউব স্টেশনে ওকে ধরতে হবে।

স্টেশনে পৌঁছে পূরবী বলল, "আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। এটুকুরও দরকার ছিল না। তবে আপনি এই দিকে আসছিলেন বলে মাসিমা আপনাকে এ কাজ দেন। তাঁর মতে লণ্ডনের রাস্তায় বিদেশিনী মেয়েদের একা চলাফেরা করতে দেওয়া উচিত নয় এত রাত্রে।"

আমি বললুম, "মাসিমার সাংসারিক অভিজ্ঞতা আপনার চেয়ে বেশী।"

সেদিন আমি ওকে বেডফোর্ড কলেজ পর্যন্ত পৌঁছে দিলুম। পথে ওর সঙ্গে কত রকম কথাবার্তা হলো। ভারী ভালো লাগল ওর সঙ্গ, ওর স্বভাব। আমার ধারণা ছিল আমাদের দেশের সুন্দর মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়, বিয়ে যাদের হয় না তারাই বেশী লেখাপড়া করে ও তাদের কেউ কেউ বিলেত পর্যন্ত আসে। কিন্তু পূরবীকে দেখে আমার সে ধারণা বদলে গেল। সে ডানাকাটা পরী না হলেও তার রূপ দু'দণ্ড চেয়ে দেখবার মতো।

সেদিন বাসায় ফিরে গিয়ে সারা রাত তার কথা ভেবেছি ও তাকে

স্বপ্ন দেখেছি। মনে হয়েছে তার সঙ্গে আমার আলাপ একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। আছে এর পিছনে গ্রহতারার চক্রান্ত। নইলে কেনই বা সে আটটা অবধি আটকা পড়বে, এত লোক থাকতে আমাকেই বা কেন তার পার্শ্বরক্ষী হতে হবে? অদৃষ্ট আমাদের দু'জনকে একসূত্রে গাঁথতে চায়। তা ছাড়া আর কী এর ব্যাখ্যা।

পরের শনিবারের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে কেমন করে যে সাতটা দিন পার করে দিলুম তার হিসেব নেই। একটু সকাল সকাল গিয়ে দেখি যাবার জন্যে পূরবী তৈরি হয়ে বসে আছে। মাসিমা বললেন, "বরুণ, তোমার কথাই হচ্ছিল। কিন্তু আজ আর তোমাকে কষ্ট দেব না। তুমি অনেক দূর থেকে এসেছো, একটু বিশ্রাম করো, একটু কিছু খাও। জিতেন সঙ্গে যাক পূরবীর।"

"না; মাসিমা, কাউকে যেতে হবে না আমার সঙ্গে। এই তো সবে ছ'টা বাজল।" পূরবী একাই যেতে উদ্যত।

এক খাব্‌লা চীনে বাদাম মুখে পুরে এক রাশ চকোলেট পকেটে ভরে হাঁউমাউ করে আমি বললুম, "আমার খাওয়া হয়েছে, মাসিমা। আমিই যাচ্ছি এর সঙ্গে।"

জিতেন তো আমার দশা দেখে হেসে ফেলল। রুমাল দিয়ে আমার দুটো হাত বেঁধে বলল, "চলো, তোমাকে পুলিশে দিয়ে আসি বমাল সমেত।"

মাসিমা বললেন, "বমাল মানে কি চকোলেট না—" পূরবীর দিকে ইঙ্গিত করলেন।

কয়েক শনিবার পরে পূরবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আর পাঁচ জনে মেনে নিল। পূরবী আমার গার্ল, আমি তার beau; আমাদের বিয়ে হবে একদিন-না-একদিন। উৎসাহ এল মাসিমার কাছ থেকে। কিন্তু পূরবী এ বিষয়ে নীরব। সে কিন্তু আমার সঙ্গেই মেশে সব চেয়ে বেশী, আমার সঙ্গে থিয়েটারে যায়, বাসের উপর তলায় বসে শহরে বেড়িয়ে আসে। অথচ আমার সঙ্গে এমন একটা দূরত্ব রেখে চলে যে আমি

অবাক হয়ে যাই তার ব্যবহার দেখে। আর পাঁচ জনে আমাকে মনে মনে হিংসা করছে, কিন্তু আমি কি তাদের হিংসার যোগ্য!

ভেবেছিলুম পূরবীকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করব, আমার সঙ্গে এনগেজমেণ্ট সম্বন্ধে তার কী মত। কিন্তু কিছুতেই ও কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোলো না। শেষে একখানা চিঠি লিখে সাত পাঁচ ভেবে ডাকে দিলুম।

জীবনে সেই আমার প্রথম প্রেমপত্র। তাতে ওকে কী বলে সম্বোধন করেছিলুম, শুনবেন? এঞ্জেল বলে। বলা বাহুল্য চিঠিখানা ইংরেজীতে লেখা।

পূরবী তার উত্তরই দিল না।

পরে যেদিন দেখা হলো জানতে চেয়েছিলুম চিঠিখানা তার হাতে পড়েছে কি না। ওর মুখখানা আরক্ত না হয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল, "তুমি কি জানতে না যে আমি হস্‌টেলে থাকি? আর কখনো অমন কাজ করো না।"

প্রথম পত্রের এই পরিণামের পর দ্বিতীয় পত্র লিখতে আমার সাহস হয়নি। কাজ কী এনগেজমেণ্টের প্রসঙ্গ তুলে? বাক্যে না হোক, কার্যে কি আমরা এনগেজ্‌ড নই? পূরবী আমায় বাক্য দেয়নি, আমিও দিইনি তাকে। কিন্তু আমরা তো পরস্পরের মন বুঝি। তবে আর কী? লোকটা আমি কৃত্রিমতার পক্ষপাতী নই।

এনগেজ্‌ড না হয়েই আমরা এনগেজ্‌ড বলে বন্ধুমহলে গৃহীত হলুম। তবে নিজেদের কাছে ঠিক এনগেজ্‌ডের অধিকার পেলুম না। চুম্বন করতে গিয়ে অদৃশ্য বাধা বোধ করেছি। এঞ্জেলকে চুম্বন করতে সাহস হয়নি। যদি সে কিছু মনে করে। যদি বলে, "আমি কি এতই সুলভ? আমাকে তুমি কী পেয়েছ?"

আপনাকে খুলে বলতে দোষ নেই। আমাদের ভালবাসা সম্পূর্ণ প্লেটোনিক। তা বলে কম সত্য বা কম গভীর নয়। তাকে না দেখতে পেলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যেত। দেখা হলে প্রাণ ফিরে আসত। তার চোখে মুখে যা লক্ষ্য করেছি তা আমার সঙ্গ পেয়ে সহজ আনন্দ।

সে আর কারো দিকে ফিরেও তাকাত না। আমার চোখে চোখ পড়লে তার চোখের তারা জ্বলে উঠত। অনেক সময় ভেবেছি এ কি প্রেম, না এক প্রকার বন্ধুতা? কিন্তু পরীক্ষায় ফেলে দেখেছি প্রেমই বটে। একবার বেলসাইজ পার্কে যাইনি। সে ছুটে এসেছিল হাইগেটে আমার বাসায় আমার খোঁজ নিতে।

তখনকার দিনে মেলামেশা অত অবাধ ছিল না। সেইজন্যে আমার বাসায় তার ছুটে আসা বলতে কতখানি ত্যাগস্বীকার ও বিপদবরণ বোঝায়, তা একালের ছেলেমেয়ের কল্পনার অতীত। আমার ল্যাণ্ড-লেডী তো স্তম্ভিত। পরে আমাকে বলেছিল, "মেয়েটি দেখছি মরিয়ার মতো প্রেমে পড়েছে তোমার। আহা! কী মধুর মেয়েটি!"

ও আমার জন্যে একটা স্কার্ফ বুনে উপহার দিয়েছিল, সেটা ল্যাণ্ড-লেডির নজর এড়ায়নি। বুড়ি বলল, "এর মতো উপহার তোমার কী আছে দেবার? বাজাব থেকে কিনে দিতে যে-কোন লোক পারে।"

বললুম, "আমি তো বুনতে জানিনে। আঁকতেও জানিনে ছাই। আমি আর কী দিতে পারি?"

বুড়ি বলল, "তুমি তো বেশ রাঁধতে পারো দেখি। রেঁধে খাওয়াও না কেন ওকে?"

চমৎকার আইডিয়া। পরের শনিবার নিমন্ত্রণ করলুম পূরবীকে। সে খুশি হয়ে এলো। এখন থেকে প্রায় শনিবার ওর নিমন্ত্রণ মধ্যাহ্ন-ভোজনের। তারপরে মাসিমার ওখানে। রান্নাটা অবশ্য একতরফা নয়। সেও যোগ দিত। কী যে আনন্দ পেয়েছি সেই কয়েক মাস! যতই ওর সঙ্গে মিশতে পাই, ততই বুঝতে পারি ওর সঙ্গে যদি বিয়ে হয় তবে সারা জীবনটা কেটে যাবে কয়েকটা মাসের মতো।

পূরবী কিন্তু বিয়ের কথা ভুলেও মুখে আনে না। কথা উঠলে এড়িয়ে যায়। আমি যদি বলি, আমাদের দু'জনের এই আনন্দকে জীবনব্যাপী করতে হলে বিয়ে না করে উপায় কী, সে বলে, আচ্ছা বিয়ে-পাগলা বুড়ো যা হোক।

কিছুদিন পরীক্ষা নিয়ে মহা ব্যস্ত ছিলুম। দেখা হয়নি। পরীক্ষার

পরে তরফদার মাসিমা বললেন, "এবার তো দেশে ফেরার সময় হয়ে এলো তোমার। তার আগে একটু ঘোরাঘুরি করবে না?"

আমিও সেই কথা ভাবছিলুম। কন্টিনেণ্ট ঘুরতে চাই। কিন্তু পূরবী কি যেতে রাজী হবে? সে না গেলে আমি কী করে যাই? তার কাছাকাছি থাকতে হবে যে। পূরবীর পড়া আর এক বছর বাকী। সে আপাতত দেশে ফিরছে না। একা ফিরতে হবে আমাকেই। সেইজন্যে এই দুটি মাস তার কাছাকাছি থাকা এত জরুরি। কন্টিনেণ্টে বেড়ানো অবশ্য আমার অনেক দিনের শখ। কিন্তু দুটোর মধ্যে একটা যদি বেছে নিতে হয় তবে পূরবীর কাছাকাছি থাকা আরো জরুরি।

পূরবীর কানে গেল এ কথা। সে বলল, "বুড়ো, এ তোমার নতুন এক পাগলামি। আবার কবে এ দেশে আসবে! হয়তো এ জীবনে নয়। এ সুযোগ হাতছাড়া করলে পশ্‌তাবে। যাও, কন্টিনেণ্ট দেখে নাও।"

ভয়ে ভয়ে বললুম, "তুমি যাও তো আমি যাই।"

সে হাসল। "পড়োনি রবি ঠাকুর কী লিখেছেন? পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নহিলে খরচ বাড়ে।"

পড়েছি। সত্যি, গুরুদেব যদি আর কিছু না লিখে শুধু ঐ একটি পঙ্‌ক্তি লিখে থাকতেন তা হলেও তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত হতো। ঐ একটি উক্তির দাম লাখ টাকা। আমার পকেট তখন গড়ের মাঠ। ধারকর্জ করে কোনো মতে একজনের কন্টিনেণ্ট বেড়ানো চলে। দু'জনের জন্যে কার কাছে হাত পাতি?

ও যে আমাকে পতি বলে স্বীকার করে নিল এর জন্যে আমার আনন্দের সীমা রইল না। ওর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে দেখলুম আনন্দটা পারস্পরিক।

বললুম, "পতির পুণ্যে কাজ নেই। আমি যাব না। শেষ দুটো মাস সতীর কাছাকাছি কাটাব।"

তার দৃষ্টির দীপ থরথর করে কাঁপল। সে বলল, "আমি যাচ্ছি

মেরিয়নের সঙ্গে পাড়াগাঁয়ে থাকতে। তার অতিথি হয়ে। তুমি থাকবে কোথায় ?”

তাই তো। আমি থাকব কোথায় ? আর থাকতে ভালো লাগবে কেন পাড়াগাঁয়ে পাক্কা দু'মাস ? ও মেয়েরাই পারে। আমরা পুরুষ, আমরা সুদূরের পিয়াসী।

চললুম কন্টিনেন্ট বেড়াতে। একা একা ভালো লাগে না, দল জুটিয়ে নিলুম। হৈ হৈ করে আমরা কয়েকজন যুবক আজ এখানে যাই, কাল ওখানে যাই, খরচ বাঁচানোর জন্যে ট্রেনে রাত কাটাই, কিংবা সরাইখানায়, কিংবা হস্‌পিসে। এই জন্যেই বলে 'পথে নারী বিবর্জিতা।' পুরবীকে সঙ্গে আনলে অর্ধেক ফুর্তি বাদ পড়ত, জীবনটা সেই পরিমাপে নীরস হতো। কোথায় কাফে, কোথায় কাবারে, কোথায় চোরডাকাতের আস্তানা। আমি ও আমার থ্রী মাস্‌কেটীয়ার্স মিলে কত বার বিপদের সন্ধানে গেছি, সামনে পড়েছি। দৈবাৎ রক্ষা পেয়েছি। সে ছিল বটে একটা বয়স। সে-সব দিন আর ফিরবে না।

ফ্রান্স থেকে জার্মানী, জার্মানী থেকে অস্‌ট্রিয়া, অস্‌ট্রিয়া থেকে সুইটজারল্যাণ্ড, সুইটজারল্যাণ্ড থেকে ইটালী, ইটালী থেকে আবার ফ্রান্স হয়ে ইংলণ্ড। পুরবীর জন্যেই ইংলণ্ডে ফেরা, নইলে কোনো দরকার ছিল না।

বিদায় নিতে গেলুম ইষ্টবোর্নে। সেখানে সে তরফদারদের অতিথি। আমাকে দেখে তার দৃষ্টিপ্রদীপ উজ্জ্বল হলো। বলল, “খুব উপভোগ করলে ?”

সত্যি খুব উপভোগ করেছিলুম, কিন্তু সত্য গোপন করাই বোধ হয় সুবুদ্ধি। বললুম, “কই আর উপভোগ করলুম। তুমি ছিলে না।”

সে হেসে বলল, “কথাটা পতির মতোই হলো। আদর্শ পতির।”

ধরা পড়ে গেলুম। সাফাই মুখে জোগাল না। বললুম, “তুমি কিন্তু শুকিয়ে গেছ।”

সে ঈষৎ কুপিত হয়ে বললে, “বরুণ, থাক। পতিগিরি যথেষ্ট হয়েছে।”

সমুদ্রের ধারে বসে দু'জনে দু'জনকে হৃদয় খুলে দেখিয়েছিলুম সেই একদিন। গোধূলি যেন ফুরোতে চায় না। শরৎ গোধূলি।

বললুম, "পূরবী, তোমার উপরে নির্ভর করছে আমার জীবনে সুখ সার্থকতা। তুমি যদি আমাকে বিয়ে না কর তা হলে যে আমি বাঁচব না তা নয়, কিন্তু জীবনে আমার সুধা থাকবে না। সুধার বদলে থাকবে সুরা। হৈচৈ, উত্তেজনা, নিজেকে মাতিয়ে রাখা, তোমাকে ভুলে থাকা। যে ভাবে এই দু'মাস কাটল।"

সে অনেকক্ষণ নীরব থাকল। তার পর ক্ষীণ স্বরে বলল, "তুমি বিয়ে করোনি, বিয়ের ভিতর দিয়ে যাওনি, তাই বিয়ে তোমার কাছে একটা সুখস্বপ্ন। আমার কাছেও একদিন সুখস্বপ্ন ছিল। এখন কিন্তু দুঃস্বপ্ন।"

আমি চমকে উঠলুম। এ কী শুনছি! তা হলে কি সে বিবাহিতা!

"হাঁ, যা ভেবেছ। এত দিন তোমাকে বলিনি। বলার সময় আসেনি। আজ না বললে নয়। আমাকে বিয়ে করতে হয়েছে, বিয়ের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। চাও তো সব খুলে বলতে পারি, কিন্তু কী হবে ইল্লং ঘেঁটে! জেনে নাও যে আমার সুখস্বপ্ন ভেঙে গেছে। যা দেখেছি তার থেকে আমার এই প্রতীতি হয়েছে যে বিয়ের পরে মানুষের পতন হয়। দু'বছর পরে এক দিন হিসাবনিকাশ করে দেখলুম আমি ছোট হয়ে গেছি, আমার স্বামী আমার চেয়েও ছোট। তাঁর কাছ থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে এলুম এ দেশে। কিছু স্ত্রীধন ছিল। পড়াশুনা করছি, পাশ করলে চাকরি পাব আশা করি। স্বামীকে অনুমতি দিয়ে এসেছি আবার বিয়ে করতে। তিনি করেছেনও।"

হতবাক হয়ে শুনছিলুম। এ কি সত্য, না আমাকে ভোলাবার জন্যে স্তোকবাক্য! সোজা বললেই পারে আমাকে বিয়ে করতে তার ইচ্ছা নেই, আমি তার অযোগ্য। কিন্তু এসব বানিয়ে বলা কেন? আমার চোখে ধূলো দেওয়া কি অত সহজ?

"বিয়ে করে থাকলে তোমার নাম হতো মিসেস অমুখ। কিন্তু তা তো নয়। মিস চৌধুরী তোমার নাম।"

"সেটা আমার কুমারী অবস্থার নাম। ইউনিভার্সিটির কাগজপত্রে সেই নাম ছিল। এখানে নাম লেখবার সময় কাগজপত্র বদলাইনি। সহপাঠিনীরা জানে আমি মিস চৌধুরী। মণিকা সেই নাম তার বাড়িতে প্রচার করে দিয়েছে। সকলে সেই নামে ডাকে। সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে তার প্রতিবাদ করিনি। কেনই বা করব? বিয়ে তো আমার চুকে গেছে। আমি তো আর বিবাহিতা নই।"

কান্না আমার বুকে আছাড় খাচ্ছিল। আর একটু হলে চোখের বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। একরাশ বিদেশীর সুমুখে কান্নায় গলে যাব, আমি কি এতই নরম!

মূকের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম তার মুখে। সে বলতে লাগল, "আমি তোমাকে ঠকাতে চাইনি, ঠকাইনি। তুমি আমাকে ভালোবাসো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমাদের ভালোবাসা আমাদের উন্নত করেছে। হিসাবনিকাশ করলে দেখবে তুমি ও আমি কেউ কাউকে ছোট করিনি, ছোট হইনি। দু'জনেরই উচ্চতা বেড়ে গেছে।"

আমি তা স্বীকার করলুম। কিন্তু আমার আকাশজোড়া কেল্লা যে ধ্বসে গেল। একটা দিনের একটা মুখের কথায় এত বড় পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি হবে! এটা কেমন করে মেনে নিই! ক্ষোভ আর অভিমান আমাকে বিদ্রোহী করেছিল।

"তুমি যদি চাও," সে তার অমিয়মাখা সুরে বলতে লাগিল, "তবে আমাদের এখনকার এই সম্বন্ধ চিরদিনের হতে পারে। আমিও বিয়ে করব না, তুমিও বিয়ে করবে না। এই ইংলণ্ডেই কাজকর্ম খুঁজে নেব দু'জনে। এমনি কাছাকাছি থাকব। এমনি ভালোবাসব। এর চেয়ে মধুর সম্বন্ধ আর কী হতে পারে! কিন্তু আমি তোমাকে বলব না একে চিরন্তন করতে। আমি জানি তুমি সুখস্বপ্ন দেখছ। আমাকে ঘিরে ততটা নয় বিয়েকে ঘিরে যতটা। যাও তবে, বিয়ে করো একটি মনের মতো মেয়ে। সুখী হও। আমার অন্তরের প্রার্থনা তুমি সুখী হও।"

এর পরে আমাদের বিদায়। বিদায়ের দিন সে আমাকে একখানি

বই উপহার দেয়, কবিতার বই, ক্রিষ্টিনা রোজেটির। তাতে গোঁজা ছিল একটি ল্যাভেণ্ডারের পল্লব।

৩

গল্প শেষ হয়ে গেছে, বুঝতে পারিনি। জানতে চাইলুম, "তার পরে?"

"তার পরে?" ভদ্রলোক কী বলবেন খুঁজে পেলেন না। "তার পরে আমি সুখী হলুম, সফল হলুম। দেখছেন তো কেমন সুখী পরিবার আমার? চাকরিটাও সুখের চাকরি। দেদার বই কিনি আর পড়ি। গান শুনি আর করি। ছেলেরা মাঝে মাঝে দিক করে। ধর্মঘটের ভয় দেখায়। আমিও ভয় দেখাই ইস্তফার। আমার দিন তো প্রায় হয়ে এলো। সামনের বছর রিটায়ার করছি। কোথায় বসব, বলতে পারেন? কলকাতায় যা ভিড়।"

রাত হয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে ভদ্রমহিলা নিশ্চয় ঘড়ি দেখছেন। শুধু একটি জিজ্ঞাসা ছিল। পূরবী দেবীর কী হলো?

"বিলেতেই রয়ে গেল। এখনো সেইখানেই আছে। বড়দিনের সময় কার্ড পাঠাই, কার্ড পাই।"

(১৯৫২)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নারী ও নাগিণী

ইঁটের পাঁজা হইতে খোঁড়া শেখ ইট ছাড়াইতেছিল। খোঁড়া শেখের নাম যে কি তাহা কেহ জানে না, বোধ করি খোঁড়ার নিজেরও মনে নাই কোন্ শৈশবে তাহার বাঁ পাখানি ভাঙার পর হইতেই সে খোঁড়া নামেই চলিয়া আসিতেছে। শুধু পাখানি তাহার খোঁড়া নয়, যৌবনে কদাচারের ফলে কুৎসিত ব্যাধিতে খোঁড়ার নাকটা বসিয়া গিয়াছে—



যেখানে দেখা যায় শুধু একটা বীভৎস গহ্বর। তারপর হয় তাহার বসন্ত। সেই বসন্তের দাগে কুৎসিত খোঁড়া দেখিতে ভয়ঙ্কর হইয়া

আপনাব মনেই খোঁড়া ইট ছাড়াইতেছিল।

অদূরে অদাই ওয়ফে ওয়াদেদ শেখ গাড়ি লইয়া আসিতেছিল। গরু দুইটার লেজ দুমড়াইয়া সে গান ধরিয়া দিল—একটি অশ্লীল গান। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার তাল ভঙ্গ হইয়া গেল। গরু দুইটা হঠাৎ থমকিয়া

দাঁড়াইয়া পড়িল। অদাই একটা ঝাঁকানি খাইয়া গান ছাড়িয়া বলিয় উঠিল, শালার গরু, কিছু না বলেছি—

প্রচণ্ড ক্রোধে পাচন-ছড়িটা সে তুলিল গরু দুইটার অবাধ্যতার শাস্তি দিতে। গরু দুইটাও ক্রমাগত ফোঁস ফোঁস করিয়া গর্জন করিতেছিল। অদাইয়ের কিন্তু প্রহার করা হইল না, সে চিৎকার করিয় উঠিল খোঁড়া, সাপ-সাপ!

অদাইয়ের গাড়ির সম্মুখেই একটি কিশোর সাপ ফণা তুলিয়া অল্প দুলিতেছিল। অদাই গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একটি ইট উঠাইল।

ওদিকে খোঁড়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ছুটিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল, মারিস না অদাই, মারিস না। যাই, আমি যাই।

অদাইয়ের হাতের ইট তোলাই রহিল, সে বলিল, কি বাহারের সাপ মাইরি! মুখখানা সিঁদুরের মত টকটকে লাল। মাথার চক্করই বা কি বাহারের! কিন্তু পালাল—পালাল যে, শিগগির আয়।

সাপটা এইবার দ্রুতবেগে পলাইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু চলিয়াছিল খোঁড়ার দিকেই, অদাইকে পিছনে ফেলিয়া পলায়নই তাহার উদ্দেশ্য। খোঁড়াকে সে দেখে নাই।

খোঁড়া হাঁকিল, দে তো অদাই তোর পাচনখানা ছুঁড়ে। যাঃ রে, ঢুকে পড়ল পাঁজার ভেতর! উদয়নাগ রে সাপটা, এ সাপ বড় পাওয়া যায় না। ধরতে পারলে কিছু রোজগার হত রে।

খোঁড়া সাপের ওঝা। শুধু ওঝা নয়, সাপ লইয়া খেলাও সে করে। ঘরের চালের কানাচে বড় বড় মুখ-বন্ধ হাঁড়ি তাহার খাটানোই আছে। তাহারই মধ্যে সাপগুলোকে সে বন্দী করিয়া রাখে। জীর্ণ হইলে দূর মাঠে গিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিয়া আসে। কত সাপ মারিয়াও খায়। সাপ যখন থাকে, তখন খোঁড়া মজুর খাটে না। তখন দেখা যায়, বিষম-ঢাক ও তুবড়ি-বাঁশি লইয়া খোঁড়া সাপের খেলা দেখাইতে চলিয়াছে। রোজগারও মন্দ হয় না। কিন্তু গাঁজা আফিমের বরাদ্দ তখন বাড়িয়া যায়। কখনও কখনও মদও চলে। সাপগুলি শেষ

হইবার সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়া আবার ঝুড়ি ও বিড়া লইয়া বাহিত হয়। অবস্থাবান গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে বীভৎস মুখখানি বাড়াইয়া বলে, মজুর খাটাবে গো—মজুর ?

তোষামোদ করিয়া সে হাকে, বীভৎস ভয়ঙ্কর মুখ আরও বীভৎস আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে ; মজুরি মিলিলে সে প্রাণপণে খাটে, সেখানে সে ফাঁকি দেয় না। যেদিন না মেলে, সেদিন ঝুড়ি কাঁধেই ভিক্ষা আরম্ভ করে। যাহা পায় তাহা দিয়াই খানিকটা গাঁজা-আফিম কেনে কিনিয়াও যদি কিছু থাকে, তবে খানিকটা পচাই-মদ গিলিয়া বাড়ি ফিরিয়া জোবেদা বিবির পা ধরিয়া কাঁদিতে বসে, বলে, আমার হাতে পড়ে তোর দুর্দ্দশার আর সীমা থাকল না ! না খেতে দিয়ে তোকে মেরে ফেললাম।

জোবেদা হাসিতে হাসিতে স্বামীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলে, লে-লে, খেপামি করিস না, ছাড়্ আমাকে—দুটো চাল দেখে আনি।

খোঁড়ার কান্না বাড়িয়া যায়, সে এবার জোবেদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, একজেরা নতুন কানি কখনও দিতে লারলাম। পুরনো তেনা প'রেই তোর দিন গেল।

থাক ওসব কথা। পরদিন অতি প্রত্যূষে খোঁড়া ইটের পাঁজটার কাছে আসিয়া হাজির হইল। হাতে ছোট একটা লাঠি। বগলে ঝাঁপি। সম্মুখে পূর্ব-দিক্‌চক্রবালে সবে রক্তাভা দেখা দিতে শুরু করিয়াছে। গাছের বুকের মধ্যে বসিয়া পাখিরা মুহুর্মুহু কলরব করিতেছিল। গ্রামের মধ্যে কোন হিন্দুদের মন্দিরে মঙ্গলারতির শঙ্খঘণ্টা বাজিতেছে। একটা উঁচু ঢিপির উপর বসিয়া খোঁড়া চারি দিকে সতর্ক তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল।

পূর্বাচলের রাঙা রঙ ক্রমশ গাঢ় হইয়া পরিধিতে বিস্তৃতিলাভ করিতেছিল। সে রঙের আভায় পাঁজার পোড়া ইটগুলো আরও রাঙা হইয়া উঠিল। খোঁড়ার ময়লা কাপড়খানায় পর্যন্ত লালরঙের ছোপ ধরিয়া গিয়েছে। খোঁড়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওই—ওই না?

ঈষৎ দূরে প্রান্তরের বুকে বোধ হয় সেই কিশোর সাপটিই পূর্বো-কোণের দিকে মুখ তুলিয়া ফণা নাচাইয়া খেলা করিতেছিল। প্রাতঃ-সূর্যের রক্তাভায় তাহার রঙ দেখাইতেছিল যেন গাঢ় লাল। সেই লাল রঙের মধ্যে ফণার ঘন কালো চক্রচিহ্ন অপূর্ব শোভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রজাপতির রঙ পাখার মধ্যে কালো বর্ণলেখার মতই সে মনোরম। খোঁড়া মুগ্ধ হইয়া গেল। আপনার মনেই মৃদুস্বরে সে বলিয়া উঠিল, বাঃ!

তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। সর্পশিশু উদীয়মান সূর্যের অভিনন্দনে এত মাতিয়া উঠিয়াছিল যে খোঁড়ার পদশব্দেও তাহার লেখা ভাঙিল না। অতি সন্নিকটে আসিতেই সে সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। পর মুহূর্তেই সে গর্জন করিয়া ছোবল মারিল। কিন্তু ফণা আর সে তুলিতে পারিল না। খোঁড়া খিপ্রহস্তে বাঁ হাতের লাঠিখানি দিয়া তখন তাহার মাথা চাপিয়া ধরিয়াছে। ডান হাতে সাপের লেজ ধরিয়া গোটা-তুই ঝাঁকি দিয়া খোঁড়া বেশ করিয়া সাপটিকে দেখিয়া বলিল, সাপিনী।

মাস ছয়েক পর। গাঁজার দোকান হইতে ফিরিয়া খোঁড়া জোবেদাকে বলিল, কি এনেছি দেখ।

উঠানে ঝাঁটা বুলাইতে বুলাইতে জোবেদা বলিল, কি?

কাপড়ের খুঁট খুলিয়া খোঁড়া ছোট চিকচিকে একটি বস্তু বাহির করিয়া হাতের তালুর উপর রাখিয়া জোবেদার সম্মুখে ধরিল। বস্তুটি ছোট একটি মিনি—নাকে পরিবার অলঙ্কার।

জোবেদা প্রশ্ন করিল, এত ছোট মিনি কি হবে?

হাসিয়া খোঁড়া বলিল, বিবিকে পরিয়ে দেব।

জোবেদা অবাক হইয়া গেল। হাসিতে হাসিতে খোঁড়া ঘরে প্রবেশ করিল। তারপর গলায় একটি সাপ জড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। সেই সাপটি। এতদিনে আরও একটু বড় হইয়াছে। কিন্তু সে তেজ নাই। শান্ত আক্রোশহীন ভাবে ধীরে ধীরে মুখটি

ঈষৎ তুলিয়া খোঁড়ার গলায় কাঁধে ফিরিতেছিল। জোবেদা বলিল, দেখ্. ও করিসনা। যতই তেজ না থাক, ও-জাতকে বিশ্বাস নাই।

হাসিয়া খোঁড়া বলিল, বিশ্বাস নাই ওদের বিষ-দাঁতকে। নইলে ওরাও তো ভালবাসে জোবেদা। বিষ-দাঁতই নাই, কিন্তু আর দাঁত তো রয়েছে, কই, আমাকে তো কামড়ায় না। কেমন ভাল মেয়ের মত বিবি আমার ফিরছে বল্ দেখি। বলিয়া সে সাপটির ঠোঁট দুইটি চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে একটা চুমা খাইয়া বসিল।

জোবেদা বিস্মিত হইল না, কারণ এ দৃশ্য তাহার নিকট নূতন নয়। কিন্তু বিরক্তি ভরে বলিল, ছি ছি ছিঃ! তোর কি ঘেন্না পিত্তিও নাই? কতবার তোকে বারণ করেছি, বল্ তো?

সে কথায় খোঁড়া কানই দিল না। সে বলিল দেখ্ দেখ্, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে, দেখ্ দেখ! জানিস, সাপিনী আর সাপে যখন খেলা করে, তখন ঠিক এমনই ক'রে জড়াজড়ি করে ওরা। দেখেছিস কখনও? আঃ, সে যে কি বাহারের খেলা, মাইরি!

জোবেদা বলিল. দেখে আমার কাজ নাই, তুই দেখেছিস সেই ভাল। কিন্তু তোর খেলাও ওই শেষ করবে, তা বুঝিস!

খোঁড়া তখন একটা সূচ লইয়া বিবির নাক খুঁড়িতে বসিয়াছে। পায়ের আঙুল দিয়া সাপটার লেজ চাপিয়া ধরিয়াছে, আর বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়াছে মুখটা। ডান হাতে সূচ ধরিয়া নাক ফুঁড়িয়া মিনি পরাইয়া দিয়া সাপটাকে ছাড়িয়া দিল। যন্ত্রণায় ক্রোধে গর্জন করিয়া বিবি বারংবার খোঁড়াকে ছোবল মারিতে আরম্ভ করিল। ঝাঁপির ডালাটা ঢালের মত সম্মুখে ধরিয়া বিবির আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে করিতে সে বলিল, রাগ করিস না বিবি, রাগ করিস না। দেখ্ তো কেমন খুবসুরৎ লাগছে তোকে! দে তো জোবেদা, আয়নাটা দে তো। দেখুক একবার নিজের চেহারাখানা।

জোবেদা বলিল, লারব আমি।

দে দে, তোর পায়ে পড়ি, একবার দে। দেখি না, নিজের চেহারা দেখে ও কি করে।

জোবেদা স্বামীর এ অনুনয় উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে আয়না আনিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল।

খোঁড়া বলিল, একজেরা সিঁদুরও আনিস তো মেহেরবানি করে।

জোবেদা ঘর হইতেই প্রশ্ন করিল, কি, হবে কি?

পরম কৌতুকে হাস্য করিয়া খোঁড়া বলিল, দেখবি কি হবে। আগে হতে বলছি না।

জোবেদা আয়না সিঁদুর লইয়া আসিয়া ঈষৎ দূরে নামাইয়া দিল। খোঁড়া সুকোমলে বিবিকে ধরিয়া একটি কাঠির ডগায় সিঁদুর লইয়া সাপটির মাথায় একটি লাল রেখা আঁকিয়া দিল তারপর হা—হা করিয়া হাসিয়া বলিল, ওয়াকে আমি নিকা করলাম জোবেদা, ও তোর সতীন হল।

পরে বিবিকে বলিল, দেখ্ দেখ্ বিবি, কি বাহার তোর খুলেছে দেখ্ দেখি! সাপটাকে ছাড়িয়া দিয়া সে আয়নাটা বিবির সম্মুখে ধরিল। তারপর বিষম-ঢাকিটা বাজাইয়া কর্কশ অনুনাসিক স্বরে গান ধরিল—

জানি না গো এমন যে হবে
গোকুল ছাড়িয়া কেষ্ট মথুরাতে যাবে
ও জানি; না গো—

আরও মাস কয়েক পর।

বর্ষার মাঝামাঝি একটা দুরন্ত বাদলা করিয়াছে। খোঁড়া কোথায় গিয়াছে, বাদলে দুর্যোগে ফিরিতে পারে নাই। জোবেদা অনুভব করিল, ঘরের মধ্যে কেমন একটা গন্ধ উঠিতেছে—

গন্ধটা ক্ষীণ 'কিন্তু মিষ্টি এবং কেমন নতুন রকমের।' এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়াও সে বুঝতে পারিল না।

দিন দুই পরে খোঁড়া ফিরিল, জলের দেবতাকে একটা অশ্লীল গালি দিয়া বলিল কিছু খেতে দে দেখি জোবেদা, বড় ভুখ লেগেছে।

জোবেদা ঘরের মধ্যেই একটা থালায় পান্তাভাত বাড়িয়া দিল।

পায়ের কাদা ধুইয়া ফেলিয়া খোঁড়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, গন্ধ কিসের বল দেখি জোবেদা ?

জোবেদা বলিল, কে জানে বাপু, আজ কদিন থেকেই ঘরে এমন একটা গন্ধ উঠেছে।

খোঁড়া কথা কহিল না, সে শুধু ঘন ঘন শ্বাস টানিয়া গন্ধটার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিল। এদিক ওদিন ঘুরিয়া সে বিবির ঝাঁপির কাছে দাঁড়াইল। মানুষের পদশব্দে ঝাঁপির ভিতর নাগিনীটা গর্জন করিয়া উঠিল।

খোঁড়া বলিল, হু।

জোবেদা উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, কি বল্ দেখি ?

খোঁড়া বলিল, বিবির গায়ের গন্ধ। সাপিনী তো, সাপের সঙ্গে দেখা হবার সময় হয়েছে, তাই। ওই গন্ধেই সাপ চলে আসে।

জোবেদা অবাক হইয়া গেল। বলিল, কে জানে বাপু, তোদের কথা তোদেরই ভাল। নে, এখন পান্তিকটা খেয়ে ফেল্।

ভাত খাইতে খাইতে খোঁড়া বলিল, ওটাকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে মাঠে। এ সময় ধরে রাখতে নাই।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে কথাটা শেষ করিল।

জোবেদা পরম আশ্বাসের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল. সেই ভাল বাপু, ওঠাকে আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না। এত সাপ মরে, ওঠা মরেও না তো !

ভাত খাইয়া খোঁড়া ঝাঁপি হইতে বিবিকে বাহির করিল। মুখটি চাপিয়া ধরিয়া সে কত আদরের কথা কহিল।

জোবেদা বলিল, এই দেখ, কদিন ওকে কামানো হয় নাই, ওর দাঁত গজিয়েছে, আর মায়াই বা কেন বাপু ? যা না, ওকে ছেড়ে দিয়ে আয়।

খোঁড়া বলিল, দেখ্ দেখ্, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে, দেখ্।

অপরাহ্ণে খোঁড়া বিমর্ষ হইয়া বসিয়াছিল। বিবিকে পার্শ্বের জঙ্গলটায় সে ছাড়িয়া দিয়াছে।

জোবেদা বলিল, এমন করে বসে কেনে বল্ তো? গাঁজা-টাজা খা কেনে।

খোঁড়া কহিল, বিবির লেগে মন কি করছে রে।

জোবেদা হাসিয়া বলিল, মর্‌মর্। তোর কথা শুনে কি হয় আমার!

নারে জোবেদা, মনটা ভারি খারাপ করছে।

জোবেদা এবার স্বামীর পায়ে বসিয়া আদর করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কেনে রে, আমাকে তোর ভাল লাগে না?

সাদরে তাহাকে চুম্বন করিয়া খোঁড়া বলিল, তোর জোরেই তো বেঁচে রইছি জোবেদা।

তু আমার জানের চেয়ে বেশী।

জোবেদা বলিয়া উঠিল দেখ্ দেখ্, বিবি ফিরে এসেছে। ওই দেখ — নালার মধ্যে।

জলনিকারী নালার মধ্যে সত্যই বিবি ফণা তুলিয়া বেড়াইতেছিল।

খোঁড়া উঠিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, ধরে আনি, দাঁড়া।

জোবেদা স্বামীকে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না তারপর কর্কশ কণ্ঠে বলিল, বেরো, বেরো, হেট্, হেট্।

বাঁ হাতে করিয়া একখানা ঘুঁটে ছুঁড়িয়া সে বিবিকে মারিল। সাপটা সক্রোধে মাটির উপর কয়েকটা ছোবল মারিয়া ধীরে ধীরে নালা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর বোধ হয়, জোবেদা চিৎকার করিয়া ওঠ্ ওঠ্, কিসে আমায় কাটলে!

খোঁড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলো জ্বালাইয়া দেখিল, সত্যই জোবেদার বাঁ পায়ের আঙুলে এক ফোঁটা রক্ত জলবিন্দুর মত টলটল করিতেছে।

জোবেদা আবার চিৎকার করিয়া উঠিল, বিবি—তোর বিবি আমাকে কেটেছে, ওই দেখ।

একটা হাঁড়িতে বেড় দিয়ে নাগিনী ধীরে ধীরে চলিয়াছিল। খোঁড়া

তাড়াতাড়ি উঠিয়া সাপটাকে ঝাঁপিতে বন্দী করিয়া বলিল, জোবেদা যদি না বাঁচে, তবে তোকেও শেষ করব আমি।

জোবেদা কিন্তু বাঁচিল না। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাইল। মাথার চুল টানিতেই খসখস করিয়া উঠিয়া আসিল। ওঝারা চলিয়া গেল। বীভৎস মুখ সকরুণ করিয়া শিয়রে খোঁড়া বসিয়া রহিল।

একজন ওস্তাদ বলিল, তুইও যেতিস খোঁড়া, খুব বেঁচে গিয়েছিস। ভারি আক্রোশ ওদের, হয়তো তোকে কামড়াইতে এসেছিল।

সাশ্রুনেত্রে খোঁড়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

খোঁড়া ফকিরি লইয়াছে। তাহার ভিটাটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। খোঁড়ার বাড়ির পাশ দিয়াই একটা পায়ে চলার পথ ছিল, সে পথটা এখন বন্ধ, সেদিক দিয়া এখন কেহ হাঁটে না। বলে সাপের বড় ভয়। সাপগুলো বড় খারাপ সাপ—উদয়নাগ। প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের সময় দেখা যায় রাঙা রঙের সাপ ফণা দুলাইয়া খেলা করিতেছে।

বিবিকে খোঁড়া বধ করিতে পারে নাই। তাহাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, শুধু তোর দোষ কি, মেয়েজাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।

বিমল মিত্র

ঘরন্তী

এ গল্পটা হয়তো না লিখতে হলেই আমি খুশী হতাম। কিন্তু লেখক জীবনের শুরু থেকেই ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধে নিয়ে ভাবা ছেড়ে দিয়েছি। তাছাড়া নিজের সুখ-অসুখের প্রশ্ন তো এখানে ওঠেই না, কারণ মিসেস্ চৌধুরীর বিশেষ অনুরোধেই এটা লেখা। তবু তিনি গল্পটা আমাকে যেভাবে শেষ করতে বলেছিলেন সেভাবে শেষ আমি



করতে পারবো না বলে দুঃখিত। তিনি যেখানেই থাকুন, এ গল্প যদি পড়েন, যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

সত্যি, সেদিনের সেই ঘটনার পর মিসেস্ চৌধুরী যে কোথায় চলে গেলেন, কেউ জানে না। জানি না এই বই তাঁর হাতে পড়বে কিনা। তবু যদি তাঁর নজরে পড়ে, তাঁর অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি—লাবণ্য ভাল আছে, লাবণ্যের একটি ছেলে হয়েছে, লাবণ্য ছেলের নাম রেখেছে···

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

মিসেস্ চৌধুরীর হয়তো মনে নেই সে-সব কথা কিন্তু আমার আছে

রাত তখন প্রায় বারোটা। লাবণ্যের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে শেষে আমার বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলেন। বৃদ্ধা না হোন, মিসেস্ চৌধুরীকে যুবতী বলা চলে না। তবু ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে উগ্র সেন্টের গন্ধে ঘর ভরে গিয়েছিল। রুজ-মাখা গাল আর লিপিষ্টিক মাখা ঠোঁটের ওপর যেন কে হঠাৎ কালি লেপে দিয়েছে।

বললেন—একটা ভীষণ বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি। তোমাকে একটা গল্প লিখতে হবে বিমল—

বললাম—ব্যাপার কী? কী হলো?

—তুমি কথা দাও লিখবে? তুমি অনেককে নিয়ে লিখেছ, এ-ও তোমারই সাবজেক্ট।

—খুলে বলুন, কী ব্যাপার?

মিসেস্ চৌধুরী বললেন—লাবণ্যকে নিয়ে তোমার একটা গল্প লিখতেই হবে।

—লাবণ্য কে?

—বলবো তোমাকে সব, কিন্তু আগে কথা দাও—লিখবে?

অগত্যা কথা দিতেই হলো।

মিসেস্ চৌধুরী বললেন—যত বদনাম শুধু আমাদেরই বেলায়, কিন্তু তবু তোমাকে বলি, আমাদের আর যা-ই দোষ থাক, আমরা চরিত্রহীনা নই। আমার বাড়িতে যারা আসে, আমি যাদের কাছে যাই—তারা কেউ আমাকে সতী-সাবিত্রী বলে না জানুক, আমাকে শ্রদ্ধা করে সবাই। অন্ততঃ সমাজকে আমি ঠকিয়েছি এ-কথা কেউ বলবে না। আমার কাছে সরল সোজা কথা। ফেলো কড়ি মাখো তেল। কেউ বলতে পারবে না আমার ঘরে এসে কাউকে পুলিসের হেফাজতে পড়তে হয়েছে। কিন্তু পুলিস কি কিছু জানে না? জানে বৈকি। সব জানে। আমার কিসের কারবার, আমার পেট চলে

কিসে ? সবই জানে। কিন্তু তবু বলে না কেন ? তুমি তো দেখেছ আমার বাড়ির পাশেই পুলিসের থানা। তাদের নাকের ওপরই তো আমার কারবার চলছে, তবু কিছু বলে না কেন ?

এ-প্রশ্নের উত্তর মিসেস্ চৌধুরীর অবশ্য আশা করেন না। তাই, আমিও চুপ করে রইলাম।

কথা বলতে বলতে মিসেস্ চৌধুরীর আধাপাকা চুলের খোঁপা খুলে পড়লো। ছু'হাতে সেটাকে সামলে নিয়ে আবার বললেন—এই রাত্তিই বেলা তোমার ঘরে বসেই বলছি, আমায় কেউ কুলত্যাগিনী বলে জানে, কেউ বা বলে আমার স্বামী আমায় ত্যাগ করেছে। আমি সব জানি সব স্বীকার করি, তোমাদের কাছেও আমি নিজেকে সতী-সাবিত্রী বলে বড়াই করি না, আমি যা আমি তা-ই। আমার স্যুটকেস-এর মধ্যে যেদিন মিষ্টার চৌধুরী এক প্রেমপত্র আবিষ্কার করলেন, সেদিনও আমি মিথ্যে কথা বলে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করি নি। তা ছাড়া তোমরা তো জানো, এক গ্লাস বিয়ার খেলে কী-রকম ভুল বকতে শুরু করি।

কথা বলতে বলতে যেন হাঁপাতে লাগলেন।

বললেন—তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, বরাবর জানো নিশ্চয়ই সন্ধ্যে বেলা তিন কাপ চা খেয়ে তবে আমার নেশা কাটে, আজ সত্যি বলছি তোমায় এক কাপ চাও জোটে নি কপালে।

তারপর লজ্জা ত্যাগ করে বললেন—তোমার চাকরকে একবার জাগাও, চা করুক।

সত্যি মনে হলো মিসেস্ চৌধুরী এক নিদারুণ আঘাত পেয়েছেন যেন। সে-আঘাতে নেশার খোরাক খেতেও ভুলে গেছেন তিনি—এমনি কঠোর তার যন্ত্রণা। নইলে মিসেস্ চৌধুরীর মত মেয়ে মানুষ এই রাত্রে নিজের ব্যবসা ছেড়ে আমার বাড়িতেই বা আসবেন কেন ! অথচ সে-আঘাত প্রতিরোধ করবার ক্ষমতাও যেন তাঁর নেই। দুর্বল অক্ষম আক্রোশে তিনি যেন ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে আমার কাছে এসে হাজির হয়েছেন। আমিই

বুঝি এখন তাঁর একমাত্র অস্ত্র। গল্প লিখে আমিই একমাত্র তাঁর প্রতিকার করতে পারি যেন।

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু লাবণ্য কে আপনার ?

চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেলেন মিসেস্ চৌধুরী। বললেন—আমার কেউ না। আসলে আমার নিজের বলতে কে আর আছে বলো! আরো যেমন দশজন ছেলেমেয়ে আসে আমার বাড়িতে—লাবণ্যও তেমনি। এদের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক! কত মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, গুজরাটি, বাঙালী আসে—মেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসে, কেউ এক ঘণ্টা, কেউ বা দু ঘণ্টা, কেউ তিন ঘণ্টা, কেউ বা সারারাত ঘর ভাড়া করে। তিনখানা ফারনিশ্‌ড ঘর আমার, ভাড়া নেয়—আবার কাজ ফুরোলো চলে যায়। লাবণ্যও ওদের মত একজন, আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কিসের ?

লাবণ্যের সঙ্গে যদি কোনও সম্পর্ক নেই, তবে তাকে নিয়ে এত মাথাব্যথা, তাকে নিয়ে এই গল্প লেখানোর প্রচেষ্টা কেন, বোঝা গেল না।

মিসেস্ চৌধুরী বললেন—কিন্তু তা বলে কি তোমরা আমায় অর্থ-পিশাচ বলবে ? এই যে তোমরা আমার ঘরে যাও, নিজের পয়সা খরচ করে খাও-দাও ফুর্তি করো, কখনও ঘর-ভাড়া চেয়েছি ? ছোট-বেলায় এককালে কবিতা লিখেছি, তাই তোমাদের সঙ্গে মিশি, কিন্তু এ-লাইনে এসে আর ওসব হলো না। না হোক, সকলের সব জিনিস হয় না, ওই বাড়ি-ভাড়া থেকে যে ক'টা টাকা আসে, তাইতেই আমার শেষ জীবনটা একরকম করে কাটিয়ে দেব—

মিসেস্ চৌধুরীকে যারা জানে তারা বুঝতে পারবে এ তাঁর বিনয়ের কথা। যেমন-তেমন করে কাটিয়ে দেবার মত জীবন তাঁর নয়। এ ক'বছরে অনেক টাকা তিনি কামিয়েছেন।

একটু থেমে বললেন—ফুলচাঁদকে তুমি দেখেছ ?

বললাম—দেখেছি।

—তার মতন অত বড়লোক, যে এক কথায় দশ হাজার টাকা বার করে দিতে পারে, সে-ও যখন প্রথমে ওই লাবণ্যের জন্য আটশো টাকা

খরচ করবে বলেছিল, আমি রাজী হইনি। আমি যত বড় ব্যবসাদার মেয়েমানুষই হইনা কেন, এককালে তো আমিও ঘরের বউ ছিলাম। রোজ সকালে স্নান করে তুলসীতলায় জল দিয়ে আমি, তো প্রণাম করেছি—আমিও তো ছেলে-মেয়ের মা ছিলাম। আজ না-হয় তোমরা আমায় দেখছ অন্যরকম, এখন পাকা চুলে কলপ মাখি, তোবড়ানো গালে রুজ মাখি—

হঠাৎ মিসেস্ চৌধুরীর মুখে এ কথা শুনে কেমন যেন অবাক লাগলো।

বললেন—যাক গে, এ-সব কথা। আমার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, তুমি আমার ওখানে চলো—সব গল্পটা তোমায় বলবো।

—এখন ? এত রাত্রে ?

—তাতে কী হয়েছে ?

শেষ পর্যন্ত সে-রাত্রে আমি অবশ্য মিসেস্ চৌধুরীর বাড়ি যাইনি। অনেক রাত পর্যন্ত মিসেস্ চৌধুরীই সমস্ত গল্প আমায় বলেছিলেন। গল্প যখন শেষ হলো তখন রাত প্রায় তিনটে।

চলে যাবার সময় আমার হাত দুটো ধরে বলেছিলেন—লক্ষ্মীটি, এটা তোমায় লিখতেই হবে। তবে, ওই শেষকালটা শুধু বদলে নিও। যেমনভাবে বললাম ওইভাবে শেষ করো—কেমন ?

তারপর ট্যাক্সিতে ওঠবার আগে বলেছিলেন—তাহলে কাল বিকেলবেলা আমার ওখানে যাচ্ছো তো ?

পরের দিন ঠিক সময়ে গিয়েছিলাম মিসেস্ চৌধুরীর বাড়ি। কিন্তু দেখা তাঁর পাইনি। দরজায় তালা দেওয়া। শুনেছিলাম, মিসেস্ চৌধুরী বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন কোথায়, কেউ জানে না।

তাঁর সঙ্গে সে-ই আমার শেষ দেখা।

শেষ দেখা বটে, কিন্তু সম্পর্ক সেইখানেই শেষ হয়নি। অনেক গল্পের সূচনায় যখন কী নিয়ে লিখবো ভেবেছি, তখন মিসেস্ চৌধুরীর গল্পটার কথাও মনে হয়েছে বার বার। মনে হয়েছে—নিরঞ্জন আর লাবণ্যের গল্পটা লিখেই ফেলি। যেমনভাবে শেষ করতে বলেছিলেন

তেমনি করে না হয় শেষ করি। মিসেস্ চৌধুরী যেখানে থাকুন, এ-গল্প তাঁর হাতে পড়তেও পারে। একদিন আমাকে স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন—সে-স্নেহ সে-ভালবাসার কিছুটা অন্ততঃ তা হলে পরিশোধ হয়। কিন্তু মন সায় দেয় নি।

ট্রামে বাসে সিনেমায় সংসারে সর্বত্র লাবণ্যকে খুঁজে ফিরেছে আমার মন। সন্ধ্যেবেলা চৌরঙ্গীর ধারে গালে পাউডার আর আলতা মাখা ঠোঁট দেখে অনেকবার চমকে উঠেছি। ভেবেছি—এই-ই বোধ হয় মিসেস্ চৌধুরীর লাবণ্য! লাবণ্যর জীবন হয়তো এইখানে এসেই থেমেছে। আবার কখনও কোনও নতুন পরিচিত পরিবারের শান্ত সান্ধ্য পরিবেষ্টনীতে—পুত্র-কন্যার আনন্দ পরিবেশে—গৃহিণীর দিকে চেয়ে চোখ আমার অপলক হয়ে গেছে। এই-ই কি লাবণ্য? হয়তো নিরঞ্জনের উদার প্রেমের প্রাচুর্যে সে-লাবণ্য এখন মহীয়সী হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু আমার অনুসন্ধিৎসু মনের ক্ষুধা মেটেনি কোথাও। মিসেস্ চৌধুরীর কল্পিত পরিণতির সঙ্গে, লাবণ্যের বাস্তব জীবনের পরিণতির যেন কোথাও অসঙ্গতি ছিল। আমার উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে কোনদিন তার কোনও সমাধান খুঁজে পাইনি।

তা নিরঞ্জনের মত পুরুষকে তো আজো দেখি সকালবেলা বাসে চড়ে অফিসে যেতে। টেনেটুনে একশো টাকাই না হয় মাইনে পাক। টুইলের শার্ট আর মিলের কাপড়। এক কথায় মোটা ভাত আর মোটা কাপড়। একটা পেট একশো টাকায় একরকম চলে যায় বৈকি! আর লাবণ্য!

মিসেস্ চৌধুরী বলেছিলেন—লাবণ্যও ছিল ওই নিরঞ্জনের মত সাদাসিধা—পঞ্চান্ন টাকা মাইনে আর পঞ্চাশ টাকা ডিয়ারনেস্—

তা সত্যি। আমিও ভাবি, ও-মাইনেতে ওর চেয়ে বিলাসিতা কী করে করা যায়। বিশেষ করে মেসের খরচ, বাসভাড়া, টিফিন। তারপর হ্ একদিন কি সিনেমাতেও যেত না?

কেমন করে ওদের আলাপ হলো কে জানে। গ্রহচক্রের কোন ষড়যন্ত্রের ফলে কক্ষভ্রষ্ট হয়ে তুজন তুজনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিলো একদিন। তারপর ওদের আর ছাড়াছাড়ি হলো না কেন, তাই বা কে

জানে ! ওদের নিয়ে একদিন গল্প লেখাতে হবে এ-ধারণা থাকলে মিসেস্ চৌধুরী সেকথা নিশ্চয়ই জেনে রাখতেন। কিন্তু আর যা-ই হোক পছন্দের বাহবা দিতে হবে বটে নিরঞ্জনের।

মিসেস্ চৌধুরী বলেন—লাবণ্য রোগা হলে কী হবে, ওর গালের তিলটার জন্যে সকলেরই ওকে খুব পছন্দ হতো।

তা লাবণ্যকে আমিও কল্পনা করে নিতে পারি বৈকি ! মিসেস্ চৌধুরীর বর্ণনার সঙ্গে অনেক সময় বাসের ট্রামের মেয়েদের মিলিয়েও নিই। যেন মনে হয়—এক লাবণ্য আজ একশো লাবণ্য হয়ে সারা কলকাতায় ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। আর লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ের ওপর একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে একসঙ্গে যেতে দেখলে কেমন যেন মনে হয় ওরা সেই নিরঞ্জন আর লাবণ্য। অফিসের ছুটির পর ওরা আজ চলেছে মিসেস্ চৌধুরর ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের বাড়িটার দিকে ! মাসের প্রথম দিক। পাঁচ টাকা দিয়ে এক ঘণ্টার জন্য একটা ঘর ভাড়া করে ওরা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বসে ঘনিষ্ঠ হবে—একান্ত হবে—।

এক একদিন পেছন পেছন অনুসরণও করেছি ওদের। তবে কি মিসেস্ চৌধুরী আবার ব্যবসা শুরু করেছেন ! সেই আগেকার মতন ! সাহেব, মেম মোটর দোকান-পত্তর পেরিয়ে সামনের নিরঞ্জন আর লাবণ্য পাশাপাশি চলেছে। গায়ে টুইলের সার্ট ! পায়ে মোটা কাবুলি জুতো। পাশে গিয়ে দেখা যায়—নিখুঁত করে দাড়ি কামিয়েছে আজ। আর তারই পাশে লাবণ্য। নতুন কেনা স্কার্ট শাড়িটা পড়েছে আজ। কানের একটা দুল কেনবার পয়সাও নেই ওর। গলায় পরেছে ঝুটো মুক্তোর নেকলেস। একটু তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে পাশ থেকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। রাস্তায় জনস্রোতের মধ্যে আমাকে দেখতে পাবে না ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। ওদের নিয়ে গল্প লিখতে হবে, ভাল করে দেখা চাই ! মিসেস্ চৌধুরীর বর্ণনার সঙ্গে আজো এদের কোনও অমিল নেই যেন। লাবণ্যের পায়ের চটিটার পর্যন্ত যেন কোনও পরিবর্তন হয়নি। এত বছর পরেও কি সেই চটিটাই

পরছে ! নিরঞ্জনও কি সেই দশ বছরের টুইলের শার্টটাও বদলায়নি আজ পর্যন্ত !

সেই বিকেলের আলো-ছায়ার মধ্যে জনবহুল রাস্তার স্রোতে মিসেস্ চৌধুরীর কাছে শোনা নিরঞ্জন আর লাবণ্য যেন আবার রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে হাজির হলো আমার সামনে।

নিরঞ্জন বলছে—এ শাড়িটা পরে তোমায় খুব ভাল দেখাচ্ছে কিন্তু—

—কত দাম নিলে এর ?

আরো পাশে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে শুনতে লাগলাম ওদের কথা।

নিরঞ্জন বলছে—দাম এখনও দিই নি, চেনা-শুনা দোকান—মানে মাসে দু টাকা করে দিলেই চলবে।

লাবণ্য বললে—কিন্তু কেন কিনতে গেলে শাড়িটা, তোমার জুতোটা তো ছিঁড়ে গেছে, জুতো একজোড়া কিনলে হতো তোমার।

নিরঞ্জন বলে—আসছে মাসে চাকরিটা পাকা হলে কিনবো, তার আগে নয়।

লাবণ্য বলে—কিন্তু এখন থেকে কিছু টাকা তো জমানোও আমাদের দরকার। তা না হলে আর কতদিন মিসেস্ চৌধুরীর ঘর ভাড়া নিয়ে চলবে ; গতমাসে দুদিনের ভাড়া এখনও বাকি আছে যে !

নিরঞ্জনের মুখটা দেখতে পাই এবার ভালো করে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের ভবিষ্যৎ-হীন দিন-যাপনের ক্লান্তির ফাঁকে ফাঁকে যেন কোথাও এক টুকরো আশা উঁকি মারে। লাবণ্য আর সে বাড়ি ভাড়া করবে একটা। একটা স্বাধীন দু' ঘরওয়ালা ফ্লাট। তিরিশ কিংবা চল্লিশ এমনকি পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত ভাড়া দেবে। তারপর যদি ভবিষ্যতে কোনও দিন সুদিন আসে, সেদিন···

নিরঞ্জন চলতে চলতে হঠাৎ বললে—একটা ভালো বাড়ির সন্ধান পেয়েছি, জানো ?

লাবণ্য চমকে ওঠে—ক ; টাকা ?

—ভাড়া বেশী নয়, পঞ্চাশ, কিন্তু—

—সেলামী চায় বুঝি ?

সেলামী ছাড়া বাড়ি পাওয়া কি সম্ভব নয়? চেষ্টা করলে কী না পাওয়া যায়! চেষ্টা কি আর নিরঞ্জন কম করছে? আজ দু বছর ধরে নিরঞ্জন চেষ্টা তো করেই চলেছে?

অনেক দিন থেকেই চেষ্টা চলেছে। একটা বাড়ী পেলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তা হলে এমন করে আর মিসেস্ চৌধুরীর ঘর ভাড়ার জন্য টাকা নষ্ট করতে হয় না। মাসে এখানে চার দিন এলেই তো চার-পাঁচ কুড়ি টাকা চলে গেল। এক-এক মাসে পাঁচ দিন ছ দিনও এসেছে। তবে মিসেস্ চৌধুরী লোক ভালো। ব্যবহার ভাল তাঁর। হাতে নগদ টাকা না থাকলে বাকিতেও চলে। তাছাড়া ক'ঘণ্টাই বা থাকে তারা। বাস-ট্রাম বন্ধ হবার আগেই বেরিয়ে আসতে হয়। তারপর আবার কতদিন পরে দেখা হবে। চলতে চলতে লাবণ্যের হাতটা ধরে নিরঞ্জন!

ওদের কথা শুনতে শুনতে আমিও যেন এগিয়ে চলি। হঠাৎ মানুষের ভিড় আর দোকান-পত্রের সার পেরিয়ে কখন নিরঞ্জন আর লাবণ্য কোথায় হারিয়ে যায়। একলা একলা মিসেস্ চৌধুরীর ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। হঠাৎ যেন স্বপ্নও ভেঙে যায়। সেই পরিচিত বাড়িটার সামনের ঘরে একদল সাহেব মেম সেজেগুজে বসে আছে, ভেতর থেকে পিয়ানোর শব্দ আসছে। মিসেস্ চৌধুরীর বাড়ির সেই নেপালী দরোয়ানটা আর সেলাম করলে না আগেকার মত।

মিসেস্ চৌধুরী বললেন—টালিগঞ্জ থেকে বাসন্তী আসতো, চেতলা থেকে আসতো কল্যাণী, বেহালা থেকে আসতো টগর। কিন্তু এক-একদিন এক-একজনের সঙ্গে—চৌরঙ্গীর রাস্তা থেকে যাকে পেত ধরে আনতো। কিন্তু লাবণ্য? বরাবর নিরঞ্জনকে দেখেছি সঙ্গে। নিরঞ্জনের যখন চাকরি ছিল না, ও-ই লাবণ্যই তিন মাস মেসের খরচ যুগিয়েছে ওর।

ঘর ভাড়া হয়তো শহরে আরো অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে এমন রুচি আর শালীনতা পাবে না। বাইরে থেকে বোঝবার

কিছু উপায় নেই। সামনে অর্কিড আর মর্ণিং গ্লোরি দিয়ে ঘেরা। পেছনের দরজা দিয়ে সোজা চলে যাও ভেতরে। কোণাকুণি তিনটে ঘর। পর্দা ঠেলে ঘরের ভেতর যেতে হবে। একটা ঘরে ইংলিশ খাট, একটা ড্রেসিং আয়না আর দুটো চেয়ার—আসবাব বলতে এই। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। ব্যবস্থা পুরাদস্তুর বিলিতি। এখানে টাকা খরচ করেও তো আরাম।

মনে আছে হঠাৎ মিসেস্ চৌধুরী তাস খেলতে খেলতে উঠে পড়লেন একদিন।

জর্জেটটা সামলে নিয়ে বললেন—দেখি, ওদিকে গোলমালটা কিসের —আমায় তাস দিও না ভাই।

বাইরে থেকে যেন খানিকটা বচসার শব্দ কানে এল।

তারপর প্রচণ্ড শব্দ করে ডেকে উঠলো মিসেস্ চৌধুরীর অ্যালসেসিয়ানটা।

খানিক পরে মিসেস্ চৌধুরী ঘরে ঢুকে পাখার রেগুলেটারটা বাড়িয়ে দিলেন।

বললাম—ব্যাপার কী ?

—আর বলো কেন, শেঠজী এসেছিল। ফুলচাঁদ শেঠ। মদে চুর একেবারে—একদিন বারণ করে দিয়েছি, তবু—

নির্বিকার ভাবে আবার তাস খেলতে লাগলেন—নো বিড্, থ্রি ডায়মণ্ডস্ —

সেদিন অনেক দিন পরে সেই ফুলচাঁদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল, লম্বা-চওড়া একটা গাড়ি হঠাৎ সামনে এসে ব্রেক কষে দাঁড়ালো। দেখি ফুলচাঁদ। কে বলবে চল্লিশ বছর বয়েস। নিজেই ড্রাইভ করছে।

মুখ বাড়িয়ে হেসে বললেন—কী খবর স্যার ?

আমিও আশা করছিলাম কিছু খবর পাবো। কিন্তু ফুলচাঁদই প্রশ্ন করলে—মিসেস্ চৌধুরীর খবর কিছু জানেন স্যার ?

ফুলচাঁদ শেঠের ভাবনা নেই। হয় এ-পাড়ায় নয় ও-পাড়ায়, যেখানে হোক আড্ডা ও খুঁজে নেবেই। মিসেস্ চৌধুরী না থাক,

মিসেস্ সরকার আছে। নার্সিং হোম আছে। কত কি আছে কলকাতা শহরে। ছোকরা বয়েস। দিন-দিন যেন বয়েস কমছে ফুলচাঁদের। তিনটে আসল আর ছুটো ভেজাল ভেজিটেবল ঘি-এর কারবার। গাড়িটা চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত সেদিকে চেয়ে রইলাম।

কিন্তু সেদিনই সত্যি সত্যি বসলাম কলমটা নিয়ে। এবার লিখতেই হবে। মিসেস্ চৌধুরী যেমনভাবে শেষ করতে বলেছিলেন সেইভাবেই শেষ করব না-হয়।

প্রথমেই লিখলাম—নিরঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে সাপ্লাই অফিসের একতলার সিঁড়ির সামনে। লাবণ্যের অফিসের ছুটি হয়ে গেছে। একে একে নামতে শুরু করেছে সবাই।

লাবণ্যও চমকে উঠেছে কম নয়। বললে—এ কি, তুমি?

নিরঞ্জন বললে—তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি।

—আজ তো কথা ছিল না তোমার আসবার।

—তা হোক, তবু এলাম, মিসেস্ চৌধুরীর বাড়ি যাবো, আজ বড় যেতে ইচ্ছে করছে—

—কিন্তু টাকা? টাকা এনেছো? আমার তো হাত খালি, শুধু বাস ভাড়াটা—

—সে এক-রকম বলেকয়ে ব্যবস্থা করা যাবে, আজ যেতেই হবে তোমায়—জানো লাবণ্য, আমার চাকরিটা চলে গেছে—

—সে কী?

মিসেস্ চৌধুরী শুনেছেন সে-সব কথা। তিনি জানতেন লাবণ্যের সে কৃচ্ছ্রসাধনের ইতিহাস। ধোপার বাড়ি কাপড় দেওয়া বন্ধ হোল লাবণ্যের সেইদিন থেকে। শুরু হলো সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে চড়া। টিফিন বন্ধ। এক-একদিন নিজের জলখাবারটা রুমালে করে বেঁধে নিয়ে ভাগ করে খেয়েছে মিসেস্ চৌধুরীর ঘরে দরজা বন্ধ করে। চুলে তেল পড়তে লাগলো একদিন অন্তর। স্নো ফুরিয়ে গেল, আর কেনা হল না।

মিসেস্ চৌধুরী বলেছিলেন ওদের জন্য দিলাম কন্‌সেশন করে। আমার ঘরের ভাড়ার রেট পাঁচ টাকা বরাবর—ওদের জন্য ঠিক হলো তিন টাকা। তাও সব সময় নগদ দিতে পারত না, বাকি পড়ত।

কিন্তু ওদিকে টালিগঞ্জে বাসন্তীর গায়ে তখন ঢাকাই শাড়ি উঠেছে। চেতলার কল্যাণী নতুন এক ছড়া হার গড়ালো। বেহালার টগরও ব্রোঞ্জের চুড়ি ভেঙে গিনি সোনার কঙ্কন গড়িয়েছে। বাজার গরম বেশ।

সে-বাজারে মিসেস্ চৌধুরীই বা ছাড়বেন কেন? ঘর ভাড়া পাঁচ টাকা থেকে বেড়ে দশ টাকা হলো। তাতেও খালি পড়ে থাকে না। খদ্দের এসে ফিরে যায় বাইরে থেকে। মিসেস্ চৌধুরীর টেলিফোন সারা দিন রাত এনগেজ থাকে।

মনে আছে একদিন খুব ভয় পেয়েছিলাম আমি।

দুপুরবেলা। খাওয়া-দাওয়া করে মিসেস্ চৌধুরীর সঙ্গে আড্ডা দেবার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে—নতুন বইটা ওঁকে এক কপি উপহার দেবো। তারপর ওঁরই বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ে শোনাবো জায়গায় জায়গায়। মিসেস্ চৌধুরী সাহিত্যিক না হোন সাহিত্য-রসিক। ওঁকে বই দিয়ে আমরা নিজেদের কৃতার্থ বোধ করতাম। কিন্তু দূর থেকে দেখি বাড়ির সামনে ভীষণ ভিড়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে গোল হয়ে ফুটপাতের ওপর লোক জমা হয়েছে। কয়েকটা পুলিশও সেখানে দাঁড়িয়ে। মনে হলো—নিশ্চয় কোথাও গোলমাল, কোনও কেলেঙ্কারি বেধেছে। এবার মিসেস্ চৌধুরীর আর নিস্তার নেই। আমাদের আড্ডা ভাঙলো বুঝি।

যাবো কি যাবো না ভাবছি! শেষকালে আমরাও কিন্তু জড়িয়ে পড়বো।

কথাটা ভাবতেই কেমন লজ্জা হলো। ছি-ছি। আমরা কি বিপদের দিকে ওঁকে এমনি করেই ফেলে পালাবো! সেইদিন সত্যি প্রথম উপলব্ধি হলো, মিসেস্ চৌধুরী কতখানি একলা। বুঝলাম পৃথিবীতে মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মাবার পর সারা জীবন একজন অভিভাবকের প্রয়োজন কেন এত অপরিহার্য।

মিসেস্ চৌধুরী আপনি যেখানেই থাকুন, আজ অকপটে স্বীকার করছি—সেদিন আপনার জন্য আমার মায়া হয়েছিল সত্যি।

থাক্ সে কথা। আপনার বাড়িতে গিয়েই আমি বলেছিলাম—আজ বড় ভয় পেয়েছিলাম।

আপনি তখন সালোয়ার পায়জামা পরে কোচে ঠেস দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেন?

কিছু উদ্বেগের লেশমাত্র ছায়াও আপনার মুখে ছিল না।

আমি বললাম বাড়ির সামনে ভিড় দেখে ভাবলাম বুঝি পুলিশের হাঙ্গামা, কিন্তু—

পুলিশের নাম শুনে আপনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার কোচে হেলান দিয়েছিলেন!

—কিন্তু কী?

—কিন্তু দেখলাম ফুটপাতের ওপর বাঁদর-নাচ হচ্ছে।

আপনি হেসে বলেছিলেন—না, সে সব ভয় নেই; পুলিশ আমার কিছু করবে না। তবে ভয় ফুলচাঁদকে নিয়ে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কেন, ফুলচাঁদ আপনার কী করতে পারে?

আপনি বলেছিলেন—না, আমার আর সে কী করবে? ফুলচাঁদ আমার চেয়ে বড়লোক হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তার টিকি বাঁধা। কিন্তু ভয় অন্য ব্যাপারে—

—অন্য কি ব্যাপার?

—ভয় লাবণ্যের জন্যে—বলে আপনি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন।

তখন আমি জিজ্ঞেস করিনি—কে লাবণ্য? কী তার পরিচয়!

আপনার হয়তো মনে নেই আপনি নিজের মনেই যেন বলেছিলেন—লাবণ্যকে ফুলচাঁদ বহুদিন থেকে চাইছে। দুশো পর্যন্ত খরচ করতে রাজী—আমিই রাজী হয়নি—শেষে কোন্ দিন না—

মনে আছে এবারে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—লাবণ্য কে?

আপনি সে প্রশ্নের জবাব দেননি। আপনি তেমনি কোচে হেলান

দিয়েই বলেছিলেন—ফুলচাঁদ যদি বাসনাকে চাইতো আপত্তি করতাম না, কল্যাণীকে চাইলেও চলতো, টগরের বেলাতেও কিছু বলবার ছিল না। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে টেলিফোনে আনিয়ে নিতাম। কিন্তু তা বলে লাবণ্য ? ছি-ছি—

লাবণ্যকে আপনি কেন অতখানি সম্মান করতেন তা সেদিন কিছুটা যেন বুঝেছিলাম, আর কিছুটা যেন বুঝতে চেষ্টাই করিনি। সেদিন মিসেস্ চৌধুরীই কি জানতেন তাঁর সেই লাবণ্যকে নিয়ে গল্প লেখানোর জন্য একদিন রাত বারোটার সময় আমার বাড়িতে আসতে হবে !

হয়তো মিসেস্ চৌধুরী নিজের জীবনে যা হারিয়েছিলেন, তা ফিরে পেয়েছিলেন লাবণ্যের মধ্যে। হয়তো সেই জন্যই ফুলচাঁদের হাতে লাবণ্যকে তুলে দিয়ে নিজেকেই অপমান করতে চান নি ! কে জানে !

তাই ফুলচাঁদের প্রস্তাবের উত্তরে মিসেস্ চৌধুরী বলেছিলেন—দুশো কেন, পাঁচশ টাকা দিলেও ল্যাবণ্যকে পাবে না। ওর দিকে তুমি নজর দিও না ফুলচাঁদ—

কিন্তু ফুলচাঁদকে আপনি চিনতে পারেন নি। ফুলচাঁদ শেঠ জাত ব্যবসাদার, সাতপুরুষের ব্যবসাদার। কখন কিনতে হবে, কখন বেচতে হবে, তা সে জানে। সেও তাই ধাপে ধাপে উঠেছে। পাঁচশোতে রাজী না হয় সাতশো। সাতশোতে রাজী না হয় আটশো —আটশোতে রাজী না হয়—

আজো যেন চেষ্টা করলে দেখতে পারি। দেখতে পারি, তেতলার থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছে নিরঞ্জন। পাশে লাবণ্য !

লাবণ্য যেন খুশীতে উচ্ছল। বললে—দেখেছ, একটু মাটি নেই কোথাও বাড়িটাতে !

নিরঞ্জন বুঝতে পারলো না। বললে—কেন, মাটি দিয়ে কী হবে ?

—একটা তুলসী গাছ পুঁততাম। হিন্দু গেরস্থের বাড়িতেই তুলসীর গাছ রাখতে হয় যে—

নিরঞ্জন বললে—তা সে একটা টবে পুঁতলেই চলবে—এই রান্না-ঘরের পাশে।

—কিন্তু শোবার-ঘর কোন্‌টা করবে?

—দক্ষিণের ঘরটাই তো ভালো সব চেয়ে, জানালা খুললে আকাশ দেখা যায়।

—একটা খাট কিনতে হবে আমাদের—

নিরঞ্জন হেসে উঠলো—সবুর করো, সবে তো চাকরি হলো, আস্তে আস্তে হবে সব—আগে বাড়িটাই হোক।

বাড়ির মালিক বললেন—আমার এক কথা—ভাড়া চল্লিশ টাকা, যা সবাই দিচ্ছে আপনারাও তাই দেবেন। কিন্তু—

—কিন্তু কী?

মালিক এবার আসল কথাটা পারলেন। বললেন ব্যবসায় আমার অনেক লোকসান গেছে ইদানিং, এখন ওই বাড়ি ভাড়াতেই সংসার চলছে এক রকম, তা সেলামী কিছু দিতে হবে আপনাদের।

নিরঞ্জন দমে গেল। লাবণ্যও ফিরে আসছিল। এমন ঘটনা প্রথম নয়। আগে জানতে পারলে—

তবু নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করল—কত?

যেন কম-সম হলে দিতে তৈরী সে।

মালিক বললেন—বেশী না, আর সব টেনেন্ট যা দিয়েছেন, তা-ই দেবেন—তার এক পয়সা বেশি নেব না। আমার কাছে সবাই সমান।

সাম্যবাদীর মতন পরম নিস্পৃহ ভঙ্গী করলেন তিনি।

—তবু কত?

—পুরোপুরি দেবেন, ভাঙা-ভাঙতি ভালোবাসি না আমি।

তবু তিনি দুর্বোধ্য হচ্ছেন দেখে দয়া করে খুলে বললেন—হাজারের কম আমি নিই নে।

ফুলচাঁদও সেদিন সেই কথাই বললে—আটশোতে রাজী না হয় হাজার—

সংখ্যাটা পুরোপুরি হলে যেন অন্যরকম শোনায়। কিন্তু নিজের

কানকে আপনি বোধ হয় বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন মিসেস্ চৌধুরী। তাই হয়তো দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করেন নি। তবু কিন্তু আপনাকে ব্যস্ত হতে দেখা গেল না। আপনি তেমনি নির্বিকার ভাবেই টফি চুষতে লাগলেন।

কিন্তু ঘটনাচক্রে ঠিক তখনিই কি লাবণ্য আর নিরঞ্জনকে সামনে দিয়ে যেতে হয়! রাত তখন সাড়ে ন'টা। চটি ফটাস্ ফটাস্ করতে করতে চলেছে লাবণ্য। সারাদিন অফিসের খাটুনির পর বাড়ি ফিরতে পারলে সে বাঁচে। আপনার মনে হলো—ও তো লাবণ্য নয়। আপনার ভাষাতেই বলি—আপনার মনে হলো—ও তো লাবণ্য নয়, ও যেন আপনার বিগত জীবন, আপনার পরিশুদ্ধ আত্মা আপনাকে ব্যঙ্গ করে আপনার দিকেই পেছন ফিরে চলে যাচ্ছে। আর ফিরে আসবে না কোনও দিন।

আপনি সেখানে বসেই নেপালী দারোয়ানকে ডাকলেন—জঙ্গী।

জঙ্গী তিন লাফে এসে য়্যাটেনশানের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে—স্যালিউট্ করার পর আপনি বললেন—লাবণ্যকে ডেকে দে তো।

লাবণ্য এল।

আপনি আপনার আত্মার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন।—এবং সেই বোধ হয় প্রথম আর শেষবার।

তারপর তাকে আড়ালে নিয়ে এসে ফুলচাঁদের প্রস্তাবটা জানালেন। আপনার মনে হলো, পৃথিবীর প্রচ্ছদপটে আজ পর্যন্ত যত মানুষের পদ-চ্ছায়া পড়েছে, সেই কোটি কোটি সংখ্যাহীন জনসমুদ্রের তরঙ্গ যদি আবার উদ্বেলিত হয় তো হোক। নক্ষত্র-নীল আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক আবার কক্ষচ্যুত কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যদি দিকভ্রান্ত হয় তো হোক। তবু আপনার আত্মা অচল অটল থাকবে। লাবণ্য কিন্তু সমস্ত শুনে মাথা নিচু করে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর যেন দাঁতে দাঁত চেপে বললে—ওকে একবার জিজ্ঞেস করে আসি মাসিমা।

মর্ণিং গ্লোরির আড়ালে অন্ধকারে একলা অপেক্ষা করছিল নিরঞ্জন।

লাবণ্য সেখানে গেল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে কী যেন পরামর্শ হলো দুজনে। দূর থেকে কিছু শোনা গেল না। তবু আভাসে বোঝা গেল—একজন বুঝি কেবল বোঝাতে চাইছে আর একজন যেন কিছুতেই বুঝতে চাইছে না।

এক সময়ে লাবণ্য এল। আপনার সামনে এসে মাথা নিচু করে বললে—আমি রাজী।

কথাটা বোধ হয় লাবণ্য একটু আস্তেই বলেছিল, কিন্তু আপনি দেখতে পেলেন—ঘরের ভেতর ফুলচাঁদ সে কথা শুনে নতুন ধরানো সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। আর, আপনি যে আপনি, আপনারও মনে হলো বারান্দায় চেনে-বাঁধা অ্যাল-সেসিয়ানটা যেন বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো।

বললাম—তারপর ?

মিসেস্ চৌধুরীর পাকা চুলের খোঁপাটা আবার খুলে গেল। এবার সেটাকে আর সামলাবার চেষ্টা করলেন না। বললেন—তারপর ? তারপর সেই প্রথম আর সেই শেষ। আর আসেনি তারা আমার বাড়িতে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের লোকেরা আর কোনও দিন সে রাস্তায় হাঁটতে দেখেনি নিরঞ্জন আর লাবণ্যকে।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—তবে কোথায় গেল তারা ?

মিসেস্ চৌধুরী বললেন—আমিও তাই ভাবতুম—কোথায় গেল তারা। মনে হতো—সেও বোধ হয় অন্য মেয়েদের পর্যায়ে নেমে এসেছে। টালিগঞ্জের বাসন্তীকে জিজ্ঞেস করেছি, চেতলার কল্যাণীকে জিজ্ঞেস করেছি, বেহালার টগরকে জিজ্ঞেস করেছি—তারা এখনও আসে কিন্তু বলতে পারে না কোথায় গেছে তারা—এমন কি ফুলচাঁদও না।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—তবে হয়তো ওই ঘটনার পর নিরঞ্জন ত্যাগ করেছে তাকে।

—তাও ভেবেছি অনেকবার। হয়তো অবিশ্বাসে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে নিরঞ্জন। আর ওদিকে আত্মধিক্কারে হয়তো আত্মহত্যা করেছে লাবণ্য।

নিজের আত্মাকে আমি নিজের হাতে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পেরেছি জেনে মনে মনে খুব খুশীই হয়েছিলাম—সত্যি বলছি—খুব খুশীই হয়েছিলাম। মিস্টার চৌধুরী যেদিন বিয়ের পর আমার স্যুটকেশের মধ্যে একটা প্রেমপত্র আবিষ্কার করে আমায় ত্যাগ করেছিলেন, তারপর জীবনে এই প্রথম এমন খুশী হতে পারা—সে যে কী আনন্দ! সে আনন্দে সেদিন বিকেলবেলা ঘুম থেকে উঠে তিন কাপের বদলে তিন্-ত্রিক্কে ন' কাপ চা-ই খেয়ে ফেললাম!

মিসেস্ চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি তিনি কথা বলছেন আর চোখ বেয়ে জল পড়ে তাঁর গালের রুজ ঠোঁটের লিপস্টিক চোখের সুর্মা সব ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থা তাঁর আগে কখনও দেখিনি। কী যে করবো বুঝতে পারলাম না।

তারপর মিসেস্ চৌধুরী হঠাৎ সপ্রতিভ হয়ে ব্যাগ খুলে একটা চিঠি বার করলেন।

আমার দিকে সেখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন—তারপর এতদিন পরে আজ সকালবেলা এই চিঠি, চিঠি পড়ে আমি তো অবাক!

দেখলাম নিরঞ্জন আর লাবণ্যর বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি। পনেরোর সি কালী সরকার রোড, তেরো নম্বর স্যুট। আজগের তারিখ।

আমি মিসেস্ চৌধুরীর দিকে নির্বাকদৃষ্টি দিয়ে চাইতেই তিনি বললেন—এখন সেখান থেকেই আসছি।

বললাম—কী দেখলেন?

দেখলাম বিয়েতে যেমন হয় তেমনিই, লাবণ্য সিঁথিতে সিঁদুর পরেছে, পরেছে চন্দনের ফোঁটা। নিরঞ্জনের গায়েও গরদের পাঞ্জাবী, মাথায় টোপর। হঠাৎ কোথা থেকে সব আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এসে পড়েছে, এতদিন কোথায় ছিল তারা সব কে জানে! আজ হঠাৎ ওদের শুভাকাঙ্ক্ষীর আর আশীর্বাদকের অভাব নেই। বাড়িটাও ভালো রান্না-ঘরের পাশে একটা টবে তুলসী গাছ প্রতিষ্ঠা করেছে, শোবার ঘরে একটা খাট, দক্ষিণ দিকের জানালা খুললে আকাশ দেখা যায়। আয়োজনও করেছে প্রচুর—কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম—

ফুলচাঁদের স্পর্শের কলঙ্ক কোথাও নেই এতটুকু—চন্দনের কৌটায় সব ঢেকে গেছে। কিন্তু আমার যেন কিছু ভালো লাগলো না। আমি জলস্পর্শ না করে সোজা চলে এলাম বাইরে, তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে সমস্ত কলকাতাটা টো টো করে ঘুরে এখন এই রাত বারোটার সময় তোমার এখানে।

গল্প বলতে বলতে মিসেস্ চৌধুরী যেন স্তিমিত হয়ে এলেন। মনে হলো, এখনি যেন তিনি নিভে যাবেন।

বললাম—তা হোক, তবু নিরঞ্জনের উদারতা আছে বলতে হবে।

মিসেস্ চৌধুরী দপ্ করে উঠলেন—তা থাকগে উদারতা, কিন্তু গল্পে তুমি ওদের বিয়ে দিতে পারবে না—শেষটুকু তোমার বদলাতেই হবে।

—কেন ?

মিসেস্ চৌধুরী দম নিয়ে বলতে লাগলেন—হ্যাঁ, আগাগোড়া সব ঠিক রেখে শেষকালটাতে বদলে দেবে। বিয়ে ওদের কিছুতেই দিতে পারবে না তোমার গল্পে—ওর আত্মার ঘুণ ধরেছে যে—আমি মিসেস্ চৌধুরী তার সাক্ষী।

বললাম—কিন্তু আত্মা তো মরে না।

—নিশ্চয় মরে, আলবৎ মরে. আমার আত্মা মরেছে—লাবণ্যর মরেছে, বাসন্তী, কল্যাণী, টগরের সকলের মরেছে। আর তা ছাড়া যদি বিয়ে দিতেই হয় তো দুদিন বাদেই ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিও। তারপর ধাপে ধাপে লারণ্যকে কল্যাণী, বাসন্তী আর টগরের পর্যায়ে নামিয়ে আনবে, আর তারপর একদিন জীবনের শেষ অঙ্কে দেখাবে লাবণ্য বাড়িভাড়া নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে আমার মতন··· পারবে না করতে ? লক্ষ্মীটি, শেষটুকু ট্রাজেডি করে দিও।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু কেন ?

—ধরে নাও আমার শখ, আর কিছু নয়। একদিন আমাকে যদি তুমি ভালোবেসে থাকো, আমিও যদি তোমার কোনদিন কোনও

উপকারে এসে থাকি তো আমার এ অনুরোধটা রেখো ভাই। আর তা ছাড়া 'অতি-ঘরন্তী না পায় ঘর'—এ কথাটা মানো তো ?

অতীতের সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে আর লাভ নেই আজ। তবু বলতে পারি, দশ বছর ধরে এ-গল্পটা লেখবার জন্যে আমার চেষ্টার আর অন্ত ছিল না। বন্ধু-বান্ধবের কাছে কতবার গল্প করেছি—কেউ বিশ্বাস করেছে, কেউ করেনি। কিন্তু মানুষের সংসারে চোখের সামনে জীবন সম্বন্ধে মূল্যবোধের এত পরিবর্তন দেখেছি—এতো অভাবনীয় বিস্ময়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এত সহজ স্বাভাবিকভাবে যে, তা বলা যায় না। তবু সাহিত্যের কারবারে এসে দেখেছি আজো জীবন সম্বন্ধে আমাদের যে-ধারণাই থাক, সাহিত্যে আমরা আজো তো ফরমুলা মেনেই চলি। তাই সধবা কিরণময়ীকে শেষ পর্যন্ত পাগল করতে হয়, বিধবা রমাকে কাশী পাঠাতে হয় আমাদের। তাই—বিশ্বাস করুন মিসেস্ চৌধুরী—তাই আপনার অনুরোধ মতই গল্পটা শেষ করবো ভেবেছিলাম। লাবণ্যকে অধঃপতনের শেষ ধাপে নামিয়ে দিতে পারলে আমিও আপনার মতই খুশী হতাম। তাতে গল্পটা 'অতি-ঘরন্তী না পায় ঘর' এই সাধারণ প্রবাদ-বাক্যটারও একটা উদাহরণস্থল হয়ে থাকতো। জীবনে না হোক, সাহিত্যে অন্তত তাই-ই ঘটে। সেই জন্যই তো বলছিলাম যে এ গল্পটা না লিখতে হলেই আমি খুশী হতাম।

কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস্ চৌধুরী, আমি আপনার সম্পূর্ণ অনুরোধটা রাখতে পারলাম না।

কেন পারলাম না, তারও একটা কারণ আছে বৈকি।

সেই কারণটা বলি। লজ্জায় ঘৃণায় ধিক্কারে আমার মাথা নিচু হয়ে এলেও আমাকে তা বলতেই হবে!

সেদিন কলকাতার বাইরে সি. পি.-র একটা কোলিয়ারী অঞ্চলে যেতে হয়েছিল আমাকে। একটা লাইব্রেরীর উদ্বোধন উপলক্ষে সভাপতি পদের ভার নিয়ে।

সভা হলো।

সভার শেষে ভিড় পাতলা হবার পর জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল ওয়েল ফেয়ার অফিসার মিষ্টার মজুমদারের বাড়ি।

স্বামী-স্ত্রী তুজনেই ভারি অতিথিপরায়ণ। ছোট্ট বাঙলো। চারিদিকে বাগান করেছেন। ঘরটাও বেশ সাজানো। বেশ বোঝা গেল—গৃহের সর্বত্র গৃহিণীর একটা সুনিপুণ কল্যাণ হস্তের স্পর্শ লেগে আছে। চা পরিবেশন করতে লাগলেন মিসেস্ মজুমদার।

মিষ্টার মজুমদার বললেন—মিসেস্ মজুমদার আপনার একজন ভক্ত, জানেন না বোধ হয়—ওই দেখুন আপনার সব ক'টা বই-ই কিনেছেন।

মিসেস্ মজুমদার, সলজ্জভাবে হাসতে লাগলেন। সত্যিই পাশের আলমারিতে অন্যান্য বই-এর সঙ্গে আমার বই কটা রয়েছে দেখে নিয়েছি আগেই।

মিষ্টার মজুমদার আবার বললেন—এখানকার মহিলা-সমিতি ওঁরই তৈরী, আর আজকে যে-লাইব্রেরীর উদ্বোধন হলো এ-ও ওঁরই চেষ্টায় বলতে পারেন—সভাপতি হিসেবে আপনার নাম তো উনিই প্রথম সাজেস্ট করেন।

নিজের প্রশংসায় মিসেস্ মজুমদার যেন বড় লজ্জিত হচ্ছেন বলে মনে হলো।

হয়তো তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বাধা পড়লো। হঠাৎ চাকরের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো একটি পাঁচ-ছ' বছরের ছেলে। সুন্দর দেহশ্রী। ছেলেটিকে চিনতে পারলাম। সভায় এই ছেলেটাই আমার গলায় মালা পরিয়েছিল। ছেলেটি ঘরে ঢুকে মার কোলের কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল। বললাম—এটি আপনার ছেলে বুঝি? কী নাম তোমার খোকা?

কাছে ডাকলাম তাকে।

ছেলেটি বিশুদ্ধ বাঙলায় বললে—নীলাজ মজুমদার।

—নীলাব্জ! বড় সুন্দর নাম দিয়েছেন তো।

মিষ্টার মজুমদার এবারও স্ত্রীর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে হেসে

বললেন—এ নাম ওঁরই দেওয়া, ও নাম দেওয়ার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য আছে জানেন, আমাদের তুজনের নামের প্রথম তুটো অক্ষর নিয়ে ওর নাম হয়েছে নীলাজ।

ওঁদের তুজনের নাম জিজ্ঞাসা করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ হবে কি ভাবছি।

মিস্টার মজুমদার নিজেই আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করে দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন—আমার নাম নিরঞ্জন, আর ওঁর নাম লাবণ্য কিনা—তাই থেকে নীলাজ। কিন্তু আপনি আর একটা সিঙ্গাড়া নিন —কি আর একটা সন্দেশ···

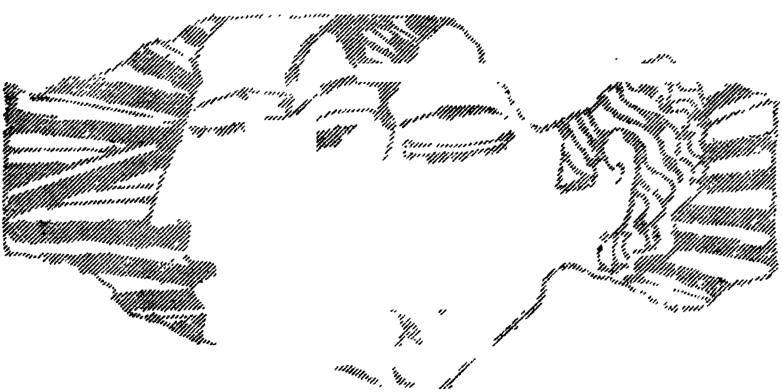
আমি কিন্তু ততক্ষণে নির্বাক হয়ে দেখছি। দেখছি মিসেস্ মজুমদারকে এতক্ষণে তো নজরে পড়ে নি। তাঁর চিবুকের ওপরে ডান দিকে একটা কালো তিল জ্বল জ্বল করছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অর্জুনের দেখা হয়ে গেল।

মহাভারতের কোনো মহারণ্যে নয়। সেখানে 'ঝিল্লিমন্দ্র মুখরিত নিত্য অন্ধকার' নেই, 'চিত্রব্যাঘ্র' সেখানে খরনখ শানিয়ে শিকার খুঁজে বেড়ায় না। নিতান্তই একটি সাধারণ রেল স্টেশন এবং সেখানে নিবিড় শাল বনের বদলে পাহাড়ের মতো স্তূপাকার শালকাঠ—যারা ওয়াগন বোঝাই হয়ে দিকে দিকে পাড়ি জমাবে।



দেখা হল স্টেশনের পাশেই। সেখানে বসন্তের হাওয়ায় ছুটো বাদাম গাছে লাল পাতারা খুশীতে দুলছে আর তার সামনেই মিঠাই-ওলার দোকানে দশসেরী কড়াই থেকে উথলে ওঠা মোষের দুধের তীব্র গন্ধ ছড়িয়েছে সেখানে। খাকী হাফশার্ট আর হলদে ট্রাউজার পরা অর্জুন তখন একজন সাঁওতালের কাছে একজোড়া তিতির দর করছিল। আর চিত্রাঙ্গদা সকালের নরম রোদে আর বসন্তের হাওয়ায় বেড়াতে বেরিয়েছিল, তার শিল্কের শাড়ীর আঁচল কিছুতেই শাসন মানছিল না।

প্রথম চিত্রাঙ্গদাই দেখল। সরু ভ্রূ দুটোকে জড়ো করল একবার, আরো নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে চোখের নীল গগলস্‌টা খুলল, তারপর এগিয়ে এল সেখানে।

—তুমি এখানে?

অর্জুন চমকাল। তবে বেশী নয়। বাইশ বছরের পুরুষ ত্রিশ বছরে অনেকটা বদলে যায়, কিন্তু বিশ বছরের মেয়ে আটাশ বছরে বেশী বদলায় না—অতিরিক্ত শুকিয়ে কিংবা মুটিয়ে না গেলে। চিত্রাঙ্গদার ক্ষেত্রে তার কোনটাই ঘটেনি বলে অর্জুন দেখবামাত্রই চিনতে পারল।

হেসে বলল, আমার এখানে থাকাটা খুব স্বাভাবিক, কারণ পাঁচ বছর ধরে এখানেই আছি, কাঠের ব্যবসা করি। আর তুমি এখানে আসতেও আশ্চর্য হইনি, কারণ কলকাতার চেঞ্জারদের রাঁচী-মধুপুর দেওঘরে অরুচি ধরে গেলে তাঁরা কখনো কখনো মুখ বদলাতে এখানে আসেন।

চিত্রাঙ্গদা চুপ করে রইল। একটি জবাব খুঁজতে লাগল, পেলো না। অর্জুন সাঁওতালটির সঙ্গে দরাদরির পর্ব মাঝ পথেই চুকিয়ে দিয়ে বলল, তা হলে ওই কথাই রইল মাঝি, তুই তিতির দুটো আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আয়।

মাঝি চলে গেল। অর্জুন পকেট থেকে একটি আধপোড়া চুরুট বের করে ধরালো: বেড়াতে বেরিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—কবে এসেছ এখানে?

—কালকে।

—ক'দিন থাকবে?

—সেটি ওঁর শরীরের ওপর নির্ভর করে। ডিসপেপসিয়ায় কষ্ট পাচ্ছেন, শুনেছেন এখানকার জল ভালো। যদি শুট করে, মাসখানেক কাটিয়ে যাবার ইচ্ছে।

অর্জুন বলল, এখানকার জলে অনেকেই উপকার পান শুনেছি। হয়তো ওঁরও কাজ হবে।

চিত্রাঙ্গদা হেসে বলল, ধন্যবাদ।

বাদাম গাছের লাল পাতাগুলো হাওয়ায় গুঞ্জন করছিল, টিরিক টিরিক করে মিষ্টি গলায় পাতার আড়াল থেকে টুনটুনি ডাকছিল খুব সম্ভব, দশসেরী কড়াইয়ে টগবগ করে ফুটে ওঠা মোষের দুধের ঘন গন্ধ হাওয়ায় ভাসছিল। দূরে দেখা যাচ্ছিল, উঁচু উঁচু মাঠের ভেতর দিয়ে দু-একটি কলাই ছোলার শেষ ক্ষেত পাশে রেখে লাল মাটির পায়ে চলা পথ চলে গেছে শালবন আর সাঁওতাল বস্তীর দিকে। পূব আকাশের কোণায় একটুকরে শাদা মেঘ চোখ বুজে ঘুমুচ্ছিল আর স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মালগাড়ীর ধোঁয়া যেন সাপের মতো ছোবল তুলছিল সেদিকে। সব কিছু মিলে চারিদিকে কি যেন একটা নিঃশব্দে ঘটছিল, মনে মনে একটা অর্থহীন লজ্জায় পীড়িত হচ্ছিল চিত্রাঙ্গদা, তার মুখে লালের আভা ভেসে উঠেছিল।

অর্জুন বলল, এর আগে কখনো এসেছিলে এদিকে ?

—না।

—তা হলে কিছুই দেখা হয়নি এখনো। অবশ্য দেখবার এখানে তেমন নেই ও। দু'একটি পাহাড়ী টিলা, তিরতিরে জল সুবর্ণরেখা আর শালবনের ভেতরে কোন পুরানো চোয়াড় রাজার একটি ভাঙা কালী মন্দির।

—নদীর রাস্তাটাই তবে দেখিয়ে দাও আগে—চিত্রাঙ্গদা আবার নীল গগলস্‌টি পরে নিল, যেন অর্জুনের উজ্জ্বল চোখ দুটো, সে সইতে পারছিল না ঃ সেদিক থেকেই ঘুরে আসি।

—আমি সঙ্গে গেলে আপত্তি আছে ?—চুরুটটি নিভে গেছে দেখে, ছাই ঝেড়ে অর্জুন আবার সেটি ট্রাউজারের পকেটে পুরল।

—আপত্তি কিসের ? কিন্তু তোমার কাজের কোন ক্ষতি হবে না ?

চওড়া মনিবন্ধের ওপর বড়ো সাইজের গোল ঘড়িটির ওপর একবার দৃষ্টি বোলালো অর্জুন ঃ না—এখন দুঘণ্টা আমার হাতে কোন কাজ

নেই। দুখানা ওয়াগানের সন্ধানে এসেছিলুম, স্টেশন থেকে বলেছে দশটা নাগাদ খবর দেবে। কাজেই—। ভালো কথা, একা যে? কর্তা কোথায়? ছেলে মেয়ে নেই?

—একটি মেয়ে। —চিত্রাঙ্গদা আবার চোখ নামালো: সে দার্জিলিংয়ে পড়ে। আর কর্তাও ব্যবসাদার মানুষ, কলকাতা থেকে এসেও তাঁর ছুটি নেই, চা খেয়েই এক গাদা জরুরি চিঠি লিখতে বসেছেন। একাই বেরুতে হল।

—চলো তবে।

একবার যেন দ্বিধা করল চিত্রাঙ্গদা, কিন্তু অর্জুন ততক্ষণে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেছে। কাজেই বাধ্য হয়ে চিত্রাঙ্গদাকেও জোর পায়ে হেঁটে তার সঙ্গ নিতে হল।

এই সব আধা-শহর জায়গা যেমন হয়ে থাকে, তাই। বাজারের অংশে ঘন বসতিটুকু বাদ দিলে ছাড়া-ছাড়া বাড়ী, টুকরো টুকরো বন-জঙ্গল, ফালি ফালি মাঠ, সার দিয়ে কাঠবাদাম, অশোক, নিম, কৃষ্ণচূড়ার গাছ। কলকাতার প্রবাসীদের শৌখীন বাগানগুলো কিছু কিছু নাম লেখা বাংলো ধরনের বাড়ী আছে দু'ধারে, কিন্তু এখন ঠিক সীজন নয় বলে ভীড় জমেনি, খালিই পড়ে আছে সেগুলো। দুটি একটি মানুষ ফাঁকা পথ দিয়ে মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করছে, একখানা সাইকেল রিকৃশা গেল—দুখানা মোষের গাড়ীও ধীরে সুস্থে পাশ কাটালো। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও অর্জুন আর চিত্রাঙ্গদার মাঝখানে একটি মস্ত বড়ো নির্জন পৃথিবী ছাড়িয়ে রইল।

অর্জুন কি ভাবছিল কে জানে, চিত্রাঙ্গদার মন আট বছর আগে চলে গিয়েছিল। এ দুটো ওদের আসল নাম নয়। কিন্তু ওরা 'চিত্রঙ্গদা' নৃত্য-নাট্যে ওই দুটো ভূমিকাতে অভিনয় করত, পাড়ায় একই ক্লাবে সদস্য ছিল দু'জনে।

একটু রং কি মনে লেগেছিল সেদিন? অর্জুনকে দেখলে মন খুশী হত, কাছে এলে ভালো লাগত, গল্প করতে করতে তাকিয়ে থাকত অর্জুনের মুখের দিকে। বাইশ বছরের অর্জুন—জিমনাষ্টিক করা শক্ত

জোয়ান ছেলে চোখ নামিয়ে নিত মেয়েদের মতো, কনায় কনায় ঘাম ফুটতে থাকত কপালে।

কিন্তু কুঁড়ি ধরবার আগেই ঝড়ে গেল। ছু-বার বি-এ ফেল করে, মধ্যবিত্ত ঘরের অর্জুন লজ্জায় কোথাও লুকিয়ে গেল আর বি-এ পাশ করে উচ্চ মধ্যবিত্তের মেয়ে ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র ছেলের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসল।

তার পরে আট বছর।

এর মধ্যে কি অর্জুনকে মনে পড়েনি কখনো? পড়েছে। বিয়ের বছরখানেক পরে খুকু এল। শরীরটা একটু সুস্থ হতেই রক্তে আবার নাচের অর্কেষ্ট্রা বাজল, ঘুঙুরের জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল পা ছুটো। স্বামী বার তিনেক চুপ করে রইলেন, চতুর্থ বারে স্পষ্ট সরল বাংলায় জানিয়ে দিলেন: কুমারী জীবনে যা ছিল তা ছিল, কিন্তু মা হওয়ার পরে চিত্রাঙ্গদার ধিঙ্গিপনা আর মানায় না। তিনি এ সব পছন্দ করেন না, তাঁর প্রেসটিজের প্রশ্নটিও আছে।

মিটল। পঞ্চমবার স্বামীকে অনুরোধ করবার প্রবৃত্তি আর হয়নি।

কিন্তু টাকা আর প্রেসটিজ ছুই-ই আছে বলে কোন চ্যারিটি কিংবা স্পেস্যাল ফাংশনের টিকেট স্বামী কখনো ফিরিয়ে দেন না। তা পাঁচ টাকার হোক আর পঁচিশ টাকারই হোক। নিজে যাবার সময় প্রায়ই পান না, কিন্তু চিত্রাঙ্গদাকে ঢালাও অনুমতি দিয়ে রেখেছেন। তাই এখনো নৃত্যনাট্য দেখতে গিয়ে নিজের দিনগুলোকে মনে পড়ে, 'চিত্রাঙ্গদা'র অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে চোখে জল আসে। তখন অর্জুন বারে বারে জেগে উঠে স্মৃতিতে। তেতলার ঘরে দামী নরম বিছানায় শুয়ে, ঘরের নীলচে মৃদু আলোয়. ছুচোখ মেলে জানলা দিয়ে পার্কের ভেতরে কয়েকটি গাছের মাথা দেখতে দেখতে কখনো কখনো একটি গভীর কান্নার মতো কি যেন ঠেলে ওঠে বুকের ভেতর থেকে। মনে হয় এ ছাড়াও জীবনের আরো কোনো অর্থ, আরো কোথাও ছিল।

চিত্রঙ্গদার ঘোর ভাঙিয়ে অর্জুন কথা বলল।

—হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?

—না

—আরো আধ মাইল যেতে হবে কিন্তু।

—তা হোক।

একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে, তারই একটি পাপড়ি টপ করে চিত্রাঙ্গদার মাথায় পড়ল। চিত্রাঙ্গদা ভালো করে টেরও পেল না। নিজের ভাবনার ভেতরে মগ্ন হয়েছিল সে, কিন্তু অর্জুন আড় চোখে লক্ষ্য করে দেখল বেশ মানিয়েছে। বাতাসে নিম ফুলের গন্ধ এল, সামনে থেকে একজোড়া ঘুঘু ডানা মেলল।

সুবর্ণরেখা দেখা দিয়েছে দূরে। সোনালী বালি আর নুড়ির ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে—রোদ পড়ছে তার ওপর—যেন নীল বেনারসী দুলছে হাওয়ায়, জরির কাজ ঝিকমিক্ করছে তাতে। চিত্রাঙ্গদা ভাবছিল, ওই নদীটি পার হয়ে, ওদিকের সবুজ বনের ভেতর দিয়ে—যদি অনেক দূরে চলে যাওয়া যায়, যদি কখনো আর ফিরে আসতে না হয়, তা হলে—

অর্জুন আবার তাকে জাগিয়ে দিল।

—একটি কথা বলব ?

—বলো।

—ওই যে সামনে কাঠের শাদা দোতলাটি দেখছ, ওইটেই এই গরীবের আস্তানা। যদি এক পেয়ালা চা খেয়ে যাও, ভারী খুশী হবো।

—তোমার বাড়ী ?—চিত্রাঙ্গদা রোমাঞ্চিত হল।

—মানে, যা হোক একটি মাথা গোঁজবার আস্তানা।

—সে রকম তো মনে হচ্ছে না। ছোট হলেও সুন্দর বাড়িটি—সামনে দেখছি ফুলবাগানও রয়েছে।

—ফুল এদেশের মাটিতে বলতে গেলে নিজের খুশিতেই ফোটে—অর্জুন হাসল : আর কাঠের বাড়ীর কোনো অ্যারিস্টোক্রেসিও নেই। আসবে একবার ?

—কেন আসব না ?

পর্দা সরিয়ে অর্জুন ভেতরে পা দিল। ডাকল : বনানী—বনানী—

দূর থেকে সাড়া এল : আসছি।

বেতের একটি সোফায় বসতে যাচ্ছিল চিত্রাঙ্গদা, বনানী ডাকটা যেন বুকের মধ্যে বিঁধল। ঠিক এইটে যেন তার প্রত্যাশা ছিল না, অথচ এ ছাড়া কীইবা আর হতে পারত! একটু সামলে নিয়ে বললে, বনানী তোমার স্ত্রী?

নিশ্চয়! ব্যাচিলরের ঘর হলে কি আর তোমায় ডেকে আনতুম এখানে? এসব পাড়াগাঁয়ের মানুষ এখনো কতগুলো পুরনো আইন-কানুন মেনে চলতে ভালোবাসে।

চিত্রাঙ্গদা বোধ হয় কথাগুলো শুনতে পেলো না, অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে রইল, ঘরটির দিকে। প্রাচুর্য আছে মনে হল না, কিন্তু রুচির ছাপ ঝক্‌ঝক্‌ করছে। দেওয়ালে বাছাই করা একটি ক্যালেণ্ডার—সোফায় টেবিলে মানানসই আবরণ, তিনটি ফুলদানিতে যেমন থাকা উচিত, তেমনি ভাবে ফুল সাজানো। কাঠের ব্যবসা করেও অর্জুন নিজেকে সম্পূর্ণ ভোলেনি, রবীন্দ্রনাথের ছবি আছে, উদয়শঙ্কর আর সিমকির হরপার্বতী রয়েছে, ওপাশে নিশ্চয় অ্যানাপাভলোভার ডায়িং সোয়ান।

চিত্রাঙ্গদা একটি চাপা নিঃশ্বাস ফেলল।

—নাচের চর্চা রেখেছ নাকি এখনো?

—পাগল! কাঠের হিসেব করে দিন কাটে, বনে বাদাড়ে ঘুরতে হয়। ছেলেবেলার কয়েকটি পছন্দসই ছবি ছিল, এনে টাঙিয়ে রেখেছি। ওই পর্যন্ত—তুমি?

চিত্রাঙ্গদা শীর্ণ রেখায় হাসল : আমি গিন্নীবান্নী—আমার কি ওসব মানায় আর?

—এমন সুন্দর ফিগার রয়েছে তোমার মানাবে না কেন?

নিতান্তই নাচের কথা—ফিগার। এক সময়ে কত অবলীলাক্রমে বলতে হত, শুনতে হত। কিন্তু আজ ওটা সম্পূর্ণ অপরিচিত ঠেকল, আবার লজ্জায় রং ফুটল চিত্রাঙ্গদার গালে।

—ছেড়ে দাও ওসব।

অর্জুন কীভেবে চুপ করে গেল, পকেট থেকে পোড়া চুরুটটি বের করে ধরিয়ে নিলে আবার। চিত্রাঙ্গদার চোখ পড়ল দেওয়ালের গায়ে দুটো চিতাবাঘের মাথার দিকে।

—বাঘ দুটো তুমিই শিকার করেছ বুঝি?

—একটি। আর একটির কৃতিত্ব আমার স্ত্রীর।

—বলো কি! চিত্রাঙ্গদা চমকে উঠলো: তিনি—

অর্জুন সস্নেহে হাসল: আমার চেয়ে ওর হাতের টিপ ভালো, রক্তের সংস্কার তো।

—রক্তের সংস্কার! চিত্রাঙ্গদার এতক্ষণে মনে হল, তার চোখে এখনো নীল গগল্‌স্‌টি রয়েছে, ঘরে ঢুকেও সেটি খোলা হয় নি। গগল্‌স্‌ খুলে সামনের টিপয়ে নামিয়ে রেখে বললে, বুঝতে পারছি না।

—মানে আমার স্ত্রী বনের মেয়ে। সে জন্যেই ঘরে এনে ওর—আমি নাম দিয়েছি বনানী।

চিত্রাঙ্গদা কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর মিলে গেল পরক্ষণেই। ভেতরের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল কালো পাথরে গড়া একটি সাঁওতালী মেয়ে পরনে বাঙালী ধরণের সাদা শাড়ী, কালো মেঘে বিদ্যুতের মতো দুহাতে দুটি সোনার কাঁকন, কপালে রাত্রির আকাশে প্রথম ফোটা তারাটির মতো সিঁদুরের ফোঁটা।

মেয়েটি বলল, তোমরা আসবার একটু আগে একজোড়া তিতির দিয়ে গেছে, তাই ছাড়াচ্ছিলাম, একটু দেরী হল আসতে।

অর্জুন বলল, তা হোক—তা হোক। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই বনানী। ইনি হলেন—।

চা এসেছিল, কেক এসেছিল, মিষ্টিও যেন কোথা থেকে আনান হয়েছিল কাকে দিয়ে। চিত্রাঙ্গদা কী যে খেল, ভাল করে টেরও পেল না। এলো মেলো ভাবে গল্প করল, অথচ তার একটি কথাও না বললে কোন ক্ষতি ছিল না। তারপর এক সময় উঠে দাঁড়ালো।

—এখুনি?—কব্জির সেই গোল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে অর্জুন

বলল, সুবর্ণরেখা দেখতে যাবে তো?

—আজ থাক! চিত্রাঙ্গদাকে ক্লান্ত মনে হল: আর একদিন হবে এখন তো আছিই এখানে।

—চলো তোমাকে এগিয়ে দিই—অর্জুন বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

—তুমি আবার—

তা ঠিক, সোজা রাস্তা, পথ হারাবার ভয় নেই তোমার। অর্জুন ঘড়িটা দেখল আর একবার: তবু ভদ্রতা একটু আছে, আর স্টেশনে তো আমায় যেতেই হবে। না হয় একটু আগে গিয়েই বসা যাক। ওদের আবার মধ্যে মধ্যে তাড়া না দিলে কাজ বেরোয় না।

দু'জনে বেরিয়ে এল। দোর গোড়ায় কালো মুখ থেকে এক ঝলক উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে বনানী বললে, আবার আসবেন।

একটি অর্থহীন হিংসার নীল আগুন চিত্রাঙ্গদার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে জ্বলছিল, তবু জোর করে হাসিটি ফিরিয়ে দিতে হল তাকে।

অর্জুন সুখী, বনানী সুখী। অর্জুনের কোনো ক্ষতি নেই, কোন ক্ষত নেই, নিজের জীবনে সে তার সঙ্গিনীকে খুঁজে নিয়েছে। কিন্তু—এই 'কিন্তু'টির উত্তরই চিত্রাঙ্গদা খুঁজে পেলো না।

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে ফিরে এল নিজেদের প্রকাণ্ড ভাড়াটে বাংলো 'জেসমিন ভিলা'য়। অর্জুনকে জিজ্ঞেস করল: আসবে না?

অর্জুন বলল, আর একদিন। আড্ডায় জমে যেতে পারি—ওদিকের কাজটি পণ্ড হবে। চলি আজ—

গেট থেকেই বিদায় নিল।

স্লিপিং গাউন পরে দোতলার বারান্দায় পায়চারী করছিলেন ভবতোষ রায়। চিত্রাঙ্গদা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতেই বিস্বাদ স্বরে বললেন, কে ও ছোকরা?

—আগে কলকাতায় থাকতেন আমাদের পাড়ায়। এখন ব্যবসা করেন এখানে।

—চেনা লোক পেয়ে আড্ডা দিচ্ছিলে! ডিসপেপটিক ভবতোষ রায় খিটখিট করে উঠলেন: ঘরসংসারটি একটু গুছিয়ে নিয়ে তারপরে

বন্ধুত্ব টন্ধুত্ব ঝালিয়ে নিলেই তো হয়। আমার ওষুধগুলো সব খুঁজে পাচ্চি না—নতুন চাকরটি যে টোষ্ট তৈরী করেছে, তা দাঁতে গুঁজানো যায় না—যত সব—

আমি দেখছি—

চিত্রাঙ্গদা ঘরে ঢুকল। মনে হল ঘরটির দরজা জানলা কিছুই নেই, দুপাশ থেকে দুসারি লোহার দেওয়াল যেন তাকে চেপে মারবার জন্যে এগিয়ে আসছে।

মহাভারতের যুগ নয়। একালের চিত্রাঙ্গদাকে কুবেরের খাজাঞ্চীর ঘরেই সংসার পাততে হয়েছে।

সুমথনাথ ঘোষ

কলেজী প্রেম

ইউনিভারসিটির ফটকে পা দিতেই ঘণ্টা বেজে গেল। প্রফেসর চৌধুরী হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তখনো সাত মিনিট বাকী। হয়ত 'স্লো' হয়ে গেছে তাঁর ঘড়িটা অনেকদিন 'অয়েল' করা হয়নি, এই মনে করে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকেন।

দোতলায় পৌঁছে আবার তিনতলার কয়েকটা ধাপ উঠে যেমন



মাঝের চাতালটায় দাঁড়িয়েছেন হঠাৎ একটি মেয়ে এসে নীচু হয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

হুড় হুড় করে একদল ছাত্রছাত্রী নামছিল দেখে তিনি এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তাই মেয়েটির মুখ আগে লক্ষ্য করেন নি।

মধুমিতা উঠে দাঁড়াতেই তিনি বলে ওঠেন, আরে তুমি! কথাটা বলেই কিন্তু হঠাৎ একেবারে চুপ হয়ে যান, তার সিঁথিতে সিঁদুর না দেখতে পেয়ে।

প্রফেসর চৌধুরীর মুখের রেখার এই সহসা পরিবর্তন মধুমিতার দৃষ্টি এড়ায় না। অথচ মধুমিতার সেই হাসিখুশিভরা মুখখানা তেমনি

আছে বরং আরো উজ্জ্বল বলে মনে হয় প্রফেসর চৌধুরীর চোখে। তাই মুহূর্ত কয়েক পরে কণ্ঠের সঙ্কোচ ও দ্বিধা কাটিয়ে তিনি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করেন, তোমার তো বিয়ে হয়েছিল, যতদূর মনে পড়ছে বোধহয় মাস তিনেক আগে, আমার ঘরে গিয়েছিলে নমস্কার করতে।

হাঁ স্যার! বলেই ফিক করে একটু হাসি ঠোঁটের কোলে টিপে নিয়ে বললে, ও কিছু নয়। ভুল হয়েছিল। পথ চলতে গেলে এমন 'এক্‌সিডেন্ট' হয়ই। আচ্ছা যাচ্ছি স্যার।

বলে মুখটা ঘোরাতেই প্রফেসর চৌধুরী প্রশ্ন করেন তুমি কি ক্লাশে এসেছিলে?

না, স্যার। এ বছরটা তো নষ্টই হলো। ভেবেছি পরে প্রাইভেট-এ দেবো। লাইব্রেরীর বইগুলো আমার কাছে পড়েছিল, আজ ফেরত দিতে এসেছিলাম। আপনার সঙ্গে সিঁড়িতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

সিঁড়িটা এতক্ষণে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। ওরা দুজনেই মাত্র এক-পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

প্রফেসর চৌধুরীর কানের ভেতরে তখনো মধুমিতার মুখের সেই কথাগুলো বাজছিল—'ও কিছু নয়, ভুল হয়েছিল।' "ও একটা এক্‌সিডেন্ট" তাই তিনি যেচে আবার প্রশ্ন করলেন, কি ডিভোর্স হয়ে গেছে?

আবার তেমনি হেসে জবাব দিলে, 'ডিভোর্স' না ছাই। রেজেষ্ট্রী হলে তবে তো সে প্রশ্ন ওঠে।

বিস্ময়ের ওপর আরো যেন বিস্ময় বেড়ে যায় প্রফেসর চৌধুরীর। বলেন, রেজেষ্ট্রী হয়নি। তাহলে?

তাহলে আর কি? কালীঘাটে গিয়ে যেমন সিঁদুর পরেছিলুম, কালীঘাটে গিয়ে আবার ঠিক তেমনিভাবে মুছে ফেলেছি। এ এক রকম 'এক্সপেরিমেনট্যাল্ ম্যারেজ' স্যার। আপনি এটাকে এত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন? বলে আরো জোরে যেন হেসে উঠলো।

প্রফেসর চৌধুরী ছাত্রীর এই কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু মধুমিতাকে এইভাবে হাসতে দেখে তিনি বলে ফেললেন, 'এক্সপেরিমেন্টাল্ ম্যারেজ' কথাটা আজ প্রথম তোমার মুখে শুনলুম। আবার হেসে ওঠে মধুমিতা। আপনি নেহাতি সেকেলে মানুষ, কিছুই খবর রাখেন না। আজকাল এ-রকম অনেক হচ্ছে।

তখনো প্রফেসরের চোখে বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি দেখে মধুমিতা বললে, আপনাদের সে যুগ আর নেই, পৃথিবী তারপর অনেক, অনেক এগিয়ে গেছে।

বলতে বলতে ঘট্ ঘট্ করে জুতোর শব্দ তুলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

প্রফেসর চৌধুরীর তখন ইচ্ছা করছিল, ছুটে গিয়ে মধুমিতাকে বলে আসেন, পৃথিবী অনেক এগিয়েছে তিনি জানেন, তবে তোমরা যে এতটা এগিয়েছো জানতেন না, এই প্রথম শুনলেন।

বাস্তবিক এখনো ওই একটা জায়গায় মেয়েদের কিছু 'সেন্টিমেণ্ট' আছে। সেই চিরাচরিত কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারে নি। শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা মডার্ণ-আলট্রা-মডার্ণ অনেক মেয়ে দেখেছেন তিনি। সিঁথিতে সিঁদুর পরা যত সহজ, তাকে মুছতে যাওয়া তেমনি কঠিন। সিঁদুর নয় শৃঙ্খল। এ শৃঙ্খল ছিন্ন করতে না পেরে কত মেয়ের তাই চোখের জল সাথী হয়েছে। মধুমিতার কথা শুনে, তাই তিনি হতবাক হয়ে যান। 'এক্সপেরিমেণ্ট্যাল ম্যারেজ' অর্থাৎ বিয়ে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা! বিবাহিতের মত জীবনযাপন করা—অস্থায়ীভাবে কিছুদিনের জন্যে খেয়াল খুশি মাফিক। না-না—এ হতে পারে না! এ কখনো সম্ভব! এত লেখাপড়া শিখে মেয়েরা শেষকালে এইখানে এসে পেঁাচেছে। এত নীচে কখনো নামতে পারে? তাহলে দেহ পসারিণীর সঙ্গে তফাৎ রইলো কি।

সেদিন ক্লাসে গিয়ে ভাল করে পড়াতে পারলেন না প্রফেসর চৌধুরী, বাড়ীতে গিয়েও মাথার মধ্যে সেই এক চিন্তা যেন পাক খেতে থাকে।

অন্য কোন সাধারণ মেয়ের মুখ থেকে একথা শুনলে তিনি জিনিষটা

এত গভীরভাবে হয়ত নিতেন না। মধুমিতা কেবল সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে নয়, কলকাতার এক উচ্চ শিক্ষিত, ধনী অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের রক্ত তার দেহে প্রবাহিত বলেই তাঁর মনকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল।

সত্যি কথা বলতে কি, বিবাহ ব্যাপারটার ওপর যত গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি থাক প্রফেসর চৌধুরী কিন্তু মধুমিতার মুখ থেকে ওই কথা শুনে মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন। ও কিছু নয়—ভুল হয়েছে, চলার পথে একটা 'এক্সিডেণ্ট' কথাটা খুব সত্যি। খাঁটি সত্যি। এতে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। 'এক্সিডেণ্ট' কথাটা বোধহয় এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রযোজ্য!

হাঁ, দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে একে? ওর ঘাড় থেকে যে ওই কুৎসিৎ কদাকার প্রেমের ভূতটা নেমে গেছে তাতে কেবল ওর জীবনটা রক্ষা পায় নি, সেই সঙ্গে ওর বাপ-মা আত্মীয়স্বজন চৌদ্দ পুরুষের মান-ইজ্জৎ রক্ষা পেয়েছে। সকলেই বোধহয় ওঁর মত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন!

এবং এটাই স্বাভাবিক। প্রফেসর চৌধুরীর দৃঢ় বিশ্বাস!

ছিঃ ছিঃ প্রেমে ঘেন্না! ভাবতে গেলে ন্যাকার আসে। ক্লাশে এত ভাল ভাল সুন্দর চেহারার সব তরুণ যুবক থাকতে পড়ে মরতে গেল কিনা মধুমিতা ওই আঁস্তাকুড়ে। হাঁ, আঁস্তাকুড়েই তো।

মধুমিতাকে যদি প্রস্ফুটিত কুসুম-কাননের সঙ্গে তুলনা দেয়া যায়, তাহলে তার পাশে ওই গোবর্ধন পালকে আঁস্তাকুড় ছাড়া আর অন্য নাম দেওয়া যায় না।

সে কেবল কালো কুৎসিত নয়, যাকে বলে হতকুচ্ছিৎ!

বাস্তবিক এ-রকম বিশ্রী কদর্য যদি চেহারা যে কারো হতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, এমন কি বর্ণনার দ্বারা বোঝানোও সম্ভব নয়।

প্রায় পনেরো বছর পড়াচ্ছেন প্রফেসর চৌধুরী এখানে এবং ওঁর এই বাংলা বিভাগেই ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সর্বাধিক। তিনি বলেন, 'হরি

ঘোষের গোয়াল।' এই দীর্ঘদিনে হরেক রকমের চেহারা তিনি দেখেছেন। খারাপ, মন্দ, কুশ্রী, কদাকার কাউকে হয়ত দেখতে কাফ্রীর মত কারুর কারুর বা মুখখানা কোল ভীল মাওমার্কা আদিবাসির কথা মনে পড়িয়ে দেয় তবু ঠিক এ রকমটি আর দ্বিতীয় দেখেন নি। মনে হয় বিধাতা যেন যেখানে যত কিছু কুৎসিত কুশ্রী ছিল সব দিয়ে গড়েছেন এই গোবর্ধনকে। যেমন নাম, তেমনি চেহারা!

ওর সহপাঠিরা ওকে বলে, ব্যাটা তুই যে সত্যি গোবরে পদ্মফুল ফোটালি।

আবার কেউ বা রসিকতা করে বলে, ঠিক করে বল তো, তোর এই কয়লার খনির ভেতরে কোন্ গুপ্ত ধনের সন্ধান পেয়েছে মধুমিতা? মাইরি মাইরি আমাদের দিকে একবার ফিরেও তাকায় না।

বাস্তবিক পক্ষে মধুমিতাকে পদ্মফুল বললে, এতটুকু অত্যুক্তি হয় না। কেবল রং ফর্সা নয়, চোখ মুখ নাক—সবকিছু নিখুঁত! মনে হয় কোন শিল্পী যেন মোম দিয়ে তার দেহটাকে তৈরী করেছিল। সারা ক্লাশ আলোকিত করে বসে থাকে মধুমিতা।

বাংলার ক্লাশে মধুমিতা মুখার্জী যেমন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, গোবর্ধন পাল তেমনি কুৎসিতের রাজা নয়, সম্রাট। ওরা দুজনে যেন পরস্পরের এ্যান্টি ক্লাইম্যাকস।

প্রফেসর চৌধুরীর মনে পড়ে, প্রথম দিন ওদের রোলকল করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন আজ আমি তোমাদের পুরো নাম ধরে ডাকবো আর তোমরা একে একে উঠে দাঁড়াবে, যাতে পরে তোমাদের দেখে চিনতে পারি, আমার ছাত্রছাত্রী বলে!

একে একে যেমন তিনি নাম ডেকে যান, এক একজন দাঁড়িয়ে ওঠে।

রোল নম্বর টোয়েন্টি সেভেন—গোবর্ধন পাল? বলে 'এদিক ওদিক তিনি তাকাতে থাকেন। হয়ত শুনতে পায় নি মনে করে প্রফেসর চৌধুরী আবার বলেন, একটু বেশী জোরে, স্ট্যাণ্ড আপ প্লিজ!

এবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় গোবর্ধন পাল।

একটা মৃদু গুঞ্জন ওঠে সঙ্গে সঙ্গে ক্লাশের মধ্যে।

গোবর্ধন জানতো যে তার চেহারা ভাল নয়, তাই সে ইতস্তত করছিল, ওইভাবে ক্লাশশুদ্ধ ছেলে-মেয়ের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে 'শো' করতে। তাই সেই অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি কানে যেতে অপমানে যেন তার সারা দেহ রিরি করতে থাকে! সকলের সামনে এইভাবে দাঁড় করিয়ে তাকে অপমান করাবার কি অধিকার আছে, প্রফেসর চৌধুরীর। কোন রকমে মনের রাগ চেপে সে বসে পড়ে, তার ইচ্ছা করছিল একটা ঘুষি মেরে প্রফেসরের মাথাটা গুঁড়িয়ে দিতে!

বলা বাহুল্য ছাত্র সন্তানতুল্য, তবু গোবর্ধনের মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠেছিলেন প্রফেসর চৌধুরী। সমস্ত মনটা যেন ভরে উঠেছিল গ্লানিতে। চট করে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে প্রফেসর চৌধুরী ডাক দিলেন, রোল নম্বার টুয়েণ্টি এইট···

ঠিক এমনি করে আবার যখন এসে পৌঁছলেন রোল নম্বার ফরটি-ওয়ানে এবং মধুমিতা মুখার্জী বলে ডেকে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন, তখন সব চুপচাপ। কাউকে দাঁড়াতে না দেখে তিনি বললেন, আই থিঙ্ক, সি ইজ এ্যাবসেণ্ট।

নো স্যার! বলে একমুখ হাসি ছড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় মধুমিতা!

কেবল প্রফেসর চৌধুরীর নয়, নিমেষে, সকলের দৃষ্টি গিয়ে যেন ওর মুখের ওপর আটকে যায়! সকলে যে নীরবে দুচোখ দিয়ে লেহন করতে থাকে মধুমিতার সেরূপ!

মধুমিতা মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে। ঠিক গোবর্ধন যেমন কুৎসিৎ বলে নিজেকে সকলের সামনে জাহির করতে সঙ্কোচ বোধ করেছিল, ও তেমনি সকলের মুখের ওপর রূপের পসরা মেলে ধরতে যেন কেমন সঙ্কোচ বোধ করছিল। তাই হঠাৎ সে বসে পড়তে সকলের যেন চমক ভাঙ্গলো! প্রফেসর চৌধুরী নিঃশব্দে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বুকের ভেতর চেপে ছিলেন! মনে হলো তাঁর গোবর্ধনকে দেখে যে গ্লানিতে মনটা ভরে উঠেছিল, তা যেন সব ধুয়ে মুছে দিয়ে

গেল মধুমিতা রূপ দিয়ে। মনে মনে তিনি শুধু ভাবলেন, 'বিউটি এণ্ড দি বিস্ট—একই ক্লাশে একসঙ্গে।

কিন্তু সেদিনের সেই চিন্তা একটা মাস যেতে না যেতে, অন্যরূপ নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল আবার তিনি শিউরে উঠলেন। পথে-ঘাটে, লাইব্রেরীতে, বারান্দায়, সিঁড়িতে,—ওদের দুজনকে একসঙ্গে পাশাপাশি দেখে।

মনে মনে তিনি ধিক্কার দিতেন, মধুমিতাকে। ছি, রুচি বলে, টেষ্ট বলে কিছু কি দেননি বিধাতা ওর মনে? কেবল বাইরেটায় যত রূপ দিয়েছেন, আর ভেতরে অন্ধকার।

ওইবকম রূপ নিয়ে ওইরকম কদর্য একটা পুরুষের সঙ্গে ঘুরতে মধুমিতাব লজ্জায় মাথা কাটা যায় না! কি জানি। এই জন্যে কি বলে নারীরহস্যময়ী, নারীর মন দুজ্ঞে য়।

এর জন্যে গোবর্ধনের ওপর ভেতরে ভেতরে তাঁর মনে একটা আক্রোশ জমে ওঠে।

ক্লাশে রোলকল করার সময়, রোল নম্বার 'টুয়েণ্টি সেভেন' বলে কান খাড়া করে থাকেন।

ইয়েস্ স্যার! শুনেই তিনি বলে ওঠেন, স্ট্যাণ্ড আপ্ প্লিজ।

আব কেউ দাঁড়াতে সাহস করে না। তখনি ওঁর বুঝতে বাকী থাকে না, গোদর্ধন ক্লাশ কেটেছে এব একা কাটেনি, মধুমিতা তাব সঙ্গী হয়েছে। এতক্ষণে মধুমিতাকে নিয়ে কোন রেস্তোঁরায় ঢুকে পর্দাব আড়ালে বসে প্রেম নিবেদন করছে। তাঁর এ কল্পনা কিন্তু নিমেষে সত্যে পরিণত হয়।

একটু পরেই যখন আবার ডাকেন, রোল নম্বার 'ফরণ্টি ওয়ান' এবং কোন একটি নারীকণ্ঠ প্রক্সি দেয় ঠিক মধুমিতার স্বরের অনুকরণ করে তখন তিনি ঠিকই ধরতে পারেন। মধুমিতার সে কণ্ঠস্বর যেন ঠুংরীর একটা তালের মত একেবারে কানে ঢুকে মনের ভেতরে গিয়ে যেন সুর হয়ে বাজে।

তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে ওঠেন হ্যাটস্ ব্যাড্ ! আই নো, সি ইজ নট্ ইন দি ক্লাস ! আই মার্ক হার, এ্যাবসেন্ট্ ।

ক্রোধ যেন ফেটে পড়ে তাঁর গলা দিয়ে। আর কত ছেলেমেয়েই তাকে ফাঁকী দিয়ে ঠকিয়ে এমনি প্রক্সি দিয়ে চলে যায়, তিনি ধরতেও পারেন না। কিংবা ইচ্ছা করেই, ধরার চেষ্টা করেন না। মরুক গে যার লেখাপড়ায় মন নেই, সে গোল্লায় যাক্, তাঁর কি দায় পরেছে। জোড়ায় জোড়ায় কত ছেলেমেয়েই তো ঘুরে বেড়াচ্ছে !

কিন্তু প্রফেসর চৌধুরীর এ মনোভাব একেবারে উল্টে যায় মধুমিতার সঙ্গে গোবর্ধনকে দেখলে কিংবা ক্লাশে পড়াতে পড়াতে যদি দেখেন, ওরা দুজনেই অনুপস্থিত। কখন সড়ুৎ করে সরে পড়েছে ওঁর চোখকে ফাঁকী দিয়ে।

ইদানীং তাই ক্লাশে ঢুকে আগে রোলকল্ না করে শেষে করতেন। যাতে ওঁর ক্লাশটায় শেষ পর্যন্ত মধুমিতা বসে থাকে। গোবর্ধনের জন্যে প্রফেসর চৌধুরীর এতটুকু মাথা ব্যথা ছিল না। তিনি জানতেন, যতক্ষণ মধুমিতা আছে ক্লাশে, ততক্ষণ ও ক্লাশ ছেড়ে কোথাও যাবে না। সুন্দরের প্রতি আকর্ষণটাই স্বাভাবিক এবং চিরন্তন সত্য বলে জানতেন প্রফেসর চৌধুরী। এই প্রথম, তাঁর জীবনে তিনি দেখলেন, কুৎসিতের প্রতি সুন্দরের আকর্ষণ! নিজে চোখে প্রত্যক্ষ না করলে, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতেন না এমন অসম্ভব কথা!

সত্যি এরি নাম, গোবরে পদ্মফুল ফোটা।

প্রফেসর চৌধুরীর মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল, তা একদিন দূর হয়ে গেল ওই গোবর্ধনের কথা শুনে !

তাই বলে গোবর্ধন, তাঁর কানে কানে সেকথা বলতে যায় নি। বরং তিনিই আড়াল থেকে শুনেছিলেন, একদিন যখন গোবর্ধনকে তার বন্ধুরা ঘিরে ধরে বলছিল, আজ আমাদের সকলকে কফি হাউসে তোকে খাওয়াতে হবে। তুমি ব্যাটা আমাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে রোজ স্ফূর্তি লুটবে, আর আমরা তোমার মুখের গন্ধ শুঁকে পেট

ভরাবো তা হবে না। পেটে খেলে পিঠে সয়! দেখি তোর পকেটে কত টাকা আছে!

বলে ওর বন্ধুরা যখন গোবর্ধনের পকেট হাতড়াতে থাকে, সে বলে, মাইরি একটা টাকাও আমার কাছে নেই।

কেন নেই। সব বুঝি ঢেলে দিয়ে এসেছিস, ওর গর্ভে? বল সত্যি করে আজ কত টাকা ওর পেছনে ঢেলেছিস। কোন্ রেস্তোঁরায় গিয়েছিলি? তোমার তো শালা আবার দিশিতে মানায় না, ফিরিঙ্গী পাড়ায় হোটেল না হলে জমে না। বল সত্যি করে আজ কোথায় গিয়েছিলি ক্লাশ কেটে?

মোকাম্বোয়!

কত টাকার বিল দিয়েছিস, সত্য করে বল?

গোবর্ধন বলে, পঞ্চান্ন টাকার বিল ও দি.য়ছে, আমি কোথায় পাবো টাকা?

ব্যাটা, গ্যাস্ দেওয়ার জায়গা পাওনি। কোথায় পাবে তুমি টাকা? রোজ তাহলে উড়তে যাও কি শূন্য-টঁ্যাকে? রেস্তোঁরায় কি হাওয়া খেতে যাও বাপধন?

মাইরি বলছি। যা কিছু খরচা সবই ও করে। আমি গরীব মানুষ কোথায় পাবো টাকা। আজ পর্যন্ত একখানা বই কেনবার টাকা জোগাড় করতে পারিনি—বিশ্বাস কর।

বলে হঠাৎ কণ্ঠস্বর এমন করুণ করে যে বন্ধুরা ওর পকেট থেকে হাত বার করে নেয়। তারপর ওর মুখের ওপর গভীর দৃষ্টি হেনে বলে, সত্যি বলছিস?

মাইরি। আপ্-অন্-গড্!

চমকে ওঠে গোবর্ধনের বন্ধুরা। বলিস কিরে, ব্যাটা তোর জীবন ধন্য! আমরা না খেয়ে গ্যাটের পয়সা খরচা করে সিনেমা দেখিয়ে কফি হাউসে খাইয়ে, আজ পর্যন্ত কারুর গা 'টাচ্' করতে পারলুম না, আর তুমি ব্যাটা ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে বেরিয়ে গেলে! আমরা সব বুড়বাকের মত চেয়ে রইলুম জুলজুল করে।

খপ্ করে একজন গোবর্ধনের দাঁড়িতে হাত দিয়ে বলে উঠলো, সত্যি করে বল তো, তুই হিপ্নোটিসম জানিস কিনা। সম্মোহন মন্ত্র দিয়ে শুনেছি যাকে খুশি বশ করা যায়। নইলে ক্লাশের ওই সেবা মেয়েটা, এতসব ভাল ভাল চেহারা থাকতে তোর মত কাল-মানিকেব পেছনে টাকা ঢালতে যাবে কেন ?

তাকে থামিয়ে দিয়ে, আর একজন বলে, মাইরি তুই একটা রেকর্ড করে গেলি, এই ইউনিভারসিটিতে, অনেককাল মনে থাকবে। গোবরে সত্যি সত্যি পদ্মফুল ফোটালি। প্রেম করতে অনেক মেয়েকে দেখেছি কিন্তু এমনটা আর কখনো দেখিনি। যাকে বলে 'বিউটি এণ্ড দি বিস্ট।'

'লাকি ডগ'। তোর পা থেকে চন্নমৃত নিয়ে খেতে ইচ্ছে করছে মাইরি। বলে দুহাত দিয়ে খপ করে ওকে জড়িয়ে ধরতেই, ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো। আর সবাই দুরদুর করে ক্লাশের দিকে ছুটে গেল।

পাশের ঘর থেকে এদের প্রত্যেকটি কথাই শুনতে পাচ্ছিলেন প্রফেসর চৌধুরী। তাঁর ও ছাত্রদের মাঝে মাত্র একটা পাতলা দেওয়ালের ব্যবধান।

তিনি আপন মনে বলে উঠলেন, প্রেমে পড়লে শুনেছি মেয়েদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। তাহলে কি সত্যি সত্যি মধুমিতা ওই কুৎসিত কদাকার ছেলেটার প্রেমে পড়েছে, নইলে এত টাকাই বা ওর পেছনে খরচ করতে যাবে কেন ?

ভাবতেও যেন তাঁর গা ঘিন্ ঘিন্ করে ওঠে।

এর কয়েকদিন পরেই ব্যাপারটা তার কাছে আরো পরিষ্কার হয়ে গেল। ওদের দুজনকে আর ক্লাশে যেমন দেখা যায় না তেমনি ছাত্রদের মধ্যে এ নিয়ে বেশ একটা কানাকানি চলে এর একদিন শুনলেন যে ওরা বিয়ে করেছে।

তারপর ওরা কেউই আর ক্লাশে আসতো না। লেখাপড়া ছেড়ে দিলে নাকি। ভাবেন প্রফেসর।

হঠাৎ একদিন দুপুরে প্রফেসর চৌধুরী ক্লাশ করে নিজের ঘরে

বিশ্রাম নিচ্ছেন, এমন সময় মধুমিতা এসে তাঁকে প্রণাম করে, পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে। ওঁর সিঁথিতে সিঁদুর দেখেই, তিনি বুঝলেন যা শুনেছিলেন, সত্যি! কিন্তু কেন জানি না তবু মুখ ফুটে একবারও সেকথা তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন না। শুধু আশীর্বাদ করার ভঙ্গীতে নিঃশব্দে তার মাথায় একবার হাতটা ঠেকিয়ে একটা কথাই শুধালেন, পড়াশুনো করবে তো, না ছেড়ে দেবে?

ছেড়ে দেবো কেন জিজ্ঞেস করছেন স্যার? হাসি হাসি মুখে প্রশ্ন করে মধুমিতা।

প্রফেসর চৌধুরী বলেন, তোমার মত অনেক মেয়েকেই ত দেখলুম!

না স্যার, আমি শিগ গিরই ক্লাশ করবো!

শিগ্‌গিরটা করে, আবার সেটা জিজ্ঞেস করতে আর প্রবৃত্তি হয় না প্রফেসর চৌধুরীর। ওর সম্বন্ধে সব কৌতুহল শেষ বরং তার বদলে আছে একটা বিতৃষ্ণা, ওর জঘন্য বিকৃত রুচির প্রতি!

মধুমিতাও তারপর আর ক্লাশে আসেনি, এবং না আসাতে আরো বেশী খুশি হয়েছিলেন তিনি। কারণ ওকে দেখামাত্র তাঁর মনে পড়তো গোবর্ধনকে, যাকে বিয়ে করেছে মধুমিতা প্রেমে পড়ে। ছিঃ কল্পনা করতে তাঁর গা ঘিন ঘিন করে ওঠে।

ওরা দুজনেই যখন আর ক্লাশে আসতো না এবং ওদের নিয়ে আলাপ আলোচনা সব থেমে গিয়েছিল তখন হঠাৎ প্রফেসরের সঙ্গে এইভাবে একদিন সাক্ষাৎ মধুমিতার ওই সিঁড়িতে।

সেদিন ওর মাথায় সিঁদুর না দেখে এবং ওর মুখের কথা শুনে মনে মনে যতই খুশি হোন প্রফেসব চৌধুরী, সেই 'এ্যাক্‌সিডেন্ট' কথাটা যেন কিছুতেই ভুলতে পারেন না। লেখাপড়া শিখে মেয়েরা আজ অনেকদূর এগিয়েছে যে সিঁথির সিঁদুরটা তাদের কাছে একটা দুর্ঘটনার সমান। হাতপা ভেঙ্গে কয়েকটা দিন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থেকে আবার বাড়ীতে ফিরে আসার মতন। প্রেম, ভালবাসা, সব ভুয়ো! কোন কিছুর প্রতি শ্রদ্ধা নেই!

মধুমিতা এমন একটা রহস্যের দ্বার তার সামনে খুলে দিয়েছিলো,

যে তার মধ্যে ঢুকলে ওঁর মাথা ঝিম ঝিম করে যেদিকে তাকান, শুধু অন্ধকার, আর অন্ধকার।

ইদানীং কোন মেয়ের মাথায় নতুন সিঁদুর দেখলে সহসা কেমন একটা আতঙ্ক জাগে তাঁব বুকের মধ্যে। মনে পড়ে যায়, মধুমিতার সেই 'এ্যাকসিডেন্ট'-এব কথা! জানতে ইচ্ছা করে ওঁর প্রেমের বিয়ে কিনা।

এর মাস কয়েক পবেই, হঠাৎ একদিন সংবাদপত্রেব একটি খববের ওপর প্রফেসর চৌধুরীর চোখ যেন হোঁচট খেয়ে আটকে যায়!

একবার সংবাদটা পড়ে দ্বিতীয়বার পড়লেন। যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না! মিঃ হোমেন চ্যাটার্জী ও তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রী মিসেস্ মধুমিতা চ্যাটার্জী গতকাল মধুযামিনী যাপন করতে সুইজারল্যাণ্ড গিয়েছেন। শ্রীমতী হাটখোলাব বিখ্যাত জমিদার রায় বাহাদুর সুশান্ত মুখার্জীর কনিষ্ঠা কন্যা!

এই সেই মধুমিতা নিশ্চয়ই। উত্তব কলকাতার কোন এক বড় লোকের মেয়ে জানতেন, এদিকে মুখার্জীর মেয়ে, তাও যখন মিলে যাচ্ছে, তবু সন্দেহ নিরসনের জন্যে প্রফেসর চৌধুরী ইউনিভারসিটিতে গিয়ে, লাইব্রেরিয়ানের কাছ থেকে ওর বাবার নামটা জেনে, নিশ্চিত হলেন।

এবার হয়ত বাপ-মা দেখেশুনে বড়লোকের ছেলে কোন ইঞ্জিনীয়ার কি চাটার্ড একাউণ্ট্যাণ্টের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। ধনীর গৃহলক্ষ্মী হয়ে হয়ত সে বংশের মুখ উজ্জ্বল করছে। মধুমিতার জীবনেব সেই এ্যাড-সিডেন্টের কথা, কেউ হয়ত আর কখনো জানতেও পারবে না! সতীলক্ষ্মী, কুলবধু সে আজ তবু মনে মনে তিনি কামনা করলেন, সে সুখী হোক। ওঃ সেই কদাকার কুৎসিত ছেলেটার হাত থেকে কেবল রেহাই পায়নি, মধুমিতা একটা কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, আর গোবর্ধন জাতে কুমার, সেখানেও কি পার্থক্য! শিক্ষাদিক্ষা, রুচি-প্রবৃত্তির এত অপমান কি সহ্য হয়! আরে বাবা, প্রেম কি মুখের কথা! প্রেম বললেই প্রেম হয়। প্রেম জিনিসটা এত সস্তা নয়। তার প্রমাণ তো

তিন-চারটে মাস যেতে না যেতেই মধুমিতা হাতে হাতে পেলে! শিক্ষা নিশ্চয়ই হয়েছে এবার।

মনটা বেশ যেন ঝরঝরে লাগে প্রফেসর চৌধুরীর, মধুমিতার সেই সুন্দর চেহারাটা যেন নতুন করে তাঁর চোখের সামনে ঝলমল করে ওঠে। আর একবার তাকে দেখার ইচ্ছা জাগে ওঁর মনের ভেতরে। নিশ্চয়ই বড়লোকের কোন সুন্দর সুদর্শন যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। একবার তাদের জোড়ে পাশাপাশি সেই যুগলমূর্তি দেখে যেন প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। ভুলতে চান গোবর্ধনকে, তাঁর মনের এ গোপন বাসনা, কেউ জানতে পারে না। তবু অজ্ঞাতে যেন খুশীতে ভরে ওঠে তাঁর মন। কোন প্রিয়জন অনেকদিন কঠিন রোগে ভোগার পর হঠাৎ সুস্থ হওয়ার সংবাদ পেলে যেমন মনের অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি।

এরপর সুদীর্ঘ দশটা বছর কেটে গেছে। প্রফেসর চৌধুরী রিটায়ার করেছেন ইউনিভারসিটি থেকে তাঁর ছেলে এখন বেশ কৃতী। আমেরিকার কর্মরত। সেখান থেকে বাবা-মাকে যে মোটা টাকা পাঠায়, তাতে খব স্বচ্ছন্দে বাস করেন প্রফেসর চৌধুরী।

এখন তাই গরম পড়লে আর কলকাতায় থাকেন না। বলেন, বড্ড গরম, খুব কষ্ট হয়! কখনো দার্জিলিং, কখনো বা পুরী, গোপালপুর গিয়ে ঠাণ্ডায় দিন কাটান।

সেদিন পুরী হোটেলের দোতালা থেকে নামছেন, এমন সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে যায় মধুমিতার সঙ্গে। একটা পাঁচ-ছ বছরের ছেলের হাত ধরে সে ওপরে উঠেছিল। ছেলের দু' হাতে নানারকমের খেলনা।

আশ্চর্য এতটুকু চেহারার পরিবর্তন হয়নি মধুমিতার বরং একটু মোটা হয়ে গায়ের রং যেমন আরো ফুটেছে চোখে মুখের রেখাগুলো তেমনি আরো কোমল ও আরো মধুর হয়েছে! পাহাড়ী নদীতে হঠাৎ বর্ষার জল ভরে গেলে যেমন দেখায়।

মধুমিতা কিন্তু তাঁকে চিনতে পারেনি প্রফেসর চৌধুরীর চেহারার

অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমতঃ বেশ মোটা হয়েছেন দ্বিতীয়তঃ মাথার চুল প্রায় সব সাদা হয়ে গেছে, এবং সমস্ত দাঁতগুলো তুলে ফেলে কৃত্রিম দাঁত পরাতে মুখের আকৃতিটাও বেশ বদলে গেছে।

মধুমিতা না ?

মধুমিতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সিঁড়িতে। তারপর ভাল করে প্রফেসর চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে ও স্যার আপনি ? বলেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে !

হাঁ। তুমি তো চিনতেই পারোনি। ভাগ্যিস আমি ডাকলুম। বলে হেসে ফেললেন।

স্যার আপনার চেহারা পাল্টে গেছে অনেক। কিছু মনে করবেন না ? কুণ্ঠার সঙ্গে বলে মধুমিতা।

না। না। কিছু মনে করিনি। তোমায় দেখে বড় আনন্দ হলো। তোমরা হনিমুন করতে সুইজারল্যাণ্ড গিয়েছিলে কাগজে সে সংবাদ পড়ে এত খুশি হয়েছিলুম কি বলবো।

হঠাৎ ছেলের হাতটা টেনে মধুমিতা বলে ওঠে, টুব্‌লু ওঁকে নমস্কার করো। ছিঃ···করো···

কি করে করবো। আমার যে তুহাতে খেলনা।

প্রফেসর এবার হেসে উঠলেন, ঠিক বলেছো !

মধুমিতা বললে, দাও ওগুলো আমার। এবার টুব্‌লু প্রফেসরকে পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করতে তিনি তাকে কোলে তুলে নিয়ে, চুমু খেলেন ! বাঃ দিব্যি ছেলে হয়েছে তোমার। কি নাম তোমার, বলো ত বাবা !

টুবলু !

ওটা তো তোমার ডাক নাম ! ভাল নাম কি বলতো ?

সলজ্জ মুখে এবার টুবলু তার মায়ের মুখের দিকে চায়।

বলো ? লজ্জা কি ?

টুবলু বললে শ্রীঅমিত্রসূদন পাল।

পাল ? বলে একটু থেমে নীরবে মধুমিতার মুখের ওপর দৃষ্টি

বুলিয়ে প্রফেসর চৌধুরী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ছে, তোমার ব্রাহ্মণের ঘরেই বিয়ে হয়েছিল—চ্যাটার্জী কি ব্যানার্জী ঠিক মনে পড়ছে না।

ঘাড় হেঁট করে জবাব দেয় মধুমিতা হাঁ স্যার! চ্যাটার্জী!

তাহলে? বলে দুচোখে একটা বড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন তুলে তেমনি-ভাবেই তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর চৌধুরী।

তার সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে স্যার। অপরাধীর মত কণ্ঠে বললে মধুমিতা।

ডিভোর্স হয়ে গেছে! কেন?

সে আমি আপনাকে বলতে পারবো না স্যার। জিজ্ঞেস করবেন না! বলে একটু চুপ করে রইলো। শেষে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, তিন-চার বছর ধরে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতে নিজেকে এ্যাডজাষ্ট করতে পারলুম না স্যার। গাড়ী বাড়ী। ফরেন ডিগ্রীওলা ইঞ্জিনীয়ার স্বামী সবই পেয়েছিলুম, বলে হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চাপতে চাপতে নীরব হয়ে গেল।

প্রফেসর চৌধুরী এবার আস্তে আস্তে বললেন, সবই যদি পেয়েছিলে বলছো তাহলে আরো কি পাওনি—আমার সেটা জানতে ইচ্ছা করছে মা তোমার মুখ থেকে। আমি তোমার শিক্ষক আশা করি তোমার কাছ থেকে এটুকু জানার অধিকার আমার আছে।

বলে পুরু চশমার ভেতর দিয়ে মধুমিতার মুখের ওপর নীরবে তাকিয়ে রইলেন।

মধুমিতা ওঁর মুখের ওপর থেকে চোখ দুটো নামিয়ে ধীরে ধীরে বললে প্রথমে যেটা ভুল বলে ধারণা হয়েছিল পরে বুঝতে পারলুম সেটা ভুল নয় সেটাই সত্য, সেটাই আসল। সে ভাল বাসার সঙ্গে তুলনা হয় না আর কারো?

এই বলে একটু থেমে আবার মধুমিতা বলে, আমার মনে হয় স্যার বিয়ে মানে, বাড়ী, গাড়ী, স্বামীর বিলাতী বড় চাকরী নয়, তার চেয়ে অনেক বড় প্রেম। কাছে থেকে সেটা ভালো বোঝা যায় না।

দূরে গিয়ে মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিল তাই প্রথম ভুল সংশোধন করে নিয়ে আবার নতুন করে জীবনকে বেঁধেছি তারি সঙ্গে। আচ্ছা আসি স্যার বলে আবার সে নমস্কার করলেই প্রফেসর চৌধুরী একটা কথা না বলে মুখখানা কঠিন করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মা চলো না কত দেরী করছো বাবা বকবে যে, বলে টুবলু মধুমিতার আঁচল ধরে টানতে থাকে।

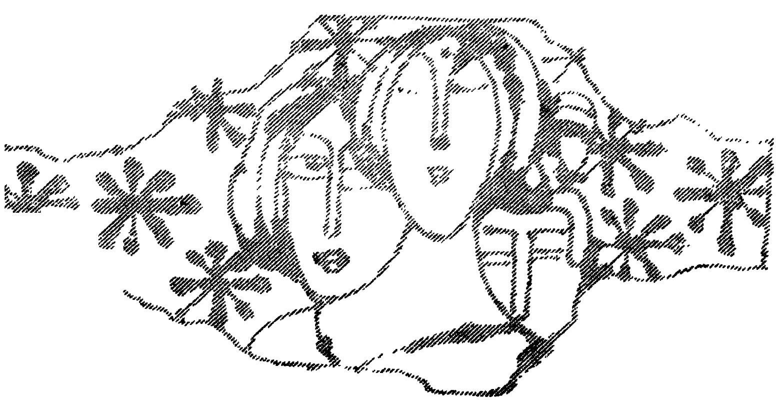
হাঁ। চলো যাচ্ছি বলে ছেলের হাত ধরে একটার পর একটা সিঁড়িতে উঠে যখন ওপরে চলে যায় মধুমিতা, প্রফেসর চৌধুরী তখন নীচে নামতে শুরু করেন ধীরে ধীরে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

রহস্যময়ী

এমন অনেক মেয়ে থাকে—চোখে দেখে যাদের বয়স ঠাহর করা শক্ত। মইনু ঠিক সেই জাতের মেয়ে।

জাতিতে সাঁওতাল। কালো কুচ্‌কুচে গায়ের রঙ। দেখলে মনে হয় যেন কালো মার্বেল পাথর থেকে কুঁদে বের করা হয়েছে তার শরীরটিকে।



গায়ের রঙ যদি তার ফর্সা হতো তাহলে হয়তো তাকে রাজরাণী বলতাম—এমনি তার মুখশ্রী।

কিন্তু ভাগ্য মন্দ, গরীব সাঁওতালের মেয়ে হয়ে জন্মেছে, পেটের দায়ে সারাদিন খেটে মরে। তার রূপের বড়াই করলে চলবে কেন?

এখানকার এই কয়লা কুটিতে সে নতুন এসেছে। মাস দুয়েক আগে তাকে আমি প্রথম দেখেছি।

এর মধ্যে তাকে চেনে না—সে রকম লোক এই কয়লা-কুটিতে খুঁজে বের করুন দেখি!

একজন ও পাবেন না।

মইনুকে চেনে সবাই।

চেনবার কারণ অবশ্য একটা আছে।

আপনি অপরিচিত মানুষ, চেনেন না মইনুকে। কিন্তু মইনু যদি একবার পড়ে আপনার চোখের সুমুখে তো যতই কেন-না উদাসীন হোন্ আপনি—তাকাতেই হবে তার মুখের দিকে।

আর যেই তাকিয়েছেন, আপনার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়েছে কি—বাস্, ফিক করে সে হাসবেই।

সে কী হাসি!

লিখে জানাতে হলে আপনি হয়তো লিখবেন—তার সুচারু চিক্কন কয়েকটি দাঁত দেখা গেল, চোখ যেন বিদ্যুতের ঝিলিক্ হান্‌লে।

বাস্ আর কি লিখবেন?

কিন্তু এতে সে হাসির কিছুই বলা হলো না। তার সে মাধুর্য্য, সে মাদকতার কিছুই বোঝাতে পারবেন না।

হাসি যেন তার মুখে লেগেই আছে।

জীবনের দুঃখ-বেদনা তাকে বোধহয় স্পর্শই করতে পারে না। নইলে তার চিন্তাক্লিষ্ট ভারি-ভারি মুখ কেউ কখনও দেখেছে বলে মনে হয় না।

পাঁচ নম্বর কুলি-ধাওড়ার একটেরে একটা আম গাছের তলায় ছোট্ট একখানা ঘর-অনেকদিন থেকে খালিই পড়েছিল।

সেই ঘর খানা দখল করেছে মইনু।

খাদে খাটতে যাবার সময়-অসময় নেই মেয়েটার। কখনও দেখা যাচ্ছে দিনে খাটছে, কখনও দেখা যায় রাত্রে।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, ইণ্ডিয়া ছ্যাট ইজ ভারত তখন ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া। এইসব কয়লার কুঠিতে—তখন বিস্তর সাহেবের ঠিকানা, আনাগোনা। কিন্তু মাটির নীচে থেকে কয়লা তোলার কোনও শ্রী-শৃঙ্খলা ছিল না। মাটির নীচে থেকে কয়লাটা তুলে বিক্রি রতে পারলেই হোলো।

মইনুর কথা হচ্ছে, মইনুর কথাই বলি।

মইনু মদ খায়।

মদ যেদিন সে খেতে শুরু করে, সেদিন সে কাজেও যায়না, রান্নাও করে না। ঘরে বসে বসে আপনমনেই গান গায় আর ঢক্ ঢক্ করে মদ গেলেন।

তখন বর্ষাকাল।

রাত্রি থেকে বৃষ্টি নেমেছে পরের দিন সকাল পর্যান্ত বর্ষণের বিরাম নেই।

মইনুকে আজ কিন্তু কাজে জেতেই হবে।

হাতে পয়সাকড়ি যা কিছু ছিল কাল রাত্রে—দিয়েছে সব ফুঁকে।

না দিয়ে কোনও উপায়ও তো ছিল না।

পোড়া বাদল কি নামারও সময় পায়নি!

আর এই বাদল নামলেই মনটা কেমন যেন উদাস-উদাস হয়ে যায়। এখন রাত্রি আর এমন বাদল—একা থাকতে মন চায় না।

তাই কোন রকমে মদ গিলে মনটাকে ভুলিয়ে রাখা।

কিন্তু মেয়ে মানুষের মন বড় বিচিত্র। কারও কথা শোনে না। মদ খেয়ে ভুলে থাকবার চেষ্টা করে মইনু।

চেষ্টাই করে শুধু।

মদ খাওয়াই সার হয়। আগুন যেন আরও দ্বিগুণ জোরে জ্বলে ওঠে।

মদ খেয়ে রাতটা সে একরকম জেগেই কাটিয়েছে। মাঝে-মাঝে ঘুমিয়েছে বটে, কিন্তু সে ঘুম নয়।

প্রিয়বাহু বেষ্টিতা কণ্ঠলগ্না প্রেয়সীর নিশ্চিন্ত নির্ভরতা নয়, সে যেন মিথ্যা স্বপ্নাচ্ছন্ন একটা তন্দ্রার কুহেলিকা।

মইনু দেখলে, রাত্রির অন্ধকার কেটে গেছে। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। কর্দমাক্ত পথের ধারে খানাডোবাগুলো বর্ষার জলে থৈ থৈ করছে। ব্যাঙ ডাকছে।

সুমুখে আম গাছটার ডালে বসে একটা পাখী পাখা ঝাড়ছে।

ওই সব পাখীদেরও যেতে হবে খাবারের সন্ধানে।

মইনু উঠে দাঁড়ালো।

দেখলে কয়েকটা তালগাছের ফাঁকে লাল সূর্য্য পূবদিকের আকাশটিকে রাঙা করে দিয়েছে।

মাথার উপর বর্ষণক্ষান্ত আকাশ থম্‌থম্‌ করছে।

পিপাসায় গলাটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে মইনুর।

হাতের কাছে ঘটিতে ছিল জল। সেই জল সে গলায় ঢেলে দিলে খানিকটা। মদ থাকলে মদই খেতো।

মইনু পথে গিয়ে নামলো।

বাঁদিকে সিঙ্গারন নদী এঁকেবেঁকে চলে গেছে পুরনো একটা নীল-কুঠির পাশ দিয়ে। নীলকুঠিব এখন নামটাই আছে শুধু। ভাঙা কয়েকটা ইটের দেয়াল, আব তার চারদিকে আগাছার জঙ্গল। ছোট বড় নানা-রকমের গাছ। বেশ নির্জন, নিরিবিলি।

নদীটা কিন্তু এখন বর্ষার জলে কানায় কানায় ভরা।

মইনু চলতে চলতে গান ধরলে—

সাঁওতালি গান, সাঁওতালি সুর।

—নদীতে পড়েছে বান, পার কর ভগবান
ওপারে আমার ইয়ে
ডাকে হাতছানি দিয়ে
(বলে) এসো তুমি এসো আমার কাছে।
কতদিনের কত আশা
ভাললাগা ভালবাসা
(শুধু) মুখের কথা নয়রে বঁধু,
আমার বুকে ভরা আছে।

কুঠিতে যেতে ইচ্ছে করছিলনা মইনুর। তবু তাকে যেতে হলো।

সাইডিং-এ গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাড়ীতে কয়লা বোঝাই করতে হবে।

ঠিকাদারের লোক বসেছিল বোয়ান গাছের তলায়। মইনু তার

কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, কাজ করবি ?

মইনু বললে, কাজ করবো না তো কি তোকে দেখতে এলাম ?

বাবুটি মুখ তুলে তাকালে মইনুর দিকে।

মইনুর মুখে সেই সর্বনাশা হাসি !

বাবু বললে, যা কাজ কর।

মইনু বললে, দে একটা সিগ্রেট দে।

বাবু তার পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করলে।

বিড়িটি হাত বাড়িয়ে নিলে মইনু। তারপর কি তার মনে হলো, বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, চাইলাম সিগ্রেট, দিলে বিড়ি। বিড়ি আমি খাইনা।

বলেই সে একটা বেতের ঝুড়ি তুলে নিয়ে চলে গেল।

যেতে যেতে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলে মইনু।

শুধু দেখলে না। হাসলে।

বাবুর তখন আফশোষের সীমা নেই। মনে হলো তার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট যদি সে পায় তো কিনতে পারে।

বাবু উঠে দাঁড়ালো।

সিগারেট তাকে আনতেই হবে।

দামী সিগারেট কেনবার ক্ষমতা তার নেই। সস্তা এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে ঠিকাদার বাবু ফিরে এল ডিপোর কাছে।

কুলি কামিনের দল কাজ করছে।

কিন্তু মইনু কোথায় ?

এদিক-ওদিক বৃথাই তাকে খুঁজতে লাগলো সে।

কোথাও না পেয়ে একটা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলে মইনুকে দেখেছিস ?

মেয়েটা বললে, ঝুড়ি ফেলে দিয়ে ছুটলো এদিকে।

আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে।

খাতায় নাম লিখিয়ে পালিয়ে যায়—এ কি রকম মেয়েরে বাবা।

একপা একপা করে ঠিকাদার এগিয়ে গেল সেই দিকে। সুমুখের মাঠটা ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গিয়ে নদীতে পড়েছে। বাঁদিকে নীল-বন। শ্রেণীবদ্ধ শাল, তাল, তমাল আর হরীতকীর জঙ্গল।

পথে যেতে যেতে হঠাৎ মনে হলো—নীলবনের একটা তমাল গাছের তলায় কারা যেন চেঁচিয়ে কথা বলছে। ঠিকাদার এগিয়ে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

খিল্ খিল্ করে হাসির শব্দ!

এ-হাসি মইনুর হাসি।

কিন্তু লোকটা কে?

কার সঙ্গে এত হাসি রহস্য?

আগাছার ঝোপের আড়ালে কাউকে ভাল দেখাও যায় না। কথাও তাদের শেষ হচ্ছে না।

অথচ একটা কথাও সে বুঝতে পারছে না।

ঠিকাদার আর চুপ করে থাকতে পারল না। চীৎকার করে ডেকে উঠল, মইনু!

গাছের আড়াল থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো মইনু।

আর তার পেছনে কোট-প্যান্ট পরা একজন সাহেব।

মইনু ঠিকাদারকে বললে—তুই এখানে এলি কেনে?

সাহেব দেখে ঠিকাদারের মাথাটা তখন ঘুরে গেছে। হাতেই ছিল সিগারেটের প্যাকেট। সেইটে মইনুর দিকে বাড়িয়ে ধরে ঠিকাদার বললে, সিগ্রেট চাইল তখন—

মইনু হো হো করে হেসে উঠলো। বললে, তাই তুই আমাকে সিগ্রেট দিতে এলি?

ঠিকাদার বললে—হ্যাঁ।

মইনু সাহেবের দিকে তাকালে। বললে, দ্যাখ্ সাহেব, দ্যাখ্—এরা আমাকে কত ভালবাসে।

সাহেব একটু ম্লান হাসলে। তারপর যা বললেন—বাংলায় তার

মানে—গুড নাইট্‌, তাহলে ওই কথা রইলো। কাল সকালে আসছি। আমি আর কোনও কথা শুনবো না।

মইনু বললে, বললাম তো।

সাহেব আবার একবার 'গুড নাইট' বলে পিছন ফিরে চলে গেল।

কয়েক পা এগিয়ে আবার ফিরে এলো। ডাকলে—মইনু!

মইনু বললে, আবার কি?

সাহেব এবার মইনুর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে, ডারলিং, এবার কিন্তু বেইমানী কোরো না আমার সঙ্গে। আমি মরে যাব।

বলেই সিগারেটের প্যাকেট বের করে মইনুর মুখে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে দেশলাই ধরিয়ে দিলে। তারপর নিজেও একটি সিগারেট ধরিয়ে ঠিকাদারের দিকে প্যাকেটটাই বাড়িয়ে ধরলে।

ঠিকাদারের হাতটা তখন থর থর করে কাঁপছে।

তাদের কয়লা-কুঠির চেনা সাহেব নয়।

না হোক, তবু সাহেব তো!

হাত বাড়িয়ে নিল একটি সিগারেট, সাহেব দেশলাই জ্বালিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি এই কুঠিতে কাজ করেন বাবু?

ঠিকাদার বললে, হ্যাঁ আমি ঠিকাদারের লোক। এখন কয়লার ওয়াগন-বোঝাই করাচ্ছি।

সাহেব বললে, আচ্ছা বাবু, মইনু তোমাদের এখানে কতদিন আছে?

ঠিকাদার বললে, মাস খানেক হবে।

—এর আগে কোথায় ছিল?

—তা তো জানি না।

সাহেব বললে, ছ'মাস ধরে আমি ওর পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছি। ছ'মাস আগে মইনু ছিল হাজারিবাগে। আমার বাবা ছিল সেখানকার ম্যানেজার।

মইনু সিগারেট টানতে টানতে তাদের কাছে এসে দাঁড়ালো।

বললে, আঃ, সাহেব, কি হচ্ছে? যেখানে সেখানে কথাগুলো তোর না বললেই চলছে না?

সাহেব যেন চৈতন্য ফিরে পেলো। বললে, ও হাঁা। কাল আমি আসবো। আর আমাকে কষ্ট দিসনা মইনু।

মইনু বললে, ঠিক আছে। তুই যা এখন।

আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত সাহেব চলে গেল।

ঠিকাদার ডাকলে, মইনু!

মইনু তাব হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, কি বলছিস?

ঠিকাদার চুপিচুপি বললে, সাহেব তোকে খুব ভালবাসে।

মইনু জবাব দিল না।

ঠিকাদার আবার বললে, তুইও ওকে ভালবাসিস্। চুপকরে রইলি কেন? বল!

মইনু চলতে চলতে ফিরে দাঁড়ালো। বললে, যা জানিস না তাই নিয়ে কথা বলছিস কেন? ভা-ল-বা-সা! ভালবাসা কাকে বলে জানিস তুই? ভালবেসেছিস কাউকে?

ঠিকাদার বললে, হুঁ। বেসেছি।

মইনু জিজ্ঞাসা করলে, কাকে?

ঠিকাদার বললে, তোকে।

—আ-মর মুখপোড়া!

বলেই মইনু ছুটলো সাইডিং-এর দিকে।

পরের দিন সকাল।

বর্ষার আকাশ থম্‌থম্ করছে। মেঘে ঢাকা সূর্য্য উঠেছে পূবের আকাশে। একখানা গাড়ী এসে দাঁড়াল মইনুর সেই ধাওড়া ঘরের দরজায়। গাড়ী থেকে নামল সেই সাহেব।

কিন্তু এ কি মইনু কোথায়?

ঘরের দোর হাট হয়ে খোলা। মইনু নেই।

সাহেব ডাকল, মইনু।

কোথায় যেন একটা টিকটিকি ডেকে উঠলো শুধু।

সাহেবের বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগলো। দোরের কাছে সে চুপ করে দাঁড়ালো কিছুক্ষণ, তারপর বাব কতক এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার গাড়ীতে চড়ে বসলো। বললে, চল।

ঠিকাদার বসেছিল ডিপোর কাছে—একটা বোয়ান ঝোপের তলায়। রোজ যেমনি বসে থাকে সেদিনও তেমনি বসেছিল সে।

সাহেব এসে দাঁড়ালো ঠিকাদারের পেছনে। বললে 'গুড মর্নিং বাবু।'

ঠিকাদার সন্ত্রাস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

কিন্তু সন্ত্রস্ত হবার কিছুই নেই। সাহেব নিজেই তার সে সঙ্কোচ ভেঙে দিলে। নিজেই বসলো সেই বোয়ান গাছের তলায়—ঠিকাদারেব পাশে। বলল, তুমিও বোসো বাবু।

ভয়ে ভয়ে বসল ঠিকাদার। সাহেবের পাশে বসাটাকে তার সৌভাগ্য বলে মনে হলো।

তার ওপর সাহেব তার পকেট থেকে সিগারেট বের করে দিল তার হাতে। নিজেও একটি সিগারেট ধরিয়ে জ্বলন্ত দেশলাই-এর কাঠিটি ধরলে ঠিকাদারের মুখের কাছে।

এও কি কম সৌভাগ্য নাকি?

কুলি-কামিনদের দিকে তাকাতে লাগলো ঠিকাদার।—ছাখ্‌ তোরা খাতিরটা একবার ছাখ্‌!

তারপর সাহেব আরম্ভ করল তার দুঃখের কাহিনী।

সাহেব বলল, মইনু পালিয়েছে বাবু।

ঠিকাদার অবাক হয়ে গেল।

—পালিয়েছে? কোথায় পালিয়েছে।

সাহেব বললে, কেমন করে জানবো বাবু? এমনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো ওর স্বভাব। ওর জন্য আমি আমার সবকিছুই নষ্ট করেছি। আমার বাবা, আমার আত্মীয়-স্বজন সবাই আমার উপর রাগ করেছে। হাজারিবাগের একটি মস্ত কারখানায় আমি একজন বড় ইঞ্জিনীয়ার।

দেড় হাজার টাকা মাইনের চাকরি—আমি ওই সাঁওতাল মেয়েটার জন্য ছেড়ে দিয়ে আজ ছ'মাস ধরে পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছি। এ-কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। ভাববে হয়তো আমি মিছে কথা বলছি। ভাববে হয়তো আমি পাগল হয়ে গেছি। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর বাবু—

এই বলে সাহেব তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলে। বললে, মেয়েটা সত্যিই আমাকে পাগল করেছে।

বলতে বলতে সাহেবের চোখ দুটো জলে ভরে এলো।

কোন সাহেবকে কখনও সে কাঁদতে দেখেনি। তার কেমন যেন অদ্ভুদ মনে হতে লাগল।

সাহেব বললে, মইনুকে আমি বিয়ে করবো বলেছি। আমাকে বিয়ে করার জন্য কত ইংরাজ মেয়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। কিন্তু মইনুকে পেলে তাদেব কাউকে আমি চাই না। মইনু সব জানে। তবু সে এমনি করে লুকোচুরি খেলছে আমার সঙ্গে আজ ছ'টি মাস ধরে।

এই বলে সাহেব একটু থামলো। তারপর আবার বলতে লাগলো আমিও আজ ছ'মাস ধরে ছুটে বেড়াচ্ছি তার পিছু পিছু। আমি জানি —সে খুব সুখে নেই, কয়লার ঝুড়ি মাথায় নিয়ে কামিনের কাজ করে, খুব কষ্টেই তার দিন চলে। তবু কেন সে এমনি করছে—কি সুখে সে এমনি করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তুমি বলতে পারো বাবু?

নিত্য ছাপোষা গরীব মানুষ এই ঠিকাদার। সে কেমন করে জানবে এই মায়াবিনীর মনের খবর?

জবাবে সে শুধু বললে, আমি তো কিছু বলতে পারছিনা সাহেব। তবে আমার সঙ্গে যদি দেখা হয় কোনদিন তো মইনুকে আমি জিজ্ঞাসা করবো।

সাহেব খুব উৎসাহিত হয়ে বললে, দেখা হবে? তোমার সঙ্গে তার দেখা হবে বাবু?

ঠিকাদার বললে, আমি তো সব জায়গা ঘুরে বেড়াই সাহেব, ঘুরে বেড়ানই আমার কাজ। দেখা একদিন হবেই।

সাহেব আবার তার হাতখানি চেপে ধরলে। বললে, আমার কথা তাকে তুমি বলবে বাবু। খুব ভাল করে বলবে।

ঠিকাদার বললে, নিশ্চয়ই বলবো।

সাহেব বললে, বলবে—সে যদি আমার স্ত্রী হয়ে থাকতে চায়, আমি তাকে সব রকম সম্মান দেবো, তার কোনও কষ্ট রাখবো না।

ঠিকাদার বললে, কিন্তু ধরো, আমি যদি তাকে রাজি করাতে পারি, তোমাকে আমি খবরটা দেবো কেমন করে?

সাহেব তক্ষুনি তার পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বের করে তার নাম-ঠিকানা লিখে দিলে। আর সেই ঠিকানা লেখা কাগজটির সঙ্গে ঠিকাদারের হাতে দশটাকার একখানি নোট জোর করে গুঁজে দিয়ে বললে, এইটে তুমি রাখো বাবু তোমার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা টেলিগ্রাম করে দেবে আমাকে।

ঠিকাদার বললে, তার জন্য এত কেন? দশটাকা কি হবে?

সাহেব বললে, এখানে-ওখানে যাবে, তার খোঁজ খবর করবে, তোমার খরচ আছে তো!

টাকা ফিরিয়ে দেবার মত মানুষ ঠিকাদার নয়। উপরি পাওনা ভেবে দশটাকার নোটখানি সে সানন্দে তার পকেটে রেখে দিলে।

মইনুর জন্য এখান-ওখান ঘুরতে হলো না ঠিকাদারকে।

তিন চার দিন পরে সে গিয়েছিল পিয়ারসোল কলিয়ারীতে কুলি-কামিন আনবার জন্য। দেখলে একটা কদম গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মইনু। আঁটসাঁট করে শাড়ীটা পরেছে। মাথায় এলো খোঁপার ওপর দুটি কচি কদমের পাতা আর একটি কদমের ফুল গোঁজা। হাতে একটি জ্বলন্ত সিগারেট। কি যেন সে ভাবছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আয়ত দুটি চোখের দৃষ্টি উদাস।

ঠিকাদার তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু সহজে কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরুলো না। কথা কইতে ভয় করে যেন।

মইনু চোখ ফেরাতেই নজরে পড়লো—ঠিকাদার দাঁড়িয়ে আছে।

—ওমা, চোরের মত অমন করে দাঁড়িয়ে আছিস কেনে?

চিরাভ্যস্ত তার সেই হাসির রেখা ফুটে উঠলো ঠোঁটের ফাঁকে। স্ফটিকের মত সাদা দাঁতগুলি তার দুদণ্ড চেয়ে দেখার মত।

ঠিকাদার বললে, তোর সঙ্গে আমাব কথা আছে মইনু। সাহেব সেদিন আমাকে অনেক দুঃখ করে অনেক কথা বলে গেল।

মইনু বললে, জানি!

—জানিস্ তবু পালিয়ে এলি?

হুঁ। বলে মইনু আবার কেমন যেন উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো দূরে একটা খাদের হেড-গিয়াবেব দিকে।

ঠিকাদার বললে, সাহেব তোকে বিয়ে করতে চায় মইনু।

মইনু বললে, সাহেব চাইলে কি হবে, আমি চাই না।

ঠিকাদার বুঝতে পারলেনা কেন এই সৌভাগ্য সে হেলায় হারাচ্ছে। বললে, কেন মইনু? সাহেব খিরিস্তান বলে?

মইনু বললে, না বাবু না তুই থাম্। আমিও খৃষ্টান।

কথাটা শুনে ঠিকাদার যেন চম্‌কে উঠলো।

মইনু বলে কি? সাঁওতালের মেয়ে মইনু খৃষ্টান?

মইনু বললে, হ্যাঁ। আমার মাও ঠিক এমনি এক সাহেবকে বিয়ে করেছিল। আমার মা, বুঝতেই তো পারছিস, তারও রূপ ছিল, যৌবন ছিল। কিন্তু রূপ-যৌবন তো চিরকাল থাকে না। মার বয়স হলো, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সবই গেল। তখন সাহেব একদিন কোত্থেকে এক বুড়ি মেমকে ধরে নিয়ে এলো।

ঠিকাদার জিজ্ঞাসা করলে, তারপর?

মইনু বললে, তাবপর সব শেষ। মা একদিন আমার হাত ধরে এমনি এক গাছের তলায় দাঁড়ালো। কি কষ্টে কেমন করে যে আমাদের দিন কেটেছে তা আর বলতে পারবো না বাবু। মা মারা গেল। মরবার আগে আমার হাত দুটো ধরে বললে, আর যা করিস করবি মইনু, কিন্তু কালো চামড়ার সাঁওতাল আমরা, সাদা চামড়ার সাহেবের সঙ্গে কোনদিন ভাব করতে যাস না।

বলতে বলতে মইনুর চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে এলো।

ঠিকাদার বললে, কিন্তু সাহেব তোকে ভালবাসে মইনু।

মইনু বললে, আমিও ওকে কম ভালবাসি না।

—তবে?

মইনু বললে, সেই তো হয়েছে জ্বালা। না পারি ধরতে, না পারি ছাড়তে। যাক্‌গে, ও-সব কথা তুই বুঝবি না।—আট আনা পয়সা দে দেখি বাবু। মদ খাব।

পকেট থেকে একটি আধুলি বের করে মইনুর হাতে দিয়ে স্তম্ভিতের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো ঠিকাদার। তার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরুলো না।

সরোজ কুমার রায়চৌধুরী

রমণীর মন

পাঞ্জাব মেল আসানসোল স্টেশনে যখন থামল, তাতে তিল ধরবার জায়গা নেই। সুরেশ্বর মিথ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। তৃতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীরা হাঁফাচ্ছে। যারা বসে আছে তাদের অবস্থাও যেমন, যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদেরও তেমনি।

তখন ভোর হতে দু'তিন ঘণ্টা দেরি। অনিদ্রায় এবং সারারাত্রির



থকলে সবাই ধুঁকছে। চোখ ছোট হয়ে এসেছে। গাড়ির দরজা পর্যন্ত লোকের ঠাসাঠাসি।

সুরেশ্বর করুণ কণ্ঠে আবেদন জানাল: আমাকে একটু ঢুকতে দিন। এ গাড়িতে না যেতে পারলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কিন্তু সে আবেদন কারও কানে গেল বলে মনে হল না। অধিকাংশই নির্বিকার। নিজেকে সামলাতেই ব্যস্ত। অন্যের সর্বনাশের কথাও ভাববার সময় নেই। যাদের কানে আবেদন পৌঁছুল, তারা সর্বনাশের কথাটা বিশ্বাসই করলে না। ভিড়ের সময় ট্রেনে ওঠবার জন্যে

অনেকেই অনেক সর্বনাশের দোহাই দেয়। তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে হাসল। কেউ বা না-শোনার ভান করল। কেউ বা মুখ ফুটেই মন্তব্য করল : এত যদি তাড়া, আগের ট্রেনে যাননি কেন? সুরেশ্বর তারও হয়তো একটা জবাব দিলে, কিন্তু সে কেউ শুনলে বলে মনে হল না।

অবশ্য সকলেই কিছু নির্মম লোক নয়। যাদের কিছু দয়া-মায়া আছে, সুরেশ্বরের আবেদনের উত্তরে তারাও করুণভাবে হাত জোড় করে জানালে, দরজাটা যে খুলি এমন জায়গাও খালি নেই।

কথাটাও সত্যি। এবং সুরেশ্বরের সর্বনাশের কথাটাও মিথ্যে নয়। সুরেশ্বর তখন মরিয়া। প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠা ছাড়া তার উপায় নেই। কিন্তু সেখানেই বা প্রবেশের পথ কোথায়? উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীরা ভিতর থেকে দরজা-জানালা বন্ধ করে সুখসুপ্ত।

সুরেশ্বর কয়েকটা দরজাতে জোরে জোরে ধাক্কা দিলে। কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না। হতাশভাবে ফিরে এলে আবার একটা দরজায় ধাক্কা দিতে মনে হল কে যেন দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। একটা জানালার খড়খড়ি যেন নেমে গেল।

—কে? কি চান?

রমণীর কণ্ঠস্বর।

সুরেশ্বর জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। সকাতরে বললে, আমি অত্যন্ত বিপন্ন। এ গাড়িতে না যেতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। একটুখানি জায়গা চাই।

মহিলাটি নিঃশব্দে ওর দিকে চেয়ে রইল। জিজ্ঞাসা করলে, কত দূর যাবেন?

ব্যগ্রভাবে সুরেশ্বর উত্তর দিলে, কলকাতা। মানে হাওড়া।

—সঙ্গে আর কেউ আছে?

—আজ্ঞে না। আমি একলা।

সুরেশ্বর অস্থির হয়ে উঠেছে। ট্রেন ছাড়তে আর দেরি নেই। এক্ষুনি গার্ড হুইস্‌ল্‌ দেবে এবং মেল ট্রেন সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে আরম্ভ

করবে। তার সমস্ত দেহ চঞ্চল। যেন এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ছুটছে।

মহিলাটি আরও কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে তার দিকে চেয়ে রইল। সুরেশ্বরের চঞ্চল কাতর দৃষ্টি একবার গার্ডের গাড়ির দিকে, একবার ড্রাইভারের এঞ্জিনের দিকে এবং আর একবার মহিলাটির দিকে ছুটোছুটি করছে।

মহিলাটি কি যেন ভাবলে। তারপরে দরজাটা খুলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সুরেশ্বর বিদ্যুৎবেগে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগে এই ভোরেও সুরেশ্বর ঘেমে উঠেছিল। বেঞ্চে বসে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে এতক্ষণে সে কামরাটার চারিদিকে চেয়ে দেখবার অবসর পেল।

যে বেঞ্চে সে বসেছে সেই বেঞ্চে একটি বছর ষোল-সতেরোয় ছেলে। ফর্সা রং। ছিপ্ছিপে লম্বা চেহারা। পরিধানে চমৎকার স্যুট। দিব্যি স্মার্ট দেখতে।

ওদিকের বেঞ্চে আর একটি ছেলে। বছর এগারো-বারো বয়স হতে পারে। সেটিও স্যুট-পরা। দাদার মতোই সুন্দর দেখতে। মায়ের গা ঘেঁষে বসে একদৃষ্টে আগন্তুকের দিকে চেয়ে আছে। তার চোখে কিছুটা কৌতূহল, কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা বিরক্তি।

তারপরে মহিলাটি।

তার দিকে চেয়ে সুরেশ্বর থমকে গেল। মহিলাটি অপলক তার দিকে চেয়ে রয়েছে। কৌতুকে চোখের তারা দুটি নাচছে। চোখের তারা সকল মেয়ের নাচে না। তার জন্যে চাই সূক্ষ্মাগ্র তির্যক ভ্রূ, দীর্ঘ পক্ষ্ম এবং আবেশ-বিহ্বল টানা চোখ।

সুরেশ্বর অনেক মেয়ে দেখেছে। কৌতুকে চোখের তারা কারও নাচত না। বাদে একজন। কিন্তু?

মহিলাটির ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি না?

সুরেশ্বর এবারে লাফিয়ে উঠল: অমিতা না?

—চিনতে পেরেছ?

—না পারারই কথা। আজকের ব্যাপার তো নয়!

সুরেশ্বরের মুখে এবং কণ্ঠস্বরে অনেকখানি খুশি এবং অনেকখানি লজ্জা খেলে বেড়াতে লাগল।

অমিতা বললে, তোমার গলার স্বর শুনেই তোমাকে চিনেছি। দরজা খুলে দেখি, মূর্তিমান তুমি! কিন্তু তোমার তখন কারও দিকে দৃষ্টি দেবার সময় নয়। একটু বসতে পেলে বাঁচ।

লজ্জিত কণ্ঠে সুরেশ্বর বললে, যা বলেছ! কোথাও এক ফোঁটা জায়গা নেই। অথচ

—অথচ বিপদটা কি!

সুরেশ্বরের মুখ হঠাৎ করুণ হয়ে গেল। বললে, আমার মেজ ছেলেটি, তাকে বোধ হয় দেখনি, যক্ষ্মা হাসপাতালে। রাত বারোটায় টেলিগ্রাম পেলাম, তার অবস্থা ভালো নয়।

—ও।

সমবেদনায় অমিতার মুখও বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

বললে, সুনীতিদিকে আনলে না?

—সে তো নেই। সে তো অনেকদিন হল নেই।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—কি হয়েছিল?

সুরেশ্বরের মুখের উপর একটা কালো ছায়া খেলে গেল, যেটা অমিতার ভালো লাগল না। প্রসঙ্গটাকে এড়াবার জন্যে বললে, সে অনেক কথা অমিতা। আবার যদি কখনও দেখা হয় বলব।

ওর মনের ভাব অমিতা বুঝলে। একে সে অনেক দুঃখের বিনিময়ে খুব ভালো করেই চিনেছে। সুতরাং কিছুটা অনুমানও করতে পারলে। জেদ না করে তাই সে চুপ করে রইল।

একটু পরে সুরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কোথা থেকে আসছ এক্ষুনি

অমিতা হাসলে। বললে, অমৃতসর থেকে।

—এ দু'টি?

সুরেশ্বর ছেলে দু'টির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে।

—আমার ছেলে।

উত্তর দিতে গিয়ে সুরেশ্বরের বিস্ময়-বিমূঢ় চোখের দিকে চেয়ে অমিতার গাল দুটি আরক্তিম হয়ে উঠল।

ছেলে দুটির জন্যেই সুরেশ্বর নিজেকে সামলে নিলে। সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, আর কি খবর বল?

হেসে অমিতা জবাব দিলে খবর তো অনেক। আবার দেখা হলে বলব।

একটু চিন্তা করে সুরেশ্বর বললে, দেখা হবে। তুমি কোথায় উঠবে?

—প্রথমে ভেবেছিলাম, কোনো একটা হোটেলে উঠব।

—তারপরে?

—উনি বললেন, মাসখানেক থাকতে হতে পারে। তখন একটা বাড়ি ঠিক করাই ভাল। তাই থিয়েটার রোডের কাছাকাছি একটা বাড়ি ঠিক হয়েছে।

অমিতা রাস্তার নাম এবং নাম্বারটা বলে জিজ্ঞাসা করলে তুমি তো নিজের বাড়িতেই উঠবে? কোথায় যেন সেটা?

সুরেশ্বর হাসলে। অত্যন্ত ম্লান হাসি। বললে, না, সেখানে উঠব না।

—কেন?

—সেটা বিক্রি হয়ে গেছে। সেও অনেক দিনের কথা। যাই হোক ছেলেকে দেখে একদিন তোমার ওখানে নিশ্চয়ই যাব।

—নিশ্চয় এস। ভারী খুশি হব।

—সত্যি?

—সত্যি।

—অণ্ডাল এসে গেল। এবারে নামতে হবে। দেখি যদি

কোথাও থার্ড ক্লাসে একটা দাঁড়াবার জায়গা পাই। হাওড়া স্টেশনে আবার দেখা হবে।

অমিতা কিছু বলবার আগেই সুরেশ্বর নেমে গেল।

সুরেশ্বরের চেহারা, সাজ-পোশাক এবং কথাবার্তায় অমিতা বুঝেছিল, খুব দুঃখের মধ্যেই তার দিন কাটছে। তৃতীয় শ্রেণীতে সুরেশ্বর ভ্রমণ করতে পারে এটা অচিন্তনীয়। তার কলকাতার বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। আছে এখন আসানসোলের বাড়িতে। আগে বছরে ছ' মাস আসানসোলে আর ছ'মাস কলকাতার বাড়িতে থাকত।

ধনী পিতামাতার একমাত্র সন্তান সুরেশ্বর। এই অবস্থায় অতিরিক্ত আদরে যা হয় সুরেশ্বরেরও তাই হয়েছিল। তার বিলাস-ব্যসন এবং বদ্ খেয়ালের অন্ত ছিল না।

তার ঐশ্বর্যের চমকে বিভ্রান্ত হয়ে প্রথম যৌবনে অমিতা একদিন তার বদখেয়ালের স্রোতে কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিল

কুটোর মতো।

কী যে অমিতার হয়েছিল, নিজের বলে কিছুই যেন তার ছিল না। বাপ-মা, সঙ্গী-সাথী, লেখাপড়া কিছুই তাকে বাঁধিতে পারেনি। পারেনি। সে যেন একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সে কি ভালোবাসার, না ওর ঐশ্বর্যের চমকে, না ওর রূপে?

হ্যাঁ রূপ বটে।

পুরুষের এত রূপ সে কখনও দেখেনি। দীর্ঘচ্ছন্দ বলিষ্ঠ চেহারা। প্রশস্ত ললাট, বড় বড় রক্তোৎপলের মতো চোখ আর কাঁচা সোনার মতো রং!

আর তেমনি অতুলনীয় অমিতব্যয়িতা। টাকা যেন হাতের ময়লা! বিন্দুমাত্র মমতা নেই তার উপর।

মমতা নেই নিজে ছাড়া আর কারও উপর, কিছুরই উপর। টাকা আসে অনভিনন্দিত, যায়ও তেমনি। মধ্যে যে আনন্দলোক সৃষ্টি হয় তার নিজের জন্যে সেইটেই বড় কথা।

নইলে একান্তভাবে তারই উপর নির্ভরশীল অসহায় কোনো

মেয়েকে নিশ্চিন্তে হাওড়া স্টেশনে কেউ ফেলে যেতে পারে। শুধু সুরেশ্বরই পারে।

এবং পাঞ্জাব মেল এক সময়ে সেই হাওড়া স্টেশনেই অমিতাদের নামিয়ে দিলে।

অমিতা চেয়ে দেখতে লাগল।

কত কাল পরে সেই হাওড়া স্টেশনে ফিরে এল সে! বড় ছেলের দিকে চেয়ে মনে-মনে হিসাব করে দেখলে আঠারো বৎসর। তখন তার বয়সও ছিল আঠারো। আজ ছত্রিশ।

কত পরিবর্তন হয়েছে হাওড়া স্টেশনের। না কি তার নিজের চোখেরই পরিবর্তন হল। আঠারো বছর বয়সের চোখ আর ছত্রিশ বছর বয়সের চোখ এক নয়। সেদিন আর এদিনও এক নয়। যেন দুটি পৃথক জন্মের দুটি দিন!

অমিতা চারিদিকে চেয়ে চেয়ে মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল, ডাঃ অখিল নন্দীর সঙ্গে কোথায় দেখা হল। ওইখানে কি? যেখানে একটি বৃদ্ধ দম্পতি কতকগুলি ট্রাঙ্ক এবং বস্তা নামিয়ে কার জন্যে যেন অপেক্ষা করছেন?

হয়তো এ প্ল্যাটফর্মেই নয়। অন্য কোন প্ল্যাটফর্মে কে জানে? আঠারো বছর আগে কোন্ একটা অজ্ঞাত ট্রেন কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ত, আজ আর কাউকে জিজ্ঞাসা করেও জানবার উপায় নেই। অখিলের নিজেরই মনে নেই খুব সম্ভবত।

অথচ জানতে পারলে মনটা বড় ভালো হত। সেই জায়গাটাই তার বর্তমান জন্মের সূতিকাগার। সেইখানে নতুন করে অমিতার জন্ম হয়।

সূতিকাগার এবং সেই সঙ্গে শ্মশানও।

সেইখানে মরে গেল অমিতা মুখুয্যে। পুড়ে ছাই হয়ে গেল। জন্ম নিলে অমিতা নন্দী। ছেলে দুটির দিকে চেয়ে তার মন যেন আরও জোর পেল। হ্যাঁ, অমিতা নন্দী, মুখুয্যে নয়।

অথচ সে বুঝতে পারলে না, যে মেয়েটি নিজের শ্মশান নিজের

চোখে দেখতে চায় সে অমিতা নন্দী নয় মুখুয্যেই। অনেক কাল পরে তার বুকের মধ্যে আঠোরো বছর বয়সের রক্ত টগবগ করে উঠেছে।

কিন্তু নিজের শ্মশান নিজের চোখে দেখার কি জো আছে। এই পৃথিবী যেন কী! নদীর স্রোতের মতো, মরুভূমির মতো। দাগ কেটে চিহ্নিত করে কিছুই রেখে যাওয়া যায় না।

—চল মা।—বড় ছেলেটি তাগাদা দিলে।

—হ্যাঁ যাই।

অমিতার চোখ চারিদিকে কি যেন তখনও খুঁজছে।

সুরেশ্বর হন্তদন্ত হয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে সব নেমেছে? আর কিছু নেই তো?

গাড়ির ভিতর উঁকি দিয়ে উপর-নিচে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখে দিয়ে সুরেশ্বর আশ্বস্তভাবে বললে, না। আর কিছুই নেই। চল এখন। এই কুলী!

কুলীর মাথায় মোট চাপিয়ে আবার বললে, চল। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে হবে তো?

অমিতা তথাপি নড়ে না।

—কি খুঁজছ? কিছু হারাল নাকি?—সুরেশ্বর এবার রীতিমত তাড়া দিলে।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে অমিতা বললে, সেই জায়গাটা খুঁজছি।

—কোন্ জায়গাটা?

—অমিতা মুখুয্যে যেখানে মারা গেল। কথাটা বুঝতেই সুরেশ্বরের এক মিনিট গেল। এক ঝলক কালো রক্ত মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

বললে, সে কি আর মনে আছে?

ব্যগ্রভাবে অমিতা বললে, আমার মনে আছে। সে জায়গার প্রত্যেকটি বিন্দু আমার মনে গাঁথা আছে। দেখতে পেলেই চিনতে পারি।

কিন্তু চেনা দূরের কথা কিছুই যে দ্বিতীয়বার দেখা যায় না অমিতা

মুখুয্যেকে সে কথা বোঝায় কে ?

স্থরেশ্বর দারুভূত। ছেলেটি অপরিচিত মহানগরীতে এসে হতভম্ব। তাড়া দিলে কুলীরা :

—চলিয়ে না। কেৎনা ঘড়ি খাড়া রহেগা ?

হ্যাঁ দাঁড়িয়ে থাকার যো নেই। চলতে হবে। ওরাও নিঃশব্দে চলতে লাগল।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

তাজমহল

তখনও দিল্লীর আকাশে শীতের কুহেলী। ছেঁড়া মেঘের মতন কুয়াশার বাষ্প গাছপালার বুকে ঝুলছে। চীৎকারে সাদিকের ঘুম ভেঙে গেল। শহরের প্রান্তে যমুনার ধারে জীর্ণ কুটির। সে কুটির যে-মেরামতে প্রায় মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ছে।

ভোরের দিকেই ঘুমটা গাঢ় হয়। আগাগোড়া কম্বল চাপা দিয়ে সাদিক গাঢ় ঘুমে অচেতন। মনে হল বাইরে যেন অশ্বখুরের শব্দ।



এপথে সৈন্যসামন্ত বিশেষ চলে না। মাঝে মঝে রাখালরা গরুর পাল নিয়ে আসে। যমুনার তীরে সবুজ ঘাসের লোভে।

কে যেন ভারি গলায় ডাকল।

'মহম্মদ সাদিক' সাদিক! সাদিক উঠে পড়ল। তার নাম ধরে কে আবার ডাকছে। উঠে দেখল পাশের বিছানায় জাহিরা ঘুমাচ্ছে। সাদিকের বিবি জাহিরা। সারাটা রাত জ্বরের ঘোরে ছটফট করেছে। হেকিমের দাওয়াই কোন কাজ দেয়নি। এখন পীরের দরগা থেকে সাদিক জলপড়া নিয়ে আসছে। তাতেও বিশেষ

উপশমের লক্ষণ নেই। সাদিক সাবধানে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। ভোরের অস্পষ্টতায় প্রথমে কিছু দেখতে পেল না, তারপর চোখ একটু অভ্যস্ত হয়ে যেতে দেখল, সামনের তেঁতুল গাছে একটা ঘোড়া বাঁধা। তার পাশে একজন জোয়ান সৈনিক। সাদিকের বুকটা কেঁপে উঠল।

শাহজাহানের রাজত্ব। মোঘল সম্রাটদের রাজত্বের কোন স্থিরতা নেই। পাশার দানের মতন রাতারাতি সিংহাসনের অধিকারী পালটায়। তারপর অত্যাচারের বন্যা বয়ে যায়। রাজধানীতে রক্তের ঢেউ। তখন যে যাকে পারে বন্দী করে। পুরনো আক্রোশ ফণা তোলে। মহম্মদ সাদিক ?

সৈনিক প্রশ্ন করল। হ্যাঁ হুজুর। সাদিক সবিনয় উত্তর করল। তৈরি হয়ে নাও, আগ্রা যেতে হবে। সাদিক শুধু বিস্মিতই নয়, কিছু পরিমাণে শঙ্কিতও। আগ্রা ? সেখানে কেন হুজুর ? বাদশাহের হুকুম।

এরপর আর কথা চলে না। এদেশে প্রতিবাদের রেওয়াজ নেই।

আমার হাতে বেশি সময় নেই। একটু তাড়াতাড়ি নেবে। সৈনিক আরো গম্ভীর গলায় বলল।

দ্বিরুক্তি না করে সাদিক কুটিরে ফিরে এল।

ইতিমধ্যে জাহিরা উঠে পড়েছে। বোধ হয় দরজার ফাঁক দিয়ে সৈনিককে দেখেছে। তার কথাবার্তা শুনেছে। বিষণ্ণ, নিস্তেজকণ্ঠে বলল, আগ্রায় যেতে হবে কেন ?

জামাকাপড় বোঁচকায় বাঁধতে বাঁধতে সাদিক উত্তর দিল. খোদা মালুম।

জাহিরা এবার এগিয়ে এল। সাদিকের একটা হাত ঝাপটে ধরে আকুল গলায় বলল, বল না গো, তোমাকে আগ্রায় নিয়ে যাচ্ছে কেন ?

জানি না জাহিরা। এরা শুধু হুকুম তামিল করে, তার বেশী একটা কথাও বলে না। তবে একটা কথা জানি জীবনে কোন অন্যায় করিনি। খোদাতাল্লার কাছে কিছুই গোপন নেই।

আমি কি করে খবর পাব ?

যদি সুযোগ পাই কাউকে দিয়ে খবর পাঠাব।

কি, কত দেরী। বাহির থেকে সৈনিক তাগদা দিল। হয়ে গেছে।

বোঁচকা পিঠে সাদিক নাগরাজুটো পায়ে গলিয়ে নিল।

ধূলি ধূসর পথ। দুপাশে নিবিড় জঙ্গল। টিলা।

ঘোড়ার ওপর সৈনিকের পিছনে দু'দিকে দু পা ঝুলিয়ে সাদিক। শীতকাল তাই রক্ষা। সূর্যের তাপে দাহ নেই।

যেতে যেতে সাদিক ভাবতে লাগল।

জুম্মা মসজিদের পিছনে তার বড় শালার বাস। কাউকে সেখানে পাঠিয়ে জাহিরাকে নিজের কাছে নিয়ে আসবে, কিংবা নিজেই চলে যাবে তার কাছে।

বড় শালা কার্পেটের কাজ করে। কাজ মানে ব্যবসা।

পারস্য থেকে ঘোড়ার পিঠে, উটের পিঠে বণিকরা কার্পেট নিয়ে আসে। যারা খানদানিবণিক তারা সোজা বাদশাহের দরবারে চলে যায়। সেখানে কেনাবেচা করে। আর যারা সাধারণ তারা দিল্লীর হাটে বাজারে আসর জমায়। কেনাবেচা করে।

কিছুটা পথ গিয়ে সাদিক একবার চেষ্টা করল।

হুজুর, একটা কথা।

সৈনিক বোধ হয় সদয় ছিল। সাদিককে খুঁজে পাকড়ে নিয়ে যেতে পেরেছে সেই জন্যই হয়তো।

মোলায়েম কণ্ঠে উত্তর দিল, কি কথা ?

সাদিক বারদুয়েক ঢোঁক গিলল, তারপর বলল।

হুজুর জাঁহাপনার বিশেষ পেয়ারের লোক, তা বুঝতেই পারছি। আমাকে কেন তলব দেওয়া হয়েছে, সেটা জানতে চাই।

কিছুক্ষণ কোন কথাবার্তা নয়। আরও দ্রুত ঘোড়া ছুটল।

তারপর সাদিক যখন ভাবল সৈনিক কোন উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়, তখন আচমকা ঘোড়া থামল।

ছোট টিলা নীচে জঙ্গল।

ঘোড়া থেকে সৈনিক নেমে সাদিককে হুকুম করল। নামো।

সাদিক নামল। বেশ ভয়ে ভয়েই।

ভাবল এইবার বোধ হয় এই নির্জন পরিবেশে তাকে দাঁড় করিয়ে, কোমর থেকে তলোয়ার বের করে সৈনিক তাকে এক কোপে কোতল করবে।

কিন্তু তার অপরাধ কি!

না, সে সব কিছু নয়। ঘোড়ার পিঠ থেকে একটা বোঁচকা নামাল। তার মধ্যে বেশ কিছু রুটি আর কষা মাংস। মশকে জল।

আহার্য ছু ভাগ করে, এক ভাগ সাদিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে সৈনিক বলল, নাও নাস্তা কর।

পেটে খিদে ছিল তবে নাস্তা করার মতন মন সাদিকের ছিল না।

কিন্তু নিরুপায়, সৈনিকের কথা মেনে চলতেই হবে। খেতে খেতে সৈনিক বলল। তোমার ওপর শাহানশা একটা কাজের ভার দিয়েছেন। আমার ওপর?

বিস্ময়ে মুখ থেকে রুটি গোস্ত বেরিয়ে আসবার যোগাড়।

হ্যাঁ, ইমারত তৈরির কাজে তোমার নাম আছে, বিশেষ করে মশলা মেশানোর ব্যাপারে। সাদিক কিছু বলল না।

মনের পটে অনেকগুলো পুরানো বছরের কথা ভেসে এল।

কত বয়স তখন? বড় জোর দশ কি এগার। বাপজানের সঙ্গে কর্ণিক হাতে বেরিয়ে পড়ত।

মশলা মেশানোর কাজে সাদিকের বাপ আসগরের অপরিসীম দক্ষতা ছিল। গাঁথুনি হত বজ্রের সামিল। ঝড় বজ্রাঘাত, আক্রমণ উপেক্ষা করে অটল থাকত। আসগর ছেলেকে নিজের হাতে মশলা মেশানোর বিদ্যা শিখিয়েছিল।

মরবার সময় বলে গিয়েছিল, খবরদার, কম টাকায় কাজ করতে রাজী হস নি, তাতে কাজ হয়তো অনেক পাবি, কিন্তু ইজ্জত যাবে। মানুষের ইজ্জতই সব। সেই থেকে সাধিক ছোট খা

কাজ হাতে নেয় নি।

ফলে কাজের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। দু একটা কবর তৈরী, কিংবা এ ধারে ও ধারে মেরামত, ব্যস।

বন্ধুরা অনেক বুঝিয়েছে। দিন কাল খারাপ সব রকম কাজ হাতে নাও সাদিক, নাহলে যে না খেয়ে মরবে।

সাদিক শোনে নি। শাহানশা কি আগ্রায় ইমারত তৈরী করছেন?

সাদিকের অজ্ঞতায় সৈনিক বিস্মিত।

বলল, বেওয়াকুফ কোথাকার। শোন নি শাহানশার বেগম মমতাজের এন্তেকাল হয়েছে। শাহানশার ইচ্ছা তাঁর কবরের ওপর বিরাট এক স্মৃতিসৌধ তৈরী করাবেন। দেশ বিদেশ থেকে কারিগর, লাল পাথর, সাদা পাথর, এসেছে। এদেশের রাজা, রহিস আদমিদের যার যা সাধ্য দিচ্ছে। রাজকোষ খুলে দেওয়া হয়েছে। খরচের মা বাপ নেই।

খাওয়া ভুলে সাদিক শুনতে লাগল। এলাহি কাণ্ড।

এমন একটা বিরাট ব্যাপারে তার ডাক পড়েছে।

সিরাজুল হক এসেছেন পারশ্য থেকে। তিনি মশলা মেশাবার একজন যোগ্য লোক খুঁজছেন। কে একজন তোমার নাম বলেছিল। নাম বললে হবে কি, পাত্তা দিতে পারে নি।

তিন দিন ধরে সারা দিল্লী তোলপাড় করে ফেলেছি। আমি বলেই ঠিক খুঁজে পেয়েছি তোমাকে।

সৈনিক আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন। ততক্ষণে সাদিকের নাস্তা শেষ। জল খেয়ে উঠে দাঁড়াল। নাও, ওঠ, তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। সৈনিক লাফিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে উঠল। তার পিছনে সাদিক। দীর্ঘ পথ মাঝে মাঝে ধুলোর আবরণে পথের রেখা বিলুপ্ত। দিক্ ভুল হয়ে যায়। সৈনিক থেমে কি চিন্তা করে, তারপর আবার অশ্ব ছোটায়। রাতটা এক মুসাফের খানায় কাটিয়ে পরের দিন সকালে আগ্রা। সাদিক এর আগে, আর আগ্রা আসে নি।

রুক্ষ শহর। অনেকদূর থেকে আগ্রার কেল্লা চোখে পড়ে।

এখানে সৈনিক সাদিককে আর একজন সৈনিকের হাতে তুলে দিল।

এই যে মহম্মদ সাদিক। মশলা মেশানোর যাদুকর। একে সিরাজুল হকের জিম্মা করে দাও।

এবার আর অশ্ব পৃষ্ঠে নয়, উটের ওপর।

একটু গিয়েই সাদিক চমকে উঠল।

সারি সারি উটের গাড়ী, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী। কোনটায় রং বেরংয়ের পাথর, কোনটায় রঙীন কাঁচের টুকরো, কোনটায় অন্য মালমশলা।

বেশ কিছুটা যাবার পর উট থামল।

উট হাঁটু মুড়ে বসতে প্রথমে সৈনিক, তারপর সাদিক লাফ দিয়ে নামল। নেমে সাদিক যা দেখল, তাতে তার অনেকক্ষণ চোখের পালক পড়ল না।

সার সার অগণিত কালো মাথা। হিন্দুস্থানের কোন প্রদেশের লোক আর বাকি নেই।

কেউ মাটি কাটছে, কেউ ঝুড়িতে সেই মাটি বোঝাই করে নিয়ে চলেছে, কেউ কেউ গাছের ছায়ায় গোল হয়ে বসে পাথর ভাঙছে।

লাল চাপ দাড়ি, মাথায় কাত করে বসানো টুপি বলিষ্ঠ চেহারা। সিরাজুল হক। তার সঙ্গে সাদিকের কথাবার্তা হল দরদস্তুর। আর দিন পনেরর মধ্যে মশলা মেশানোর কাজ শুরু হবে। ততদিন সাদিকের ছুটি। সে অতিথিশালায় থাকবে, মুফত খানাপিনা মিলবে। কোন অসুবিধা হবে না। পনের দিন নয়, কাজ শুরু হল পঁচিশ দিন পর।

তারপর আর নিশ্বাস ফেলার সময় রহিল না। শাহানশা সাজাহানের পরিবার মমতাজের এন্তেকাল হয়েছিল দাক্ষিণাত্যে। সেখানেই কবর দেওয়া হয়েছিল। তারপর কবর থেকে তার দেহ তুলে নিয়ে এখানে এনে রাখা হয়েছিল মানসিংহের বাগানে। কথা হয়েছিল, আগ্রায় উপযুক্ত জমি পেলে দেহাবশেষ সেখানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু শেষকালে এর চেয়ে ভাল জমির সন্ধান আর

পাওয়া যায় নি। যমুনারকূলে তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড শাহানশার খুব মনে লেগেছিল। হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল চির বিরামের পক্ষে এমন শান্তিপূর্ণ এলাকা পাওয়া বিরল। মানসিংহ সেটা বুঝেছিল। বুঝেছিল, জায়গাটা যখন শাহানশার পচ্ছন্দ তখন এ জায়গা তাকে ছাড়তেই হবে। ভাল ভাবে ছেড়ে দেওয়াই শোভন। সাদিকের দিল্লীতে টাকা পাঠাবার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল। জিনিসপত্র আনবার জন্য মাসে হুবার লোক দিল্লী যেত তাদের হাতে সাদিক বড় শালার নামে টাকা পাঠিয়ে দিত। যাতে পরিবারের খানাপিনা দাওয়াই-এর কোন অসুবিধা না হয়। সে দলের সর্দার মোতালেক আমেদ, সে সব খবরও নিয়ে আসত সাদিক, তোমার পরিবার ভালই আছে হে। হাতে টাকা পেয়ে খুব খুশী। তোমাকে সাবধানে থাকতে বলেছে। সাদিকও উল্লাসিত। নিজের জন্য সামান্য হাতে রেখে বেশীর ভাগ টাকাই দিল্লীতে পাঠিয়ে দিত। মাঝে মাঝে শুধু অন্ধকার রাতে এলোমেল হাওয়ায় আশেপাশের গাছপালায় কাঁপন জেগে উঠলে সাদিক ঘুম ভেঙে বিছানার ওপর উঠে বসত। অনেক দূর ফেলে আসা দিল্লীর এক ঝুপড়ির কথা মনে পড়ে যেত। মলিন শয্যার পাশে পাণ্ডুর একটি মুখ। সাদিকের একমাত্র আশা সে মুখ এখন আর পাণ্ডুর নেই, লাবণ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মানুষের জীবনে দারিদ্র্য কঠিনতম ব্যাধি। খোদার দোয়ায় এখন সাদিকের অর্থকৃচ্ছতা কেটে গেছে। শাহানশা শাজাহান পত্নীর স্মৃতিসৌধ তৈরির ব্যাপারে মুঠো মুঠো আশরফি ছড়াচ্ছেন, আর সাদিকের মতন মানুষেরা পরিশ্রমের বিনিময়ে সে মুদ্রা কুড়িয়ে নিচ্ছে।

একমাত্র অসুবিধা ছুটি নেই। শাহানশার হুকুম, মানুষের জীবনের কথা কিছু বলা যায় না, পদ্মপত্রে জল, কাজেই স্মৃতিসৌধের কাজ যত দ্রুত সম্ভব শেষ করা চাই।

সেইজন্য মিস্ত্রি, মজুর, কারিগর, স্মৃতিসৌধের সঙ্গে যারাই যুক্ত তারা কোন ছুটি পাবে না। কোন কারণে নয়। একটা বড় এলাকা

জুড়ে এদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। জায়গাটার নাম তাজগঞ্জ। এক বছর, দু বছর, তিন বছর ঘুরে গেল। কাজ পুরো দমে চলেছে। কবে শেষ হবে কে জানে। সাদিক লেখাপড়া জানে না। জাহিরাও নয়। দুজনে যে দুজনকে খত লিখে মনের কথা জানাবে সে পথও বন্ধ।

সবটুকুই লোকের মুখে শুনতে হয়। মোতালেক আমেদকে সাদিক কতবার জিজ্ঞাসা করেছে। মোতালেক ভাই, জাহিরাকে দেখলে? জাহিরা? জাহিরা কে? লজ্জা পেয়ে চাপা গলায় সাদিক বলেছে, আমার পরিবার।

তোবা, তোবা, পরিবার ছেড়ে এসে তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? মুসলমানের পরিবার চন্দ্র সূর্য দেখে না, পরপুরুষ দেখবে কি?

না, মানে ভাল আছ তো। বোরখা পরা অবস্থায় দেখতে পাও? ইনশা আল্লা, ইবলিশের মতন কি আমার নজর যে আনাচে কানাচে দেখব? তোমার বড় শালার কাছে টাকাগুলো দিই, সুগন্ধি পান দেয় খাই, চলে আসি, বাস। সাদিক আর কিছু বলে না। বলার মতন নেইও কিছু। নিজের কারোর জায়গায় ফিরে আসে। স্মৃতিসৌধ তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের জমিরও সাজসজ্জা শুরু হয়। দেশ বিদেশ থেকে ফল ফুলের চারা আসে। দুনিয়ায় যত রকমের ফুলের গাছ আছে সাদিকের জানাই ছিল না। একশোর ওপর মালি। মাটি গুঁড়িয়ে, সার মিশিয়ে গাছ গাছড়ার তদারক চলে।

মমতাজ যাঁর স্মৃতি কেন্দ্র করে এই সৌধ, তাঁর কথা লোকের মুখে মুখে চালু হয়েছে।

সাদিকও শুনে শুনে শিখেছে। বেগমের আসল নাম আর্জুমান বানু। পারস্যের মেয়ে। জাঁহাপনার দ্বিতীয় বেগম হলে হবে কি, রূপ গুণ বুদ্ধির জন্য তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্রী হয়েছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে খান জাহান লোদীর বিদ্রোহ দমন করার জন্য শাহাজাহান যখন রওনা হয়েছিলেন মমতাজ তাঁর সঙ্গ ছাড়েন নি।

সেই যাওয়াই কাল হয়েছিল।

সেখানে একটি কন্যার জন্ম দিয়ে সেই যে শরীর বিকল হ'ল সে শরীর আর সারল না। চল্লিশও পূর্ণ হয় নি, মমতাজ চলে গেলেন। শাজাহান একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। রাত দিন কেবল কান্না সম্বল। রাজ্যে সব রকম আনন্দ উৎসব বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

প্রতি জুম্মার দিন স্মৃতিসৌধের কাছ থেকে সবাইকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ত। ধারে কাছে কেউ থাকতে পেত না। শাজাহান পায়ে হেঁটে মমতাজের কবরের কাছে আসতেন। ফতিহা পড়তেন।

অনেক দূর থেকে সাদিক দেখেছে। রক্তগোলাপের মতন গায়ের রং, কুঞ্চিত কেশ, চাপ দাড়ি, কেবল বিষাদময় দুটি চোখ, চোখের নীচে কালো রেখা।

কতদিন সাদিকের মনে হয়েছে, শাজাহান যখন ফিরে যান, তখন ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে আছড়ে পড়বে।

বলবে, খুদাবন্দ দয়া করে এক হপ্তার ছুটি দিন, জাহিরাকে একবার দেখে আসব। স্ত্রীর ওপর অকৃত্রিম প্রেম, শাজাহান অপরের পত্নীপ্রেম সম্বন্ধে নিশ্চয় ওয়াকিবহাল। সাদিকের কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করবেন না। কিন্তু ওই শুধু চিন্তা।

সাদিক ভালই জানে, জাঁহাপনার কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই, তাঁর দেহরক্ষীরা সাদিককে ধরে ফেলবে।

তারপর টানতে টানতে শ্মশানে নিয়ে যাবে। পিছমোড়া করে বেঁধে সৈনিকের ইংগিতের অপেক্ষায় ফেলে রাখবে। এক সময়ে ঘাতকের তীক্ষ্ণ অসিতে সব আশা, আশ্বাস, দাম্পত্য প্রীতির সমাধি।

সাত বছর কাটল। শাহানশা তাগাদা দিলেন, শেষ কর, শেষ কর। মানুষের জীবন সীমিত পরমায়ু, বেগমের সমাধি সৌধ তিনি সম্পূর্ণ দেখে যেতে যান। মমতাজ চলে যাবার পর তাঁর আর এ দুনিয়া ভাল লাগছে না। তিনি মমতাজের অনুযাত্রী হতে চান। এই সময় মোতালেক আমেন এক দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এল।

খারাপ খবর আছে সাদিক ভাই। সাদিক কাজের তদারক করছিল। ক্রমেই সৌধ আকাশচুম্বী হচ্ছে। কাঠ আর বাঁশের

ভারা বাঁধা।

সাদিক ভারা বেয়ে নেমে এসেছিল। খারাপ খবর? জাহিরা ভাল আছে তো? হাঁা, তোমার পরিবার বহাল তবিয়তেই আছে। তোমার বড় শালা আর নেই? নেই? কি হয়েছিল?

কার্পেট বুনত কার্পেটের ছুঁচ হাতে ফুটে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। তা থেকে জ্বর। হেকিমরা সুবিধা করতে পারল না, আর বয়সও তো হয়েছিল।

তা হয়েছিল, কিন্তু তাহলে জাহিরা আছে কোথায়? 'ভাবনার কিছু কিছু নেই সাদিক ভাই'। তোমার ছোট শালা মীরাট থেকে এসে গেছে। সেই দেখাশোনা করে।

ছোট শালা মানে আফজল। মীরাটে এক হিন্দু সেরেস্তাদারের কাছে কাজ করে। অফজল ছোকরা মোটেই সুবিধার নয়। একবার টাকা পয়সার ব্যাপারে গোলমাল করেছিল। তাই নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়েছিল।

এক জায়গায় এক মাসের বেশী চাকরী করার বাচ্চা নয়। যাক, মনে হয় বোনকে ফেলবে না। মোতালেক সাদিকের পিঠ চাপড়ান। ঘাবড়াও মৎ। আমি মাসে মাসে ঠিক খবর এনে দেব। সাদিক কিছু না বলে আবার ভারায় উঠল। চোখের জলে সামনের অর্ধসমাপ্ত স্মৃতিসৌধ অস্পষ্ট হয়ে গেল।

এক সময়ে স্মৃতিসৌধ শেষ হ'ল। কত সময় লাগল। সাদিকের মনে হ'ল অনন্তকাল। হিসাব করে দেখলে প্রায় সাড়ে বারো বছর। স্মৃতিসৌধের চার পাশে কাঠের ভারা। সবাই বললসেই ভারা খুলতেই পুরো এক বছর সময় লেগে যাবে। শাজাহান আর অপেক্ষা করতে নারাজ। সামনের জুম্মার দিন তিনি মমতাজের কবরের ওপর চেরাগ জ্বালাতে চান। যেমন করে হোক তার ব্যবস্থা করা হ'ক। চতুর মন্ত্রী গিয়াসুদ্দিন ব্যবস্থা করে দিল। আশপাশের গাঁয়ে আগ্রা শহরে ঢোল পেটানো হ'ল। যার খুশী এই ভারার কাঠ বাঁশ খুলে নিয়ে নিজেদের কাজে লাগাতে পারে। বন্যার স্রোতের মতন গ্রামবাসীরা

এসে হাজির। ঘণ্টা কয়েকের ভিতর ভারার বাঁশ কাঠ উধাও। জুম্মার দিন বিরাট ফটক তৈরী হল। ফটকের ওপর নহবতখানা। করুণ সুরে শানাই শুরু হ'ল। শাহানশা শাজাহান যিনি সারা হিন্দুস্থানের মালেক দানপরবর, তিনি পায়ে হেঁটে তাজমহলে এসে দাঁড়ালেন।

ছুটি চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। আরক্ত গণ্ড। পথে আসবার সময় দুহাতে আশরফি ছড়াতে ছড়াতে এসেছেন। অনেকক্ষণ ধরে মোনাজাত শুরু হয়েছিল।

মমতাজের অন্তিম প্রার্থনা শাজাহান পূর্ণ করেছেন। তাজমহল যেন স্ফটিক আধারে রাখা শাহানশার অশ্রু। এরপর বিদায়ের পালা যা প্রাপ্য সব মিটিয়ে দিয়ে শাহানশার আদেশে মিস্ত্রী মজুর কারিগর সবাইকে পুরো ছয় মাসের তলব দেওয়া হল।

সবাই হাত তুলে জাহাপনার জয়ধ্বনি করল। যে দল দিল্লী ফিরে যাবে সাদিক সেই দলে ভিড়ে গেল। একলা যাওয়া নিরাপদ নয়। সকলেরই সঙ্গে বেশ কিছু টাকা। সাদিক একটা ঘোড়া ভাড়া করে তার পিঠে, উঠে বসল। সবাই মাঝে মাঝে ছায়া দেখে সেখানে বিশ্রাম করতে থামল, কিন্তু সাদিক এক তিল সময় নষ্ট করতে নারাজ। যখন আগ্রা গিয়েছিল, তখন তার বয়স ত্রিশ, এখন বয়স বিয়াল্লিশ ছাড়িয়েছে। তবে এখন চেকনাই হয়েছে শরীরের। খাটুনি ছিল বটে, কিন্তু সেই অনুপাতে খাওয়া দাওয়া ভাল ছিল। তাজগঞ্জে সকলেই বেশ তোয়াজে থাকে। অবশেষে দিল্লী পৌঁছাল। সাদিক একেবারে জুম্মা মসজিদের সামনে নামল। প্রায় ছুটে সামনে দাঁড়াল। আফজল অফজল। কোন সাড়া নেই। জাহিরা, আমি সাদিক এসেছি। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর লোলচর্ম এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। কাকে চাই? আফজল আছে এখানে? অফজল, সে কে? সাদিক একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। একটু ভেবে নিয়ে বলল, সোলেমান সায়েব ছিল এখানে? ছিল কিন্তু কবে ফৌত হয়ে গেছে। আর তার বোন জাহিরা? তাকেও তো বছর তিনেক খোদা ডেকে

নিয়েছেন। সে কি?

সাদিকের পক্ষে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হয় নি। মাটির ওপর বসে পড়ল। হতভাগী ছড়িয়েছে, 'তার মরদ আগ্রায় কাজ করতে গিয়ে একটা নিকে করেছে। একটি কাণা কড়ি একে পাঠাত না। একজন দয়ালু লোক, আগ্রা থেকে মাঝে মাঝে এসে খবর নিত। সামান্য টাকা কড়িও দিত, কিন্তু ইদানীং সেও আর আসত না।'

সাদিক অনুভব করতে পারল তার শরীরের মধ্যে একটা বিপর্যয় শুরু হয়েছে। প্রচণ্ড দুঃখবোধ গলার কাছে কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠেছে। মোতালেক আমেদ নাগালের মধ্যে থাকলে কি হ'ত বলা যায় না। কান্নাভেজা গলায় সাদিক জিজ্ঞাসা করল। জাহিরাকে মাটি দেওয়া হয়েছে কোথায়?

কোথায় আর হবে, বাড়ীর 'উঠানে' দেখবে এস। কম্পমান দীপশিখা অনুসরণ করে সাদিক পিছন দিকে চলল। জীর্ণ কুঁড়ে ঘর পার হয়ে ছোট একটা উঠানে দাঁড়াল। উচু নীচু জমি। শিয়াল কাঁটা আর বুনো গাছের ঝোপ। একপাশে কিছু মাটির স্তূপ। এই জাহিরার কবর। কিছু বলা যায় না, কিছুদিন পর কুকুরের দল মাটি খুঁড়ে শব টেনে বের করবে, তারপর নিজেদের মধ্যে গলিত মাংস ভাগ করে নেবে। সাদিক কবরের সামনে নতজানু হয়ে বসল। ভাই সাহেব পয়সা দিচ্ছি আমার জন্য একটা চেরাগ এনে দিতে পার। চেরাগ এনে সাদিক কবরের সামনে সেটা জ্বালিয়ে দিল। দু হাত যোড় করে চোখ বুঝতেই চোখের সামনে তাজমহলের ঝলমলে রূপ ভেসে উঠল।

সাদিক মশলা বানাবার যাদুকর নিজের কর্ম্মকুশলতা প্রয়োগ করে তাজমহল নির্ম্মানে সহায়তা করেছে, যে তাজমহল পত্নী প্রেমের জ্বলন্ত প্রতীক, আর তার নিজের স্ত্রীর কবরের এই নমুনা। সাদিকের গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। এ জল শাজাহানের অশ্রুর চেয়েও আরও পবিত্র, আরও মহান। হাত দিয়ে সাদিক নরম মাটির তাল টেনে উঁচু করার চেষ্টা করল। স্মৃতিসৌধ গড়ার নিস্ফল প্রয়াসে।

আশাপূর্ণা দেবী

এক কাঁটা সোজা, এক কাঁটা উল্টো

হ্যাঁচ্‌কা টান মেরে গলা থেকে মুক্তোর কণ্ঠীটা খুলে ফেলল বিপাশা, হাত থেকে টান মেরে মেরে খুললো মুক্তোর চুড়ি, জড়োয়া বালা। প্রায় আছড়ে আছড়ে ছুঁড়ে ফেলার মত করে রেখে দিলো জোড়া খাটের পাতা বিছানাটার উপর।

যেন মুক্তোগুলো গাঁথুনি থেকে ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ে গেলেও কিছু এসে যাবেনা বিপাশার। দামী পাথরগুলো সেট থেকে খসে



হারিয়ে গেলেও না। ওগুলো থেকে মুক্ত হওয়াই উদ্দেশ্য শুধু।

মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে হাত দুখানা বিধবার মত খালি হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি যে ড্রয়ার থেকে খুলে রাখা সোনার চুড়িগুলো পরবার কথা, মনে আনলনা সে কথা। পরণের দামী বেনারসী খানাও নির্মম অবহেলায় খুলে ফেলে খাটের বাজুর উপর রাখলো অগোছালো করে, মাটিতে লুটোতে লাগলো খানিকটা, চেয়ে দেখল না।

ব্রোকেডের ব্লাউসটাকে গা থেকে হিঁচড়ে খুলে ফেলে দিয়ে একখানা সুতি শাড়ী জড়িয়ে জানলার ধারে পাতা সোফাটায় বসে হাঁপাতে থাকলো।

গোড়া থেকেই হাঁপাচ্ছিল, মাত্রাটা বাড়লো। মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা ফেটে যাচ্ছে।

শুয়ে পড়বার জন্যে সমস্ত স্নায়ুশিরা যেন আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছে বিপাশার কাছে, কিন্তু বিপাশা ওদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করবে না। শুয়ে পড়বে না।

শুয়ে পড়লেই যেন খেলো হয়ে যাবে। যেন অসহায়তাটা ধরা পড়বে।

তাছাড়া—

ডানলোপিলোর গদি পাতা, সৌখিন বেডকভারে ঢাকা ওই রাজকীয় বিছানাটার দিকে তাকাতেও প্রবৃত্তি হচ্ছে না। ওইটাই তো বিপাশার পরাভবের চিহ্ন। ওইটাই তো বিপাশার জীবনের গ্লানির আর বঞ্চনার স্বাক্ষর।

বহুবার বহু কলঙ্কিত ঘটনাকে উপলক্ষ করে ওই জোড়া খাটের বিছানাকে ত্যাগ করবার প্রতিজ্ঞা করেছে বিপাশা, বারে বারেই ভাঙতে হয়েছে। ভাঙতে হয়েছে শঙ্করের নির্লজ্জ কাকুতিতে। মমতার বশেই বলা যায়।

কিন্তু বিপাশার জন্যে কোথাও কোনোখানে সঞ্চিত নেই মমতার বট। বিপাশার ইচ্ছেকে সম্মান দেবার অথবা প্রাধান্য দেবার বিন্দুমাত্র দায় নেই কারো!

ঘরের মাঝখানে জোড়া খাঠের মত বিছানা, বিপাশার দু চক্ষের বিষ, বহুবার বলেছে শাশঙ্ককে, যাচ্ছে তাই! কুদৃশ্য একটা শোবার ঘরে কেউ এসে বসলে লজ্জা করে। সভ্যতার বালাই মাত্র নেই। দু' দেওয়ালে দু'খানা খাট থাকবে তা' নয়। অসহ্য!'

চাকরদের দিয়ে সরাবার প্রস্তাব করে, শশাঙ্ক হাঁ হাঁ করে বাধা দেয়। বলে 'আমারও অসহ্য স্বামী স্ত্রীর ঘরে ওই 'দু' দেওয়ালের'

দৃশ্যটা! দেখলেই মনে হয় মাঝখানের ওই ফাঁকা জমিটার মত বুকটাও ওদের ফাঁকা হয়ে গেছে। যেন দু'জনের হৃদয়ের মাঝখানে অমনি শূন্যতার ব্যবধান।'

কেবল লম্বা-চওড়া কথা!

যেন কত প্রেমময় স্বামী!

নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী ঠগ জোচ্চোর!

আজ তার ঠকানি শেষ করছে বিপাশা।

সেই নিশ্চয়। শেষ করার দৃশ্যটা কল্পনা করতে লাগলো। আজ আর উত্তেজিত হবে না বিপাশা, শান্ত স্থির ভাবে বুঝিয়ে দেবে শশাঙ্ককে একটা অবাস্তব অবস্থাকে চিরদিন টিকিয়ে রাখা যায় না।

অতএব আরোপিত একটা সম্পর্কের শৃঙ্খল শেষ হোক।

অনেকবারই বলেছে। শশাঙ্কই বলিয়েছে।

তবু বিপাশা আবার একটা মধুর মিথ্যার ছলনার কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে। পরম অবিশ্বাসী একটা ইতর ছোটলোককে আবার বিশ্বাস করেছে। ভয়ঙ্কর আপমানের জ্বালাটাকে বাতাসে উড়ে আসা ধূলোর মত গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করেছে।

শেষ হোক তার, শেষ হোক!

তা' দোষ বিপাশারও।

অনমনীয় হবার ক্ষমতা তার নেই। তাই প্রশ্রয় পেয়েছে শশাঙ্ক। পেয়ে পেয়ে মাথায় চড়েছে।

কিন্তু কেন প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয় সে জ্ঞান কি শশাঙ্কর আছে? শশাঙ্ক ভাবে ওর প্রতি মমতা!

না, না সবটাই মমতা নয়।

হয়তো কিছুটা আছে, হয়তো অনেকটাই নেই প্রশ্রয় দেয় বিপাশা নিজের প্রতি মমতায়, নিজেকে সামাজে প্রতিষ্ঠিত রাখতে, নিজের মান সম্ভ্রম বজায় রাখতে।

লোকে পাছে শশাঙ্কর নির্লজ্জতাকে গুরুত্ব দেখায়, তাই বিপাশা সেটার ওজন হালকা করে দেয় জাহির করে। লোকে পাছে

বিপাশার আড়ালে বিপাশার স্বামীকে নিয়ে আলোচনা করে, বিপাশাই তাই সকলের সামনে বসে কড়া কড়া সমালোচনা করে তার স্বামীর।

শশাঙ্কর বন্ধুদের বলে, 'দেখবেন স্ত্রীটিকে সাবধান! বেড়ালের কাছে যেমন মাছ, আপনাদের এই বন্ধুটির কাছে তেমনি সুন্দরী নারী, বুঝলেন?'

নিজের বান্ধবীদের বলে, 'ওকে ডাকছিস বাড়িতে? কাঙালিকে শাকের ক্ষেত দেখাচ্ছিস? বাড়িতে ডেকে আপ্যায়িত করতে আর লোক পেলি না? দরজা একবার খোলা পেলে, আর সে দরজা ছাড়বে ও? উঠোন থেকে উঠে ঠাকুর ঘরে উঁকি মারবে! সামলাতে সামলাতে গেলাম!

ভাবতে পারা যেত এসব বিপাশার একটু সৌখিন লীলা, কিন্তু ভাবতে পারা যায় না। কারণ শশাঙ্ক যখন তখনই এই সব অপবাদের সত্যতা প্রমাণ করে ছাড়ে।

সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলে তার ধারে কাছে বেড়ালের মতই উঁকি ঝুঁকি মেরে বেড়ায়, কারো বাড়িতে যাওয়া আসার পথ খোলা পেলে জীবন মহানিশা করে ছাড়ে তাদের, কেবল কেবল যাবে, গাদা-গাদা উপহার দেবে, সিনেমায় যাবার অফার করবে, মার্কেটিঙের সঙ্গী হবার জন্যে ঝুলোঝুলি করবে, গাড়ীতে 'লিফট' দেবার জন্যে ভদ্রতায় ভেঙে পড়বে, এবং শেষ অবধি একটা বেসামাল কাণ্ড ঘটিয়ে মান হারাবে, স্থান হারাবে।

ওই পর্যন্তই অবশ্য। তার বেশী নয়।

কারণ শশাঙ্ক টাকার মানুষ। অতএব তার অনেক খুন মাপ!

শশাঙ্ক যদি কাঞ্চন কৌলিন্যে কুলিন না হতো, নিশ্চয়ই এতদিনে বন্ধু সমাজ থেকে বেত খেয়ে বিতাড়িত হতে হতো তাকে। কিন্তু ওই কৌলিন্যের কবচের জোরেই রক্ষা পেয়ে আসছে।

ওর ধাষ্টামোটা বাঁদরামী বলে গণ্য হচ্ছে।

কারণ যদি কোনো পার্টির সমারোহের সুযোগে, অথবা কোনো

অসতর্ক মুহূর্ত্তের চকিত অবসরের সুযোগে, বন্ধুজায়া কি বন্ধু ভগ্নীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে, তো বেহায়া লোকটা তারপরই আবার ছ্যাবলা হাসি হেসে মাপ চাইতে যায়। হয়তো বা এক গাদা উপহারই নিয়ে যায়।

এবং সে উপহার না নিতে চাইলে বলে, 'তার মানে ক্ষমা করছেন না, রাগ পুষে রাখছেন।'

পয়সাওলা বন্ধুকে এরপরও আর ক্ষমা না করার ক্ষমতা ক'জনের আছে?

তাছাড়া ওর হাসিটা আশ্চর্য! মনে হয় শিশুর হাসি!

অতএব আবার ওকে ডাক দেয় লোকে। আবার পার্টিতে আমন্ত্রণ পায় শশাঙ্ক বোস।

যেমন পেয়েছিল অবনী সেনের মেয়ের জন্মদিনের পার্টিতে। যেখান থেকে এই খানিক আগে একা চলে এসেছে বিপাশা। এসে হ্যাঁচকা টান মেরে মেরে উৎসব বাড়ির প্রসাধন সজ্জা অঙ্গ থেকে ছুঁড়ে ফেলেছে।

ফেলে, বসে বসে হাঁপাচ্ছে।

আজ আর শেষ পর্যন্ত মুখোস বজায় রাখতে পেরে ওঠেনি বিপাশা, আজ প্রায় মান মর্যাদা হারিয়ে উত্তেজিত হয়েই চলে এসেছে। যা সে আসে না কোনোদিন।

যতই যা করুক শশাঙ্ক, তার নামে যতই ব্যঙ্গ হাসির ঢেউ বহে যাক, বিপাশা ঠিক থাকে, বিপাশা ওদের সঙ্গেই যোগ দিয়ে বলে, 'জানি ঘটাবে একটা কিছু দুর্ঘটনা! ওকে আবার লোকে নেমন্তন্ন করে? বিশেষ করে যেখানে এত রূপের ছটা, রঙের ঘটা! ও তো এখন দিশেহারা হয়ে মরবে! .....

আর ফেরবার সময় গাড়ীতে চড়তে চড়তে বলে, 'আর যদি কেউ কোনোদিন এই লক্ষ্মীছাড়া লোকটাকে নিমন্ত্রণ করেন, নিজের দায়িত্বে করবেন।'

হেসে হেসে বলে।

তারপর গাড়ী ছেড়ে দিলে গুম হয়ে বসে থাকে। শশাঙ্ক গাড়ী চালাতে চালাতে মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, অপরাধীর মুখ করে বাড়ি ঢোকে, 'বেচারীব মুর্ত্তিতে বসে থাকে বোকার মত, এবং শেষ পর্যন্ত যখন বিপাশা তার মৌনতা ছেড়ে বলে ওঠে, 'এ প্রহসনের এবার শেষ হোক! এই সাবানের ফানুসের জীবন থেকে রেহাই নিতে চাই আমি—, তখন একেবারে অনুতাপে খান খান হয়।

পায়ে পড়ে, হাতে ধরে, নিজে হাতে নিজের কান মলে, 'আর কখনো নয়, এ জীবনে নয়' বলে, বলে শপকরে কান্নার বন্যা বহায়।

মনে হয় এবার বোধহয় সত্যি চৈতন্য হয়েছে। মনে হয় এর পরও কি সম্ভব?

অতএব এক সময় বিপাশাকে বলে বসতে হয় 'থাক যথেষ্ট হয়েছে!'

বাস! হয়ে গেল।

হতভাগা লোকটা মহোল্লাসে হয়তো বা টপ্ করে বলেই ফেলে বিপাশাকে, এবং শেষ পর্যন্ত হাসতেও হয় বিপাশাকে। বলতেও হয়, 'আচ্ছা দেখবো প্রতিজ্ঞা'।

এর আগে কিছুদিন রেখেছিল প্রতিজ্ঞা। নিজেই বলেছে, 'দেখো কী রকম গুডবয় হয়ে গেছি। আর 'মার্জ্জার বৃত্তির' পরিচয় দিয়েছি? বলো?'

কিন্তু আজ এই খানিক আগে হয়ে গেল চরম! অবনী সেনের মেয়ের জন্মদিনের পার্টিতে। যে অবনী সেনের বোন বিপাশার সহ পাঠিনী প্রাণের বান্ধবী।

প্রথমটা যথারীতি বিপাশা মুখোসটাকে এঁটেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নিজে থেকেই বলেছিল 'এই দেখ দেখ, কোথায় আবার গেল লোকটা! নির্ঘাৎ কোনো সুন্দরী মহিলার পিছু নিয়েছে!'...বলেছে, "দেখ আমার কিন্তু দোষ নেই, সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছি। এরপর যদি ও বেড়াল দুধের বাটীতে মুখ দেয়, কি মাছে থাবা বসায়, আমি জানিনা বাবা!'

হেসে গড়িয়ে গড়িয়ে বলেছে।

ওর বান্ধবী অলকাও হেসে হেসে বলেছে, তোর আবার বেশী ঢং! অত আর নয়। জানিস তোর থেকে সুন্দরী মহিলা দুর্লভ, তাই অত ব্যাখ্যা করছিস।

বিপাশা বলেছে, 'তাতে কি? ওর কাছে পরনারী বননারী।'

"যা ভাগ্, তোর ওসব আদিখ্যেতা।" বলেছে অলকা।

'তাই হলেই ভালো।' উদাসের ভান করেছে বিপাশা। তার পর ঝঙ্কার দিয়েছে, বিশ্বাস কর ভাই, ওই ভাবেই সামলে বেড়াতে হয় ওকে। চল্লিশের কাছে বয়েস হলো, এখনো হায়া নেই। জ্বলে পুড়ে মরছি ওর জন্যে।

বলে, সবই বলে, তবু যেন মনে হয় কৌতুক করেই বলছে। গুরুত্বহীন এই বলায় সবাই হেসে কুটি কুটি হয়। যেন নেমন্তন্ন বাড়ির ওটাও একটা 'এনটারটেনমেণ্ট।'

শশাঙ্ককেও ডেকে ডেকে ধমকের ভঙ্গী করে বলেছে বিপাশা কোথায় বেড়াচ্ছ শুনি? এই ঝাঁকে ঝাঁকে রূপসীর রাজ্যে শেষে বেভুল হয়ে হারিয়ে যাবে। যাবার সময় আর খুঁজে পাব না। বসে থাকো এইখানে চুপচাপ।

প্রশ্রয়।

প্রশ্রয় বৈ কি। প্রশ্রয়ই দিয়েছে বিপাশা।

প্রশ্রয়ের আর নতুন কি হাত পা আছে?

সেই প্রশ্রয়ের সাহসেই শশাঙ্ক দাঁত বার করে হেসে বলেছে, তোমার কথাটা কেমন হলো যেন, ফুল বাগান দেখতে এসেছ দেখো, খবরদার একটিও ফুলে হাত দিও না। সম্ভব সেটা, আচ্ছা এঁদেরই জিজ্ঞেস করো।'

'তা হলে বাড়ি চলে যাও।' লীলা ভরেই তর্জনি তুলছে বিপাশা, পত্রপাঠ বিদায় হও এই ভদ্র সভা থেকে। তোমার জ্বালায় আমি একটু স্বস্তি করে খেতেও পাবো না।'

তা সেই ঠাট্টার কথাই সত্যি হলো।

খেতেই বসেছিল বিপাশা, একটা ব্যাচের পর আর একটা ব্যাচের সঙ্গে। সহসা সেখানে একটা উত্তেজনার ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো।...তারপর চাপা গুঞ্জন, তারপর বিস্ময় তিক্ত প্রশ্নের তীক্ষ্ণ হুল।...এবং অপরিচিত অপরিচিতাদের ঘন ঘন দৃষ্টিবাণ বিপাশার প্রতি।

বিপাশা বুঝেছিল ঘটেছে একটা কিছু, তবু বিপাশা কালা বোবা এবং অন্ধের ভূমিকা নিয়ে একমনে 'খাওয়া খাওয়া' অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না, অলকা এসে ফেটে পড়লো। বন্ধু বলে রেয়াৎ করলনা, 'আহা খেতে বসেছে' বলে মায়া করল না, কড়া গলায় বলে উঠলো, 'উঃ হরিবল। এ মানুষকে তো তোর গলায় বগ্‌লস পরিয়ে চেন ধরে বেড়ানো উচিত বিপাশা। শুনেছিস ব্যাপার?'

বিপাশার হাত পা থর থর করে কেঁপে ওঠে। বিপাশা চোখে অন্ধকার দেখে। এতগুলো লোকের মধ্যে ঠিক এরকম পরিস্থিতিতে বোধহয় পড়তে হয়নি কখনো। তবু কষ্টে ধৈর্য রক্ষা করে, বলে, 'শুনিনি, অনুমান করছি।'

'আশ্চর্য! এই বর নিয়ে তুই ঘর করিস? আমি হলে কবে তালাক দিতাম। ছি ছি ছি!'

'আমিও দেব আজ!' সহসা জলের গ্লাসে হাত ডুবিয়ে উঠে পড়ে বিপাশা টেবিলের অপর সকলের প্রতি তাকিয়ে একটা ক্ষীণ 'মাপ করবেন' উচ্চারণ করে চলে আসে রুমালে হাত মুছতে মুছতে।

বহুমূল্য বেনারসীখানা ঝলসে ওঠে, জড়োয়া বালার দামী পাথর গুলো ঝকমকিয়ে ওঠে!

ওর ভঙ্গী দেখে মনে হয়েছিল নীচে এসেই বুঝি বরকে সায়েস্তা করবে, কিন্তু তা করল না। 'কি হয়েছে' সেটাও ভাল করে জিজ্ঞেস করল না অলকাকে। হঠাৎ সোজা সিঁড়ী দিয়ে নেমে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অনেকে তাকিয়ে দেখল, অনেকে অস্ফুট মন্তব্য করলো, বুঝতে

পারল না এ ব্যাপারটা কি হলো ?

গাড়ী কোথায় মহিলার ?

দূরে পার্ক করা আছে ?

নিজেই চালিয়ে যাবেন ?

কেলেঙ্কারীটা করলো কে ? ওঁরই স্বামী না ? তাই রেগে টেগে বেরিয়ে যাচ্ছেন। খুব ড্রিঙ্ক করেছে বুঝি লোকটা ?

আরে আদৌ না।

ড্রিঙ্ক করেই না।

তবে ?

শাদা চোখে সিঁড়ীর মাঝখানে একটা পরস্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলো ? চাবুক মারা উচিত রাস্কেলটাকে !

কিন্তু মহিলাটি কি গাড়ীতেই গেলেন ? না হেঁটে হেঁটে ? বেচারী !

তা' এসব মন্তব্য অবশ্য বিপাশা শুনতে পায়নি। তবু বিপাশা সেই সিঁড়ী দিয়ে নামতেই কার যেন অস্ফুট উক্তির মধ্যে থেকে জেনে নিয়েছিল ব্যাপার।

সেই থেকে হাঁপ ধরেছে ওর।

রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সী ধরে চলে এসেছে, এতক্ষণ এত কাজ করেছে হাঁপ ধরা থামেনি বরং বেড়েই চলেছে।

বাড়লো, আরো বাড়লো !

গেটে গাড়ীর শব্দ হলো।

গলায় শব্দ শোনা গেল শশাঙ্কর।

খুব সম্ভব দারোয়ানকে বিপাশার বিষয় প্রশ্ন করলো। তারপর বোধ করি নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ী গ্যারেজ তুলতে গেল।

এইবার লাফাতে লাফাতে আসবে, নাটকীয় ভঙ্গীতে ঘরে এসে ঢুকবে, কায়দা করে বলে উঠবে, 'কখন চলে এলে বলো তো ? আশ্চর্য ? বলে এলে না তো কিছু ?'

তারপর—বিপাশা কথা কইছে না দেখে বলে উঠবে, 'ওঃ শুনেছ

বুঝি দুর্ঘটনা? খুব রেগে গেছ কেমন? বাস্তবিক আমি যে কী নন্‌সেন্স একটা।'

তারপর হয়তো একটু ঘুরপাক খেয়ে বলবে, মেয়েগুলোকেও বলিহারী? গায়ে একটু হাত ঠেকালেই যদি আমাদের সেই ঠাকুমাদের মত জাত যায়, তো অমন মুণ্ডু ঘোরানো বাহার দিয়ে লোকের হাতের কাছে আসিবে কেন? ·····নিজেকে যত পারবে বিজ্ঞাপিত করবে অথচ আরে বাবা, ওই রং ওই রূপ, ওই ছ ইঞ্চি ব্লাউস, মাকড়সার জাল শাড়ী, ওসব দেখলে মাথার ঠিক রাখা যায়, লোকে যে কি করে ঠিক রাখতে পারে! আমি তো পারি না। মহিলাদের উচিত হচ্ছে এ রকম পুরুষ অধ্যুষিত সভাগৃহে গায়ে একটি আলোয়ান জড়িয়ে আসা।'

নিজের দোষটাকে হাওয়া করে দিয়ে বলবে এ সব।

বলবে!

এই রকমই বলে!

বিপাশার মুখস্থ এসব কথা।

বলে আর দাঁত বার করে হাসে। অথচ আশ্চর্য দাঁতগুলোই ওর সব চেয়ে মনোহর? হাসি দেখলে মনে হয় দেবদূত হেসে উঠলো!

'রূপ আছে, গুণ নেই।'

শরৎ বাবুর সেই লাইনটা মাঝে মাঝেই মনে পড়ে বিপাশার। যাক্ আজ আর ওই হাসিতে ভুলছে না বিপাশা।

পায়ের শব্দ হলো ঘরের বাইরে।

ঠোঁটটা কামড়ালো বিপাশা।

প্রস্তুত করলো নিজেকে।

কিন্তু কই?

পায়ের শব্দ অন্যদিকে ফিরে গেল যে? কান খাড়া করে রইল, অপেক্ষা করলো, শব্দটা ফিরে এল না!···শুধু মাঝে মাঝে বাতাসে দরজার পর্দাটা দুলতে লাগলো।

চাকর বাকররা ঘুমিয়ে পড়েছে, বাড়ি নিঝুম হয়ে গেছে···রাত্রি

*　　*　　*

গভীর থেকে গভীরে গড়িয়ে পড়ছে।

আর সেই গভীরতার বুক চিরে চিরে কোথা থেকে যেন কুকুরের ডাক উঠছে একটানা কদর্য কুৎসিত !···

বুকের সেই ভয়ঙ্কর ওঠাপড়াটা অনেকক্ষণ থেমে গেছে বিপাশার, বুকটা ক্রমশঃ হিম হিম হয়ে আসছে। কী হলো ? কী করলো লোকটা ? এটা তো ওর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না ? চক্ষুলজ্জার দায়ে অন্যত্র শুয়ে পড়বে শশাঙ্ক ?

ডানলোপিলো ছাড়া তো ঘুমই হয় না বাবুর। তা'ছাড়া চক্ষুলজ্জার বালাই আছে ওর ?

বিপাশার প্রোগ্রামটাই ভেস্তে দিল। বিপাশা ভেবেছিল রাত্রির এই নির্জনতায়, যখন চাকর বাকরদের কান উৎকর্ণ হয়ে থাকবে না, তখন শশাঙ্কর সঙ্গে খোলাখুলি কথায় এই ধিকৃত দাম্পত্যের প্রহসনে যবনিকা টেনে দেবে !

নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেবে বিপাশা, খোর-পোষ নিয়ে আরো ধিকৃত করবেনা নিজেকে।

বিচ্ছেদ ?

তাও হয়তো করবে এক সময়। যদিও এখন কেলেঙ্কারীর ভয়টাই চরম ভয় হয়ে উঠেছে বলে ওদিকটা তাকাতে ইচ্ছে করছে না।

কিন্তু এখন যে একটা সাংঘাতিক ভয়ে শরীর অসাড় করে দিচ্ছে।

শশাঙ্ক এমন নিশ্চুপ ?

আর ধৈর্য ধরা যাচ্ছে না। হাত পা কাঁপছে। ঘরের দরজা খুলে একা এমন জেগে বসে থাকা বোধকরি বিপাশার এই প্রথম ! গভীর রাত্রিতে বাড়িটা যে এমন ছমছমে হয়ে ওঠে, তা কোনোদিন জানা ছিল না বিপাশার।

দরজার বাইরে বেরোতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। তবু—আর

পারল না, উঠে পড়লো। আস্তে পর্দাটা সরালো, যেন ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য দেখবে, যেন সেই দৃশ্যটা গ্রাস করে ফেলবে বিপাশাকে।

কিন্তু না, দালানে 'দৃশ্য' নেই কিছু।

পরিচিত চেহারাটাই নিথর হয়ে আছে। কেমন করে যে বসবার ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়েছিল তা বিপাশাই জানে না।

তারপর দাঁড়িয়ে পড়লো।

নিথর হয়ে গেল।

কোনো চাকরের নাম করে ডেকে উঠবে সে শক্তি খুঁজে পেল না। বসে পড়লো দরজার কাছে পাপোষের উপর! দেখতে পেল নিজের হাত দুটো বিধবার মত শূন্য ফাঁকা।

কতক্ষণ বসেছিল বিপাশা?

যুগ যুগ।

বিপাশার তাই মনে হলো। যেন অনন্তকাল বসে আছে একটা নীল নিথর দেহর দিকে তাকিয়ে।

ওই নীল কি শুধু ফ্লোরেসেন্ট লাইটের? না, জীবনের যবনিকার?

বিপাশা বুঝতে পারছে না ও উঠে ছুটোছুটি করবে, না ওই নীলাভ ছবিটার দিকে তাকিয়ে শুধু বসেই থাকবে।

ছবি! দীর্ঘ একটা পুরুষ দেহ আধখানা শরীর ঝুলিয়ে একটা সোফার উপর শুয়ে আছে। আর তার পায়ের কাছে উড়ে বেড়াচ্ছে একটুকরো শাদা কাগজ?

ওষুধের মোড়কের কাগজ!

এত সহজে সংগ্রহ করা যায় এই ওষধ?

যাতে সমস্ত পৃথিবীকে জব্দ করে দেওয়া যায়? বিপাশা তবো এমন করে নিজে জব্দ হয়ে পড়ে আছে কেন? ভয়ানক একটা যন্ত্রণায় ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো বিপাশার, মনে হলো এখুনি একটা কিছু করে ফেলে!

কি করবে?

সেই চিরাচরিত পদ্ধতিতে আগুনে পুড়বে? তাছাড়া আর কি

আছে ? একেবারে হাতের মধ্যে ?

কিন্তু আগুনে পুড়তে যাবার আগেই অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটলো। ওই আধঝোলা দেহটা যেন অস্ফুট একটা শব্দ করে ঝোলানো পা টাকে টানলো !

টানলো। সহজ ঘুমন্ত মানুষের মত।

স্পষ্ট দেখতে পেল বিপাশা।

এরপরও ওর ওপর কৃতজ্ঞ হবে না বিপাশা ? সেই কৃতজ্ঞতায় ঝাঁপিয়ে পড়বেনা ওর কাছে ? আর্তচীৎকারে বলে উঠবেনা, 'এই শুনছো ? এখানে শুয়ে আছো কেন ?'

ধড়মড় করে উঠে বসলো শশাঙ্ক।

তারপরই মাথাটা নীচু করলো।

চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালিয়ে দিল বিষণ্ণ অপরাধীর ভঙ্গীতে !

নীলচে আলোয় ওই বিষণ্ণ মুর্তিটা যেন একটা ছবির মত লাগছিলো। বিপাশা আবার চেঁচিয়ে উঠলো, এখানে শুয়েছ কেন ?

'এমনি !' মাথাটা আরো ঝোঁকালো।

'এমনি ! বাঃ চমৎকার !' বিপাশা আরো তীক্ষ্ণ হলো তারপর বললে, 'এমনি এখানে এসে পড়ে থাকলে মাতালের মত ? এ কাগজটা কিসের ?'

'কোন্ কাগজ ? ওঃ ওটা একটা ঘুমের পুরিয়া।'

'কেন, ঘুমের পুরিয়া খেতে গেলে কেন ? ঘুমের পুরিয়া খাবার কি দরকার ছিল ? ঘুমের অভাব আছে কিছু ?'

শশাঙ্ক বিষণ্ণ গলায় বললো, 'আজ মনে হচ্ছিল হবে অভাব !'

বিপাশা ওই অভূতপূর্ব দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে দেখলো ! শশাঙ্কর মুখে বিষণ্ণতা। তৈরি করা অপরাধী, অপরাধী মুখ নয়, এ অন্য কিছু। যা শশাঙ্কর মুখে কখনো দেখেনি বিপাশা।

কোথা থেকে এসে 'ধাক্কা দিল একটা নির্বোধ মমতা বলে উঠল ফস করে প্রায় হেসে, 'কেন ? সেই সুন্দরী মহিলাটি রাতের ঘুম কেড়ে নেবে আশঙ্কা হলো ?'

আশ্চর্য, শশাঙ্ক এ প্রশ্রয় নিল না।

শশাঙ্ক মাথাটা আরো হেঁট করলো।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

অতএব বিপাশাকেই কথা বলতে হলো, 'হয়েছে, যথেষ্ট অনুতাপ দেখানো হয়েছে! যেন এ ঘটনা নতুন। নাও এসো বাকী রাতটুকু একটু ভাল করে শোবে চল।'

শোবে চল!

হাঁ সেই কুদৃশ্য জোড়া খাটে।

বিপাশাই বা কোথায় যাবে আর? আগুন টাগুন যখন পাওয়াই গেল না এখন, ঘুমিয়ে পড়াই শ্রেয়।

পোষাক ছাড়তে বাথরুমে গেল শশাঙ্ক, সেই ফাঁকে তাড়াতাড়ি ড্রয়ার খুলে চুড়িগুলো বার করে পরে নিল বিপাশা। বিছানার উপর পড়ে থাকা গহনা গুলো যত্ন-করে তুলে ফেললো। শশাঙ্কর বালিশটাকে ভাঁজ করে থাবড়া মেরে শশাঙ্কর মনের মত করে দিল।

দরজাটায় ছিটকিনি লাগাবে এবার।

নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবে!

আর।

আর আবার হয়তো কাল সকালে অলকার সঙ্গে ফোনে কথা কইতে হেঁসে গড়িয়ে পড়ে বলবে, বলি' না যে ওকে নিয়ে জীবন মহানিশা হয়ে গেল আমার।'

প্রমথনাথ বিশী

বাঘ্‌দন্তা

রাণুর সঙ্গে রজত রায়ের আজ তিন মাস ধরিয়া পূর্ব্বরাগের পালা চলিতেছে, কিন্তু কিছু সুবিধা হইতেছে না। উভয় পক্ষ ধনী, বিবাহে কোন বাধা নাই, তবুও রজত ইতিমধ্যে তিন বার মোটর ও চার বার বালা বদল করিয়াছে, সাধনা অদম্য উৎসাহে চলিয়াছে, সিদ্ধির দিকে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারে নাই।



আসল কথা, প্রত্যেকের একটি করিয়া মর্ম্মস্থান আছে, সেখানে হাত না-পড়া পর্য্যন্ত সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই মর্ম্ম এত অবারিত যে হাত দিতেই সেখানে পড়ে। দু-এক জনের মর্ম্ম সত্যই রহস্যময়, আমাদের রাণু সেই দলের। রজত কি ছাই এত কথা বোঝে, না তাহার ভাবিবার সময় আছে! সে নিয়ত আসে যায়, রাণুর সঙ্গে গল্প করে, গান শোনে, চা খায়, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে মুখ গম্ভীর করিয়া মোটর হাঁকাইয়া বাড়ী ফেরে। অবশেষে উভয় পক্ষের কর্ত্তারা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

রজতের ব্যারিষ্টার পিতা তাহাকে শুভবিবাহের এক মাসের নোটিশ দিলেন। শুনিয়া রজত তৃতীয়তম মোটর হাঁকাইয়া রাণুর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণুর কাছে খবর গেল। রজত বসিয়া টেবিলের বই লইয়া নাড়িতে লাগিল। হাঁ, একটা কথা অনাবশ্যক মনে করিয়া বলি নাই, বিশেষ, শুনিলে হয়ত রাণুর উপরে পাঠকের শ্রদ্ধা কমিয়া যাইতে পারে, এমন কথাও মনে হইয়াছিল। কিন্তু আর গোপন করিয়া ফল নাই, রজতের হাতে এখনই তাহা ধরা পড়িবে। রাণু মহাভারত পড়ে পয়ারেবাঁধা খাস কাশীদাসী গ্রন্থ।

বই নাড়িতে নাড়িতে রজত একখানি কাশীদাসী মহাভারত আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। বহু অধ্যয়নের চিহ্ন তাহার মার্জ্জিনে। তাহাতে ছোট বয়সের মোটা অক্ষর ও বড় বয়সের ছোট অক্ষর সবই আছে। সে অন্যমনস্ক ভাবে পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ দেখিল দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের পাতায় লেখা আছে, "উঃ, অর্জুন কত বড় বীর। নিশ্চয় অনেক বাঘ সে মারিয়াছে।" আবার, আর এক পাতায় ভীমের বক রাক্ষস বধের ছবির তলায়,—"ভীম না জানি কত বাঘ মারিয়া ফেলিয়াছে।" এক, দুই, তিন! এক মুহূর্ত্তের মধ্যে রজতরঞ্জনের মনে একটা দিব্যদৃষ্টির বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল! এমন দিব্যদৃষ্টি লাভ জীবনে কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। রজত মহাভারত যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ভদ্রলোকের মত বসিল। রাণু প্রবেশ করিতে সে বলিয়া উঠিল—রাণু আমায় দিন পনরর ছুটি দিতে হবে!

কেন?

একবার সুন্দরবনে যাব।

রাণু ঠাট্টার সুরে বলিল, জমিদারী দেখতে বুঝি,—নায়েবরা খুব চুরি করছে!

রজত বলিল, হাঁ, জমিদারীও দেখা দরকার আর ঐ সঙ্গে গোটা-কয়েক বাঘও মারব!

'বাঘ'! রাণু চমকিত হইয়া উঠিল! রজত আড়চক্ষে তাহা লক্ষ্য করিল।

আপনি বাঘ মারতে পারেন ? কই আমাকে ত বলেন নি ?

রজত তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল, হামেশাই ত মারছি, কত বলব। আমি যে দু-বেলা ভাত খাই, তা-ও ত তোমাকে বলি নি ?

রাণু, বিস্মিত ভাবে বলিল, কিন্তু আপনাকে দেখে ত মনে হয় না যে আপনি বাঘ মারেন।

রজত চেয়ারে হেলান দিতে দিতে বলিল, আমাকে দেখে কার কি মনে হবে সেজন্য কি আমি দায়ী ?

আপনি ক'টা বাঘ মেরেছেন ?

হবে পঞ্চাশ ষাটটা।

তার মধ্যে রয়াল বেঙ্গল ক'টা ?

রজত হাসিয়া বলিল, রয়াল বেঙ্গল ছাড়া ত আমি অন্য কিছু মারিনে।

রাণু এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, এবার বসিয়া পড়িল।

রজত এতক্ষণ বসিয়াছিল, এবার দাঁড়াইয়া উঠিল ; কহিল চলি তবে।

না, না, একটু বসুন ; চা খেয়ে নিন।

চা হইল, জলযোগ হইল। রজত চা পান করিয়া বুঝিল আজকার চায়ে চিনির সঙ্গে রাণুর অনুরাগ মিশিয়াছে।

রজত জিজ্ঞাসা করিল. কি বল রাণু, তোমার জন্য একটা বাঘ আনব না কি ?

রাণু বিস্মিত আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া বলিয়া উঠিল, বেশ মজা হবে, বেশ মজা হবে।

রজত ধীরভাবে প্রশ্ন করিল, জ্যান্ত না মরা ?

রাণু ভীতভাবে বলিল, জ্যান্ত ? না, না, সে হবে না।

আচ্ছা তবে মরাই আনব, এই বলিয়া রজত উঠিয়া পড়িল।

রাণু দুয়ার পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে আসিল ; একবার থামিল, একবার ইতস্ততঃ করিল. একবাব কাশিল, তার পরে বলিয়া উঠিল. না-হয় বাঘ শিকারে নাই গেলেন !

রজত হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

রাণু লজ্জাজড়িত উৎকণ্ঠার সহিত বলিল, তবে একটু সাবধানে থাকবেন। কবে আসবেন?

দিন পনরর মধ্যে, বলিতে বলিতে রজত আর একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বাহির হইয়া আসিল। রজত আজ রাণুর চোখে এমন একটি আশ্বাসভরা দীপ্তি এবং সিক্তপ্রায় আঁখিপল্লবের ভঙ্গী দেখিতে পাইয়াছে, যাহাতে সে বুঝিল বহুদিন অকুল সমুদ্রে ভাসিয়া দূরে দ্বীপের আলো দেখিয়া কলম্বসের মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল আর কি সান্ত্বনা পাইয়াছিল সেই হতাশ নাবিক সমুদ্রের জলে সদ্যভগ্ন বৃক্ষপল্লবের সাক্ষাতে।

দিন পনর পরে একদিন বিকালে রাণুদের বাড়ীতে রজতের মোটর আসিয়া থামিল। রজত লাফাইয়া নামিয়া পড়িল, এবং পাঁচ-সাত জন লোকের সাহায্যে টানিয়া নামাইল প্রকাণ্ড এক বাঘ। রাণুর এতদিন উৎকণ্ঠায় কাটিতেছিল, খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিল; দেখিল সত্য সত্যই তাহার বাঘ আসিয়াছে, একেবারে খাঁটি রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

রাণু বিস্ময়ে, ভয়ে, গর্ব্বে, উল্লাসে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। সকলে মাপিয়া দেখিল বাঘটা নাক হইতে লেজের ডগা পর্য্যন্ত পাকা নয় ফুট। রজত রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিল। রাণু জিজ্ঞাসা করিল, রুমালে রক্ত কিসের? আপনার?

রজত হাসিয়া বলিল, বাঘের।

রাণু ছোঁ মারিয়া রুমাল কাড়িয়া লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল; রজত তাহাকে অনুসরণ করিল।

ঘরের মধ্যে কি হইল জানি না। কিন্তু যখন রজত বাহির হইয়া আসিল তাহার মুখে কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের গর্ব ও তৃপ্তি।

রজত রাণুর বাপের কাছে তাহার প্রার্থনা জানাইল। তিনি তাহার করমর্দ্দন করিলেন। পরের দিন আশীর্বাদ হইয়া গেল। রাণু রজতের বাগ্‌দত্তা বধূ।

বিবাহের দিন পয়লা বৈশাখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রজত প্রত্যহ আসে,

গল্প করে, চা খায়, রাণুর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া বাড়ী ফেরে। সেদিন বাঘ শিকারের গল্প হইতেছিল। রাণু জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি গাছে উঠে বাঘ মার ?

রজত সিগারেটে টান মারিয়া বলিল, প্রথমে তাই করতাম, এখন মাটিতে দাঁড়িয়ে মারি !

রাণু শিহরিয়া উঠিল।

আচ্ছা ক'টা গুলিতে বাঘ মরে ?

একটা। দেখ নি বাঘটার দুই চোখের মাঝখানে গুলির দাগ !

রাণু দেখিয়াছে বটে !

অনেক রাতে রজত উঠিয়া গেল। রাণু যাইবার সময় তাহাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে সে আর বাঘ মারিবে না। কিন্তু রজত কি প্রতিজ্ঞা করিতে চায় ! শিকার না করিতে পারিলে তাহার আর বাঁচিয়া লাভ কি ! অবশেষে অনেক অনুযোগ, অনুরোধ, অভিমানের পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রজত প্রতিজ্ঞা করিল। রাণুর বুক গর্ব্বে ফুলিয়া উটিল, রজত সত্য সত্যই তাহাকে ভালবাসে নহিলে এত বড় ত্যাগস্বীকার করিবে কেন ?

রাণু বসিয়া ভাবিতে লাগিল, শিকারের কাহিনী, সুন্দরবনের গভীর অরণ্য ; পালে পালে হরিণ, ইতস্তত বাঘ ; যেখানে-সেখানে অজগর সাপের দল। তার মধ্যে একাকী বন্দুকধারী বীরপুরুষ ! উঃ তার কল্পনা বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিল। এমন স্বামী-সৌভাগ্য তার হইবে সে কখনই ভাবে নাই। রাত এগারোটা বাজে দেখিয়া সে উঠিয়া পড়িল ; দেখিল রজত একখানি বই ফেলিয়া গিয়াছে, আধুনিকতম একখানা কন্টিনেন্টাল উপন্যাস ! রাণু বইটি লইয়া বিছানায় আসিয়া শুইল। বইখানা পড়িতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে কি মন বসে ! প্রথমেই দুই রুগ্ন যুবক-যুবতীর চা-পানের কাহিনী ! কোথায় সুন্দরবনে বাঘ-শিকার আর কোথায় চা-পানের গল্প ! নাঃ, জীবনে যদি কোথাও রোমান্স থাকে তবে তাহা ওই সুন্দরবনে। রাণু বই ফেলিয়া দিল। পাতার মধ্য হইতে একখানা কাগজ উড়িয়া পড়িল। বোধ হয় রজত

পাতায় চিহ্ন রাখিয়াছে মনে করিয়া রাণু কাগজখানা তুলিল, দোকানের বিল। রজতের নাম দেখিয়া রাণু পড়িল, লেখা আছে—**Supplied to Mr. Rajat Ranjan Roy, a Royal Bengal tiger measuring nine feet from head to tail for Rs. 350 only less advance Rs. 100—Rs. 250 only.**

হাঁ, দোকানের বিলই বটে। একেবারে সাহেবী দোকানের। ম্যানেজারের অস্পষ্ট নাম-সহিটি পর্যান্ত নির্ভুল। বিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাণুর মগজের মধ্যে এক ঝলক দিব্যদৃষ্টি খেলিয়া গেল এবং সে ভারী একটি স্বস্তি অনুভব করিল।

ইহার পরের ঘটনা সংক্ষেপ। পাঠক ভাবিতেছেন বিবাহ ভাঙিয়া গেল! বিবাহ নির্বিঘ্নে হইয়াছিল, আমরা নিমন্ত্রণ খাইয়াছি। রাণু কোনদিন সে বিলের কথা রজতকে জানায় নাই। রজত মাঝে মাঝে শিকারে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। রাণু তাহাকে প্রতিজ্ঞার কথা মনে করাইয়া দিত। সে নয় ফুট দীর্ঘ বাঘটার মাথা রাণুর বসিবার ঘরের দেয়ালে টাঙাইয়া রাখা হইল। রাণু তাহার তলায় লিখিয়া দিল—যতো ধর্মো স্ততো জয়ঃ। রজত চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও আবার কি?

রাণু বলিল, ও একটা সখ!

রজত নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিল ওটা বোধ হয় রাণুর একটা মহাভারতীয় সংস্কার।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

একটি মেয়ের ইতিহাস

সেই রমণীকে দেখেছিলাম আমি তিনবার। প্রথমবার দেখেছি তার রূপ, দ্বিতীয়বার তার মন, আর শেষবার তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

প্রথমবারটার কথা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, সেটা তার বিবাহের পূর্বে। আমি, বাসুদেব আর সুকুমার তিনজনে মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। পাত্র বাসুদেব নিজে, মেয়ে দেখার ব্যাপারে তার দুর্নিবার লজ্জা, তাই সে লজ্জা নিবারণের জন্য বেচারী অনেক অনুনয়



ক'রে আমাদের সঙ্গে নিয়েছিল। বাসুদেবের বাপ-মা ছিলেন না বলে অবস্থা সচ্ছল থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন তার বিয়ে হয়নি, আর সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের মধ্যে সে ছিল সব চেয়ে ভোঁদা, সেইজন্য তাকে কতকটা বিবাহের অনুপযুক্তই মনে করতাম। যাই হোক—এতদিন পরে কে এক দূর সম্পর্কের দিদি এই বিবাহের সম্বন্ধ এনেছেন এবং তিনিই দাঁড়িয়ে বিয়েটা দিয়ে দেবেন এমনি আশ্বাস দিয়েছেন বলে শোনা গেল। বাসুদেবেরও ইচ্ছা প্রবল, কাজেই মেয়ে দেখাটা,

ইংরাজীতে যাকে বলে for form's sake কতকটা সেই ব্যাপার! না দেখলেও বিয়ে আটকাবে না।

মেয়েটি শুনলাম অজ পাড়াগাঁয়ের—বাপ এত গরীব যে ভিক্ষে করেও রোজ পেটে ভাত যায় না। বংশটা বনেদী এই পর্যন্ত। সুতরাং কিশোরী এবং কুমারী মেয়ে দেখার জন্য অবিবাহিত যুবকদের মনে যে আগ্রহ থাকে তা আমাদের ছিল না, কারণ স্থান পাত্র এবং পাত্রীর বিবরণ কোনটাতেই বিন্দুমাত্র স্বপ্নের লেশ ছিল না। ছিল শুধ্ কাল, অর্থাৎ সময় আমাদের প্রচুর, কতকটা সেই জন্যই আমরা তার মিনতিতে চলেছিলাম।

কিন্তু আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না, যখন সেই কিশোরী মেয়েটি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল! এই সুদূর পাড়াগাঁয়ে বিজন অরণ্যের মধ্যে আমরা এমন জিনিস যে দেখতে পাব তা কখনো কল্পনাও করিনি। সে যেন সহস্র কবির স্বপ্ন। যেন চন্দ্রের লাবণ্য, শিল্পীর রেখাকে অবলম্বন করে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। এমনি আশ্চর্য সুন্দর সে!

সে আমাদের নমস্কার ক'রে বসল। এইবার আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয়। কিন্তু কে করবে? আমরা স্তম্ভিত হয়ে দেখছিলাম। দীর্ঘ পক্ষ্মাচ্ছাদিত ছলো ছলো আবেশময় তার চোখ দুটি, তার সত্যিকার চাঁপার কলির মতো ছোট ছোট সুডৌল আঙুলগুলি, তার চমৎকার দেহযষ্ঠি, প্রতিমার মতো রং—যেদিকে চোখ পড়ছিল, দৃষ্টি যেন আর ফিরছিল না।···

মেয়েটি অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করছে দেখে আমারই সম্বিৎ ফিরে এল প্রথমে, প্রশ্ন করলাম, "তোমার নাম কি?"

অতটুকু মেয়েকে 'আপনি' বলতে সঙ্কোচে বাধল যেন।

মেয়েটি ঈষৎ ভীত, একটুখানি কান্নার সুর জড়ানো কণ্ঠে উত্তর দিল, 'শ্রীমতী গৌরী বসু।'

এইবার লক্ষ্য করলাম তার মুখটি বড় মলিন, বেশভূষাও শোচনীয়।

বাপ-মায়ের চরম দারিদ্র্যের ছাপ তার চারিদিকে ঘিরে রয়েছে, যদিও তাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি।

আমরা আর কোন প্রশ্নই করলাম না, কী-ই বা করব? আমাদের ইঙ্গিত পেয়ে গৌরীর বাবা তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন, আমরাও উঠে বাইরে এলাম। তিনি বহুদূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এসে হাত জোড় করে বললেন, আমার তো জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না বাবা, আশা কি আমরা রাখতে পারি?

আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি বিয়ের যোগাড় করুন, এদিকে আর কিছু বলবার নেই।'

তারপর মাঠের ওপর দিয়ে আমরা নীরবে হাঁটতে লাগলাম। এর মধ্যে একবার শুধু বাসুদেব প্রশ্ন করেছিল, 'কেমন দেখলি?'

জবাব দিয়েছিলাম, 'ইডিয়েটের মতো প্রশ্ন করিস নি।'

ব্যাস্—আর কোন কথা নয়। সুকুমার একটি কথাও কয়নি, ট্রেনে উঠেই একটা কোণে মাথা রেখে সেই যে চোখ বুজল, সে চোখ ও একবার খোলে নি। শুধু গভীর রাত্রে, আমার মেসের তক্তাপোশটার ওপর বসে উত্তেজিত ভাবে প্রশ্ন করল, 'সোমেশ, ল্যাংড়া আম দাঁড়কাকে খাবে, আমাদের চোখের সামনে?'

আমি জবাব দিলাম, 'কি করতে চাও তুমি? ঈর্ষা যে আমারও হয়নি তা নয়, কিন্তু বন্ধুর জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে সেই মেয়ে ছিনিয়ে নেওয়ার লজ্জাও কম নয়। তা ছাড়া আমাদের দুজনের থেকেই বাসুদেবের অবস্থা ভাল, সেটা মনে রেখো। সাংসারিক দিক থেকে দেখতে হোলে বাসুদেব আমাদের দু'জনের চেয়েই ভাল পাত্র।

সে বললে, 'কিন্তু বয়স? তাছাড়া ও যে অনুভব পর্যন্ত করতে পারবে না ওর সৌভাগ্য!'

আমি জবাব দিলাম, 'ভিখিরীর মেয়ে ওরকম পাত্রের হাতে পড়াও অনেক সৌভাগ্যের কথা। আর কি করবে—এখন আর কোন পথ খোলা নেই।'

সুকুমার উঠে গেল, বোধ হয় কথাগুলো বুঝলও। কিন্তু বাসুদেবের

বিয়েতে সে একদিনও গেল না। আমাকে ডেকে বলল, 'অসম্ভব! চোখের সামনে ঐ রকম মেয়ে বাসুদেবের হাতে পড়বে তা আমি সইতে পারব না।'

অগত্যা আমিই গেলাম বিবাহ-বাসরে উপবাসক্লিষ্ট মুখ, পরদিনের বেদনারক্ত ক্লান্ত দৃষ্টি, ফুলশয্যার রাত্রে মণিমাণিক্য বিভূষিতা রাজেন্দ্রানী-রূপ, প্রত্যেকটিই যেন আমার কাছে নব নব বিস্ময়। আমি তিন দিন ধরে শুধু তার রূপই দেখলাম। যেন মনে হয় তার পরের দিনই এক ফাঁকে বাসুদেব আমার পরিচয় দিয়ে বলেছিল, এটি আমার বিশেষ বন্ধু, আমার সঙ্গে তোমায় প্রথম দিন দেখতে গিয়েছিল, মনে আছে তো?'

সে যেন তার উত্তরে আমার মুখের দিকে একবার চেয়েছিল। কিন্তু সে দিনের কোন কথা আমার পক্ষে ঠিক ক'রে বলা এখন শক্ত!

এরপর কিছুদিন আর বাসুদেবের খবর রাখি নি। মাস ছয়েক পরে হঠাৎ শুনলাম সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বৌকে নিয়ে দেশে চলে গেছে। বিস্মিত হলাম, কারণ সে ভাল মাইনেই পেত। তবে তার দেশের অবস্থাও ভাল বলে জানতাম সুতরাং চিন্তিত হলাম না। আরও কিছুদিন পরে ক্রমে ক্রমে বাসুদেব আর তার সুন্দরী স্ত্রী মনের মধ্যে একটা ঈর্ষাতুর বেদনাদায়ক স্মৃতিতে মাত্র পর্যবসিত হ'ল।

আবার তার সঙ্গে দেখা হ'ল বিয়ের ঠিক পাঁচ বৎসর পর—

বর্ধমানের এক অত্যন্ত ক্ষুদ্র গ্রামে বিশেষ একটা কাজে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে গরুর গাড়ী করে শহরে ফিরে ট্রেন ধরবার কথা, কিন্তু খানিকটা গরুর গাড়ীতে চলবার পর আমি নেমে হাঁটতে লাগলাম, গাড়ীটা মন্থর গতিতে আমার পিছু পিছু আসতে লাগল।

এইভাবে চলে শহরের প্রান্ত সীমায় যখন এসে পৌঁছেছি তখন, সহসা একটি ছোট ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে ডাকল, 'মশাই, ওমশাই!'

থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলুম, 'কি চাস রে বাপু?'

সে আঙুল দিয়ে একটা জরাজীর্ণ বাড়ি দেখিয়ে বললে, 'আপনাকে একবার যেতে হচ্ছে ঐখেনে—'

'তার মানে ? খামোখা আমি ওখানে যাব কেন ?'

সে বললে, 'গিন্নীমা ডাকছে, সে চেনে আপনাকে।'

বিস্ময়ের অবধি রইল না। তবু যখন চেনা মানুষ বলে দাবী করছে তখন যেতেই হ'ল। সেই উলঙ্গ প্রায় বালকটির পিছু পিছু গিয়ে যখন সামনে পৌঁছুলুম তখন দেখলুম একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে দরজা ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পরনের শাড়ি জীর্ণতার অন্তিম দশায় এসে পৌঁচেছে, দারিদ্রে ও মনোকষ্টে তার প্রথম যৌবন পিষ্ট, দেহ শীর্ণ, মাথার চুল রুক্ষ, কিন্তু তবু তার সেই আশ্চর্য রূপের কিন্তু তখনও বোধ করি অবশিষ্ট ছিল—কারণ এক নজরেই তাকে চিনতে পারলুম।

স্তম্ভিত হয়ে মুহূর্তকাল তার দিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুটস্বরে শুধু বললুম, 'গৌরী, তুমি ?'

সে একটু হাসল। অস্তোন্মুখ দ্বিতীয়বার চাঁদের মতই তখনও তার সে হাসিতে বোধকরি পূর্বের লাবণ্য কিছু অবশিষ্ট ছিল।

হেসে সে বললে, আসুন না, ভেতরে !

আমি একটুখানি ইতস্তত করে বললুম, কিন্তু আমার ট্রেন সাতটায় আর সময় হবে কি বসবার—'

যদিও কৌতূহল ও দুঃখ আমার মনের মধ্যে তখন প্রবল হয়ে উঠেছে।

গৌরী বললে, যদি জরুরী দরকার থাকে তো আটকাব না। নইলে না হয় কাল সকালেই যাবেন।'

আমি আর দ্বিধা করলুম না। গাড়ীওয়ালাকে সেই নির্দেশই দিয়ে বাইরের ঘরে বসলুম। তারপর বাচ্চা চাকরটি অদৃশ্য হতেই আমি তাকে একযোগে সহস্র প্রশ্ন করলুম 'এ সব কি ব্যাপার গৌরী, বাসুদেব কোথায় ? তোমরা এখানেই বা কেন ? এ রকম অবস্থাই বা হ'ল কি করে ?'

গৌরী নতমুখে বললে, 'উনি বাইরে গেছেন। আপনি স্থির হয়ে মুখে হাতে জল দিন—সবই জানতে পারবেন।'

আমি আরও ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলুম, 'স্থির আমি হবই, তার জন্য চিন্তা নেই। কিন্তু এ কি করে সম্ভব হ'ল। এ যে আমি ভাবতেই পারছি না!'

বহুদিন আগে এই মেয়েটি যখন পরের গলায় মালা দেয় তখন যে ঈর্ষাতুর বেদনা অনুভব করেছিলাম আজ এতদিন পরে সেই ব্যথাই যেন সহস্রগুণ হয়ে কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল। গৌরী বহুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বললে, 'উনি বিয়ের কিছুদিন পরেই চাকরী ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে যান কিন্তু দেশেও বেশিদিন থাকতে পারেন নি। এদেশ-ওদেশ ক'রে ঘুরে বেড়াতে বহু টাকা খরচ হ'ল তার ওপর মদ ধরলেন।

আমি যেন ক্রমে পাষাণ হয়ে যাচ্ছিলুম। কোনমতে প্রশ্ন করলুম, 'তারপর?'

সে বললে, দেশের জমি-জমা বাড়ী-ঘর সমস্তই বিক্রী হয়ে গেল; এখানে ওঁর দিদিমার কিছু জমি ছিল আর এই বাড়ীটা, সেই সূত্রেই এখানে আসা—'

বহুক্ষণ দুজনেই নীরব রইলুম, তারপর আমিই আবার অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বললুম, 'বাসুদেবের কি মাথাতে কোন গোলমাল হ'ল, না আর কিছু?

সন্ধ্যার আলো ভাঙা বাড়ীর মধ্যে তখন নিরতিশয় ম্লান হয়ে এসেছে, তবু তারই মধ্যে দেখতে পেলাম তার সমস্ত মুখে কে যেন সিঁদুর মাখিয়ে দিলে। সে যে সুগভীর লজ্জার চিহ্ন তা আমার বুঝতে বাকী রইল না। একবার মনে হ'ল যেন সে ছুটে পালিয়ে যেতে চাইছে, কিন্তু বহু চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিলে, খানিকটা পরে অর্ধস্ফুট স্বরে বললে, 'আমাকে উনি কোথাও রেখে স্থির হ'তে পারেন না। সেই থেকেই যত গোলমাল।'

কথাটা বুঝতে দেরি হ'ল। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তার মানে? ঈর্ষা? সন্দেহ?'

সে সেই ভাবেই জবাব দিলে, 'কোন বিশেষ লোককে নয়, কিম্বা

ঠিক আমাকেও নয়। ওঁর কেমন একটা ধারণা হ'ল যে আমাকে কোথাও রাখা নিরাপদ নয়—'

কী সর্বনাশ! আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। কথাটা বোঝবার চেষ্টা করলুম কিন্তু ঠিক ধারণা করতে বিলম্ব হ'ল। বুঝলুম মনের ভাবটা যাই যোক—এটা মাথা খারাপেরই লক্ষণ। সুন্দরী স্ত্রীর জন্য বাসুদেবের মাথাটা খারাপ হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

কিছুক্ষণ পরে সে বললে, 'মুখে হাতে জল দিন—উঠুন!'

আমি সে কথার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলুম, 'আজ সে যে বাইরে বেরিয়েছে তাহ'লে? তোমাকে একলা রেখে?'

'মদ কিনতে গেছেন—শহরে।'

আর একবার শিউরে উঠলুম। চোখের সামনে ঐ নতমুখী রূপসী মেয়েটির দিকে চেয়ে সারা মন যেন মুচড়ে উঠতে লাগল। হায় রে! তখন যদি সুকুমারকে বাধা না দিতুম!

বললুম, 'আমাকে ডাকলে যে, এর জন্য তোমার লাঞ্ছনা সইতে হবে না?'

সে অতিকষ্টে অপমানের অশ্রু দমন ক'রে বললে, 'তা ঠিক হবে না। হয়তো আপনাকে দেখে তিনি খুশীই হবেন। তিনি আপনার নামই প্রায় করেন।···

'আর তাছাড়া, হয়তো আপনাকে ডেকে অনর্থক ব্যথাই দিলুম, কিন্তু তবু কী যে হ'ল, না ডেকে যেন থাকতে পারলুম না!'

উঠে মুখে হাতে জল দিলে এসে চৌকীতে বসলুম। সে একটু পরে এক পেয়ালা চা তৈরী করে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। আর এক হাতে একটা ঠোঙায় রসগোল্লা। একটু ম্লান হেসে বলল, 'দুধ ঘরে থাকে না, পাওয়াও গেল না, 'র'-চাই খেতে হবে—'

ভাবছিলাম যে আমার এই সময়ে যাওয়াই বোধ হয় উচিত হবে কিন্তু তবু বাসুদেবেব সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা না করেই চলে যেতে মন চাইল না।

এরপর, যে প্রশ্নটা মেয়েরা কোন অবস্থাতেই করতে ভোলে না, গৌরী সেই প্রশ্নই করলে, 'বিয়ে করলেন কবে ?'

উত্তর দিলাম, 'করি নি।'

সে বিস্মিত হয়ে বললে, 'এখনও করেন নি ?'

তার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, 'সে উত্তর শুনলে তুমি হয়তো ব্যথাই পাবে। সে কথা থাক্—'

অকস্মাৎ সে ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল, 'কে বলেছে ব্যথা পাব ? কে বলেছে আপনাকে ? না, বলতেই হবে—'

মুহূর্তমধ্যে আমারও বুকটা যেন কেঁপে উঠল। স্খলিত কণ্ঠে বললাম, 'তোমাকে দেখার পর আর কোন মেয়ের কথা আমি ভাবতেই পারি না গৌরী! আজও সেই প্রথম দিনটার কথা ভুলতে পারি নি যে!'

গৌরীর পাণ্ডুর মুখ যেন আরও বিবর্ণ হয়ে উঠল, তার ঠোঁট দুটি যেন নিমেষের জন্য—থরথর করে কেঁপে উঠল—তারপরই সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরের ম্লান আলোতেই একটা ছায়া অনুভব করলুম। সঙ্গে সঙ্গেই তীব্রকণ্ঠে একটা প্রশ্ন এল. কে, কে ভেতরে ?'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে যতদূর সম্ভব সহজ গলাতেই প্রশ্ন করলুম, 'কে বাসুদেব ? এতক্ষণ কোথায় ছিলে হে! এস, এস!'

বাসুদেব মুহূর্তকয়েক বাইরেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ভেতরে এসে ঢুকেও প্রথমটা ঠিক চিনতে পারলে না। তার মুখে অপরিচয়ের বিস্ময় লক্ষ্য ক'রে বললুমঃ, 'কি হে, চিনতে পারলে না ?'

এইবার তার স্তিমিত চোখে পরিচয়ের জ্যোতি এল, সে খুশীই হ'ল যেন ; বললে, 'আরে সোমেশ!'

কিন্তু আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়েছিলুম। এ কি সেই বাসুদেব ? কোথায় তার সেই গোলগাল চেহারা আর কোথায় তার সর্বাঙ্গে সেই প্রাচুর্যের প্রসন্নতা ? চেহারা শীর্ণ, চক্ষু কোটরগত—সর্বাঙ্গে অভাব, দুশ্চিন্তা ও মদ্যপানের চিহ্ন, এমনকি এই বয়সেই তার মাথার

চুলগুলো অধিকাংশই পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে! বুঝতে পারলুম যে গৌরীকে সে কষ্ট দিয়েছে বটে কিন্তু যন্ত্রণা নিজেও কম সহ্য করেনি।

বাসুদেব এগিয়ে এসে আমারই চৌকিটার ওপর বসে পড়ল। তার জীর্ণ ও মলিন উড়ুনিটার মধ্যে ছিল মদের তুটি বোতল, সে তুটো আমার কাছে গোপন করবার চেষ্টামাত্র না ক'রে আমারই পাশে বার ক'রে রাখলে, তারপর জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে প্রশ্ন করলে; তারপর? হঠাৎ—?'

বললুম এখানে একটু কাজে এসেছিলুম, হঠাৎ শুনলুম তোমার নাম, এখানেই আছ শুনলুম। তাই খুঁজে খুজে বেড়াচ্ছিলুম, তোমার গিন্নী দেখতে পেয়ে চাকর পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন যে এই বাড়িই বটে। যা হয়রাণ হয়েছি, উনি দয়া না করলে হয়তো খুঁজেই পেতুম না—।'

বাসুদেব যেন অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিল। আমিও চুপ ক'রে কথাটা বলবার সুযোগ চিন্তা করতে লাগলুম। অর্থাৎ কিছুক্ষণ চুপচাপ।

এই সময়ে সেই ছেলেটি একটা ভাঙা হ্যারিকেন জেলে এনে ঘরের মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে গেল। আমি আলোটা হাত দিয়ে আড়াল করে ফেললুম, 'কিন্তু বাসুদেব, এ অবস্থার কারণ কি? কি ব্যাপার?'

বাসুদেব একটু ম্লান হেসে ছাড়িয়ে উঠে বললে, 'হবে, হবে, যখন এতদিন পরে পেয়েছি তোমাকে, তখন সবই বলব। কিন্তু ঘরে বোধ হয় কিছুই নেই। অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা ক'রে আসি—একটু বোস্!'

সে ভেতরে চলে গেল। ভেতর থেকে অস্ফুট তু-একটা কথাও শুনলাম। মিনিট পনের পরেই সেই ছেলেটি একটা খালি তেলের বোতল ও একটা বাটি হাতে ক'রে আমারই সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল, বুঝলুম সে দোকানে গেল। তারই একটু পরে বাসুদেব ফিরে এসে আবার চৌকিতে বসল।

কিন্তু কথাটা পাড়তে তার বিলম্ব হ'তে লাগল। সঙ্কোচে আমরা কেউ কারুর দিকে চেয়ে থাকতে পারছিলুম না, তু'জনেই লণ্ঠনটার দিকে চেয়েছিলুম। মিনিট পাঁচেক পর বাসুদেব বললে, 'তোর তো

অজানা কিছুই নেই সোমেশ, আমার তুই সব খবরই রাখতিস। ভুল হ'ল আমার গৌরীকে বিয়ে করা। আর সেই থেকেই ব্যাপার চলছে—'

আমি বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলুম, 'কিন্তু ভুলটা কি?'

অকস্মাৎ সে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'ভুল নয়? দেখেছিস তো গৌরীকে তুই? ঐ রকম রূপ এর আগে আর কোথাও নজরে পড়েছে? বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে?··· আর আমি? কি আছে আমার? তোদের মধ্যে আমিই ছিলুম dull, সেটা আমি বুঝতে পারতুম না মনে করিস? ঐ মেয়েকে বিয়ে করা আমার পক্ষে কিছুতেই উচিত হয়নি; আমার কি আছে, কেন ভালবাসবে আমাকে ও?'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'কি পাগলের মতো বকছিস? কে বলেছে উচিত হয়নি? পাত্র হিসেবে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছিলি তুই, আমরা সবটা ওপর-চালাকিতে মারতে চেষ্টা করতুম, তুই সেটা পারতিস না, কিন্তু পৃথিবীতে ওপর চালাকির স্থান নেই, এটা ঠিক জানবি।···রূপে, গুণে সবেতেই তুই আমাদের চেয়ে বড় ছিলি—'

সে জবাব দিলে, 'আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করিস নি সোমেশ, আমি সব বুঝি।···আমার ভুলও আমি বুঝতে পারলুম বিয়ে করার পরই। দেখতে পেলুম প্রত্যেকটা লোকই ওকে দেখে চঞ্চল হয়ে ওঠে, বয়স নেই, সম্বন্ধ নেই, কোন কিছু বাধা বা বিচার নেই তাদের কাছে। তার ওপর নিজের দিকে তাকিয়ে যখন দেখলুম ওকে পাবার মত কোন যোগ্যতাই আমার নেই, তখন আর জ্ঞান রইল না—'

সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কিন্তু তার চোখের দিকে চেয়ে আমি শিউরে উঠলুম। এ যেন ক্ষুধার্ত পশুর দৃষ্টি!

কিছুক্ষণ পরে সে কতকটা নিজের মনেই বলতে লাগল, 'ওকে নিয়ে দেশ-বিদেশে কতই ছুটাছুটি করলুম কিন্তু কিছুতেই স্থির হতে পারলুম না, একদিকে দেখি সমস্ত পুরুষ ওকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে আর একদিকে দেখতে পাই আমি ওর থেকে কেবলই দূরে সরে যাচ্ছি, যোগ্যতার পথে কেবলই অধঃপতন ঘটছে আমার—'

আমি বললুম, কিন্তু এ যে নিছক পাগলামি বাসুদেব! ছিঃ ছিঃ মিছে একটা ফাঁকা খেয়ালের বশে নিজেও কষ্ট পাচ্ছিস আর ওকেও কষ্ট দিচ্ছিস—এ দুর্মতি তোর কি করে হ'ল? আমি বলছি তুই বিশ্বাস কর, তুই সর্বাংশে ওর উপযুক্ত।'

সে মাথা নেড়ে বললে, 'তুমি মিছে কথা বলছ। ওর কষ্ট লাঘব করার জন্য আমাকে স্তোক দিচ্ছ। কিন্তু আমি জানি—'

কী বোঝাব এই উন্মাদকে!

মিনিট-খানেক চুপ করে থেকে বললুম, 'কিন্তু মদ কেন ধরলি তুই? একেবারে পুরোপুরী সর্বনাশের পথে নেমে এলি?

সে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে আমার দুটো হাত চেপে ধরলে, তারপর ফিস্-ফিস্ করে বললে, সর্বনাশ? যেদিন বিয়ে করেছি ঐ সর্বনাশীকে সেই দিনই তো আমার সর্বনাশ পুরো হয়ে গেছে সোমেশ! কেন মদ খাই শুনবি? বিয়ের দু-তিন মাস পর থেকে আমি আর ওর সঙ্গে এক ঘরে শুই নি কখনও, শুতে পারি না, ঘৃণা বোধ হয়। মনে হয় যে ও আমার বুকের মধ্যে শুয়ে শুয়ে আমাকেই সর্বান্তঃ-করণে ঘৃণা করবে, অবজ্ঞা করবে—সে আমি সইব কেমন করে? তাই শুই না। কিন্তু তুই ভেবে দেখ—মানুষের শরীর তো? সমস্ত মন আকুল হয়ে ওকে চায়, সেই সাংঘাতিক কামনার সঙ্গে যুদ্ধ করা কি সহজ কথা? সেই জন্যই আমায় মদ ধরতে হয়েছে; রাত্রে মদ না খেলে পারি না এ ব্যথা সহ্য করতে—'

উঃ! আমি আর শুনতে পারলুম না, ছুটে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। শুনতে পেলুম ভেতরে বসে বাসুদেব হাসছে, ফাঁকা একটা আল্‌গা হাসি, অর্থহীন, কতকটা বিদ্রূপের সুর মেশানো!

বহুক্ষণ অন্ধকারে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ালুম। দু-একবার হোঁচট খেয়ে পড়েও গেলুম কিন্তু আমার তখন কোন জ্ঞান ছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল সেই নিশীথ অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ করে যদি নিয়তির দেখা পাই তো তাকে নখে করে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলি। যাকে দেখে অবধি নিজের জীবন শূন্য হয়ে গেছে, জীবনের সমস্ত নিষ্ফল

কামনা যার ছায়াকে কেন্দ্র করে দিনরাত আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই মেয়েকে পেয়ে উন্মাদ এমন করে নষ্ট করল! যার এক মুহূর্তের প্রসন্নতার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করা যায়!···

বুকভরা এই নিরতিশয় গ্লানি আর ধিক্কার নিয়ে কতক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছি জানি না, চৈতন্য হ'ল যখন দেখতে পেলুম যে সেই ছেলেটি আলো নিয়ে আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। ফিরে এসে দেখলুম গৌরী সেই ভাবেই দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। আমি কোথায় ছিলুম এবং কেন ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম কোন প্রশ্নই করল না। শুধু আমার মুখে বোধ হয় আত্মগ্লানির ও দুঃখের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল, সেদিকে চেয়ে মুহূর্ত দুই-এর জন্য তার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমার দুঃখে তার জীবনের বোধ করি প্রথম স্তুতিগান শুনলে সে!

ভেতরে ঢুকে দেখলুম চৌকী খালি। জিজ্ঞাসু নেত্রে গৌরীর দিকে চাইতেই সে নীরবে আঙুল দিয়ে দালানের কোণের ঘরটা দেখিয়ে দিলে। উঁকি মেরে দেখলুম, ঘরের মেঝেতে একটা ডিবে জ্বলছে আর তারই সামনে একটা ছেঁড়া মাদুর পেতে বসে বাসুদেব আপন মনে মদ খাচ্ছে। তার অদ্ভুত দৃষ্টি ধূমময়ী কম্পমানা অগ্নিশিখার ওপর নিবদ্ধ!···

ফিরে আসতে গৌরী বললে, 'ঐ ভাবেই সারারাত কেটে যাবে। সকালের দিকে ঘণ্টা-দুয়েকের জন্য শুধু ঘুমোন—'

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে প্রশ্ন করলুম, 'মাতাল হয়ে কিছু হাঙ্গাম করে না তো?'

ঈষৎ হাসির চেষ্টা করে গৌরী জবাব দিলে, 'বিশেষ না!'

আমি ঠিক কি জানতে চাইছি তা বুঝেই কথাটা এড়িয়ে গেল।

দালানের একপাশে খাবার জায়গা হয়েছিল, সেইখানে গিয়ে বসলুম। আয়োজন সামান্য, কিন্তু সমস্ত টুকুর মধ্যে আন্তরিক যত্নের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

পাতের কাছে বসলুম বটে কিন্তু মন আহারে সাড়া দিলে না। যা আমার হ'তে পারত, অবেলায় যাকে হারিয়েছি, তারই মূল্য জীবনের মধ্যাহ্নে নূতন করে চোখে পড়ে মনকে পীড়িত করছে, কিন্তু সে কথা

কি করে প্রকাশ করব, কেমন করে জানাব সেই ব্যর্থতার বেদনা? পৃথিবীতে এক সময় আশ্চর্যভাবে এই যে জ্যোতির্ময়ী রমণীর জন্ম হয়েছিল, তা কি শুধু শোচনীয়ভাবে লোক চক্ষুর অগোচরে অন্তরে-বাইরে শুকিয়ে মরবার জন্য?

খেতে যে আমি পারছি না তা গৌরী লক্ষ্য করছিল, কিছুক্ষণ পরে বললে 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি! কিন্তু নিজের হাতে রেঁধে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়াবার বা তাঁদের সেবা করার সাধ তো কোন দিনই মেটে নি, আজ জীবনে এই একটি দিন যদি সে সুযোগ পেয়ে থাকি তো তাকে নষ্ট করবেন না! আমার এই একটু খানি সেবা করার সাধকে সার্থক হ'তে দিন।'

সুতরাং জোর করে খেতে হ'ল। আহার্য পেটের মধ্যে গিয়ে যেন পাষাণ হয়ে উঠেছে, তবুও খাচ্ছি। অন্যমনস্ক হয়ে বসে খেয়ে গেলাম, আমার সমস্ত মন তখন মাথা খুঁড়ছে কথা খুঁজে। কি বলব এই মেয়েটিকে, কি সান্ত্বনা দেব, কোন্ পথ দেখাব! বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি এই দেহ, কতদিনের অনশনে এমন করে শুকিয়ে উঠেছে তা কে জানে—কিন্তু কি উপায়? কিছুতেই এর দুঃখ লাঘব করার কোন উপায় চোখে পড়ল না।

নীরবে আহার শেষ করে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমারই বিছানাটি ইতিমধ্যে গৌরী কখন এ ঘরের চৌকীটার ওপর পরিপাটি করে বিছিয়ে রেখে ছিল, তারই প্রলোভন সামলাতে না পেরে একটু পরে শুয়ে পড়লুম, গৌরীও ততক্ষণে সব আলো নিভিয়ে বোধ হয় শুয়ে পড়েছে বলে বোধ হ'ল।

খানিকটা বিছানায় শুয়ে ছটফট্ করে উঠে পড়লুম। ঘুম অসম্ভব, শুধু শুয়ে থাকা মনের এই অবস্থাতে আরও অসম্ভব হওয়ায় উঠে আস্তে আস্তে দোর খুলে একেবারে বাইরে বেড়িয়ে পড়লুম। কিন্তু বাইরে পা দিয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেলুম, খানিকটা দূরে বাগানে মাটির ওপরই স্থির হয়ে বসে রয়েছে একটী রমণী, এবং সে যে গৌরী তা

নক্ষত্রের অস্পষ্ট আলোতেও নিঃসংশয়ে অনুভব করতে পারলুম ! কাছে এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ডাকলুম, 'গৌরী !'

সে পিছনের দিকে না চেয়েই জবাব দিল, 'এসেছ ? এই খানেই বাস। তুমি যে ঘুমোতে পারবে না তা আমি জানতুম।'

তার এই নিঃসঙ্কোচ সম্বোধনে, স্নেহের সম্পর্কের এই 'তুমি'তে সমস্ত মনটা আর একবার যেন আকুল হয়ে দুলে উঠল। কিন্তু কোন কথাই বলতে পারলুম না, শুধু তার পাশে বসে পড়লুম।

সে পূর্ব কথার জের টেনে বলে চলল, কিন্তু কেন মিছে আমার জন্যে ভেবে কষ্ট পাচ্ছ ! আমার আর কোন উপায়ই নেই।

আমি জোর করে মনের আবেগকে চেপে যথাসম্ভব সহজ গলাতেই বললুম, 'তোমার বাপের বাড়ীতে কি কেউ নেই ?'

সে একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, 'বাবা আছেন, দাদাও আছেন, কিন্তু সেখানে গিয়ে থাকার কোন উপায় নেই। উনি ছাড়বেন না, আর জোর করে রেখে দেওয়ার মত অবস্থাও তাদের নয়। হপ্তায় দু'দিন করে উপোস করে থাকতে হয় তাদের।'

আমি চুপ করে রইলুম। কি আর বলব এর পর ?

সেও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'কি ভাবছিলাম জানো ? সেই প্রথম দিন মেয়ে দেখতে যাওয়ার কথা। তোমরা তিনজনে গিয়েছিলে মনে আছে ? ··· দেখা দিতে এসে লজ্জায় ভাল করে চেয়ে দেখতে পারিনি কিন্তু তারপর তোমরা যখন চলে এস, তখন জানালার আড়াল থেকে দেখেছিলুম, আমার ছোট বোন তোমাকেই ভুল করে দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল ঐ তোর বর ! আমি তাই জানতুম ; বিয়ের সময় ওকে দেখে চমকে উঠেছিলুম। ··· এ সব সামান্য কথা, তোমরা জান না, সেদিনের কথা হয়তো মনেও নেই—কিন্তু আমি একটি কথাও ভুলি নি।'

মনে যে কি আছে, তা কেমন করে জানাব ! সেদিনের প্রতিটি কথা বুকে আজও গাঁথা আছে—

অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপ করেই বসে রইলুম। তারপর যে কথাটা

সংশয় ও সঙ্কোচের মধ্যে মনে দেখা দিচ্ছিল সেই কথাটাই বলে ফেললুম 'গৌরী, আমি যদি তোমাকে নিয়ে যেতে চাই তো যাবে ?'

অকস্মাৎ সে যেন পাগল হয়ে উঠল, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আমার দুটো হাত ধরে বললে 'যাবে ? আমাকে নিয়ে যাবে ? এখান থেকে অনেক দূরে আমাকে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারবে ? আমাকে ভালবাসতে পারবে ?'

আমিও সজোরে তার হাত-দুটি চেপে ধরে বললুম, 'পারব গৌরী আমার ভালবাসা দিয়ে তোমার মনের সমস্ত শূন্যতা ভরিয়ে দিতে পারব ! চল আজই, এখনই আমরা চলে যাই—'

সে আর কোন কথা বললে না, কেমন যেন স্বপ্নাবিষ্টের মতো আর একদিকে চেয়ে বসে রইল। কিন্তু আমার মুঠোর মধ্যে তার ফুলের মতো নরম হাত দু'টি ধরা ছিল, তারই স্পর্শে বুঝতে পারলুম যে সমস্ত দেহ তার কাঁপছে, থর থর করে—

খানিকটা পরে আমি বললুম, 'গৌরী, প্রথম দিনের কথা বলছিলে ' জানো যে তারপর থেকে একটি মুহূর্তের জন্যও তুমি আমার মন থেকে দূরে যাও নি ? প্রতিদিন রাত্রে শোবার আগে শেষ ভেবেছি তোমার কথা, আবার সকালে উঠে প্রথম মনে পড়েছে তোমাকে। তোমার জন্য সমস্ত মন মরুভূমি হয়ে আছে গৌরী, এ তুমি বিশ্বাস করো !'

ঘুম ভেঙে চমকে ওঠার মতো আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ সে বললে 'না, না, সে হয় না। আমি যাব না—'

আকুল হয়ে প্রশ্ন করলুম, 'কেন গৌরী ?'

সে বললে, 'আবার যদি তুমি আমাকে ঠকাও, যদি নিয়ে গিয়ে ভাল না বাসো ? না, না—সে আমি সইতে পারব না—'

আমি বললুম, 'কি বলছ তুমি, তোমাকে পেলে আমার সমস্ত জীবন সার্থক হয়ে উঠবে, ধন্য হবে। আমি তোমাকে ভালবাসব না ?'

সে ঘাড় নেড়ে বললে, না, আমি শুনেছি এরকম ভালবাসায় লোকে সুখী হতে পারে না—আর তাহলে ওঁর ধারণাটাই যে সত্য হবে ! সে আমি কিছুতেই হতে দেব না। আমায় আজীবন দুঃ

দিয়ে ওঁর কথা মিথ্যা প্রমাণ করে যাব। তুমি যাও, ওগো তুমি যাও আজ যেটুকু জানতে পারলুম, এই আমার ঢের, আর কিছু চাই না।

আমি ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলুম, গৌরী, গৌরী, জীবনের সার্থকতা হাতের মধ্যে তুলে দিয়ে এমন করে কেড়ে নিও না—

সে বললে, সার্থকতা! তুমি যে আমাকে আজও নিয়ে যেতে চাও, আমার অভাবে তোমার মন আজও শূন্য হয়ে আছে—এইত আমার যথেষ্ট পাওয়া হ'ল! এই কথাটুকু থাক্ আমার বুক ভরে, আমার দুর্ভাগ্য দিয়ে তোমার জীবনকে বিড়ম্বিত করতে চাই না—না, তুমি যাও, যাও—

সে অকস্মাৎ একরকম ছুটেই পালিয়ে গেল। আমি বাধা দিতে পারলুম না, শুধু মনে হ'ল আর একবার অসহ্য একটা শূন্যতা গ্রাস করতে আসছে।

সারারাত পাগলের মত ছোটাছুটি করে ভোর বেলায় যখন ফিরে এলুম তখন দেখলুম বিছানার ওপর এক টুকরো কাগজে চিঠি! গৌরীর লেখা এর আগে চোখে দেখিনি, কিন্তু চিঠির ভাষাতেই বুঝলুম এ তারই। তাতে যা লেখা ছিল, তার অর্থ কতকটা এই—

তুমি যে প্রস্তাব করেছ তা আমার পক্ষে যতই প্রলোভনের হোক্ —তা তোমার করুণা থেকে এসেছে। সুতরাং তা লজ্জার। তুমি এখন যাও, কিছুদিন পরেও যদি আমার কথা মনে থাকে ত আবার এস। সেইদিন ভেবে দেখব, কিন্তু আজ আর দেরী করো না। মানুষের মন বড় দুর্ব্বল।

অত্যন্ত আঁকাবাকা হাতের লেখা, বিস্তর বানান ভুল। কিন্তু তবু সেই কাগজের টুকরোটি আমার কাছে জীবনের সার্থকতার আশা বয়ে এনেছে, আমার কাছে তা পরম মূল্যবান। সযত্নে আমি কাগজটিকে বুক পকেটে রেখে দিলুম এবং তখনই আমার সামান্য মালপত্র নিজেই বয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। এ তার আদেশ, যার প্রসন্নতার জন্য কোনও সাধনা করবার অধিকার আমি কোনদিন লাভ করব এ আশা

ছিল আমার স্বপ্নেরও বাইরে। সুতরাং এ আদেশ আমি পালন করবই. তা সে যত কঠিন হোক্—

এর পর মাস খানেক কাটল আমার রঙীন-স্বপ্নে। গৌরী ছিল আমার কাছে দুরাশা হয়ে, সুতারাং তাকে নিয়ে স্বপ্ন-জাল বোনবার সৌভাগ্য আমার কোন দিন হয় নি, শুধু তাকে মনে ক'রে নিবিড় নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস পড়ত মাত্র। আজ সেই দুর্লভ অবসর আমার উপস্থিত, সেই অচিন্তিত সৌভাগ্য! দিনরাত তার কথা ভাবতে ভাবতে প্রায় পাগল হয়ে উঠলুম যখন, তখন আর অপেক্ষা করতে না পেরে আবার একদিন বর্ধমানের পথে বেরিয়ে পড়লুম, অনেক আশা এবং অনেক আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে। কিন্তু সামনে এসে বাড়ির অবস্থা দেখেই বুঝলুম আশঙ্কাই আমার অদৃষ্টে সত্য হ'ল। দোর-জানলা হাঁ-হাঁ করছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। ঠিক এ ব্যাপারটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না বোধ হয়, আঘাতটা বুকের মধ্যে নিদারুণ ভাবে লেগে কিছুকালের জন্য আমাকে বড়, বিমূঢ় ক'রে দিল। আমি আড়ষ্ট হয়ে মিনিট কয়েক মাঠেরই মধ্যে বসে রইলুম। জীবনের সমস্ত আশা-আনন্দের আলো এক নিমেষে চোখের সামনে নিভে গেলে যে অবস্থা হয়—আমারও তখন সেই অবস্থা।

অনেকক্ষণ পরে উঠে গ্রামের লোকের দোরে দোরে ঘুরে সংবাদ যা পাওয়া গেল তাতে জানতে পারলুম যে, আমি যেদিন গিয়েছিলুম তার পরের দিনই ওরা কোথায় চলে গেছে; একেবারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাস! বহু খোঁজাখুঁজি করলুম কিন্তু কেউ কোন সংবাদ দিতে পারলে না। সেখান থেকে ফিরে সেই দিনই বাসুদেবের দেশে গেলাম, তারপর তার আত্মীয় স্বজনদের কাছে। সকলেই সেই এক জবাব দিলে,—তার কোন খবরই রাখি না।

দিনকতক দুঃখ অসহ্য বোধ হ'ল—দেশ-বিদেশে ছোটাছুটি ক'রে বেড়ালুম তারপর, সব দুঃখই একদিন না একদিন সয়ে যায়, সুতরাং আমার এ দুঃখও সয়ে গেল। আবার দৈনন্দিন জীবন শুরু হ'ল

নিয়মিত ভাবেই—শুধু বুকের একটা দিক, যৌবন ও বসন্তের দিক, কামনা ও আশার দিকটা চিরকালের মত পাথর হয়ে গেল।

এর পাঁচ বছর পরে আবার গৌরীর দেখা পেলাম।

মণিকর্ণিকার ঘাটে সন্ধ্যাবেলায় বেড়াতে গিয়েছিলাম, এমনিই। তখনও গোদূলির আলো একেবারে ম্লান হয় নি, সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে, সময়টা এইরকম। শ্মশান থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে একটা জ্বলন্ত চিতার দিকে চেয়ে আছি, সহসা নজরে পড়ল শতছিন্ন মলিন কাপড় পরা একটি রমণী, দেখলে পাগলী ব'লেই মনে হয়, হেঁট হয়ে পুরোণো চিতার ছাইয়ের মধ্যে থেকে কি যেন খুঁজছে—

এক মুহূর্ত মাত্র! কিন্তু দৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই মনের মধ্যে অকারণে যেন একটা দোলা লাগল, মনে হ'ল বিস্মৃতলোকের কোন্ একটি মানুষের সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য আছে। তারপরই চিনতে পারলুম। মাথার চুল ধূলোয় বালিতে জট্ পাকিয়ে গেছে, গায়ের রং রোদে ও ময়লায় কালো, কিন্তু তবুও কি তাকে চিনতে বিলম্ব হয়? এ যে গৌরী! আমার আশা-নিরাশার ধন!

•

কয়েক-মুহূর্ত কী জন্য যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম, কী যে ভাবলুম তা মনে নেই—পরক্ষণেই ছুটে কাছে গিয়ে ডাকলুম, গৌরী, এ কি করছ? এ কি বেশ!

সে চম্‌কে মুখ তুলে চাইলে, কিন্তু দৃষ্টির বিহ্বলতা দেখে বুঝলুম যে সে আমাকে চিনতে পারেনি। খুব সম্ভব আর পারবেও না।

আমি বললুম, গৌরী আমাকে চিনতে পারছ না? আমি!

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শান্তভাবেই বললে, না।

তারপর আবার হেঁট হ'ল।

আমি তার হাতটা ধ'রে বললুম, কি খুঁজছ গৌরী?

সে মাথা না তুলেই জবাব দিলে, তার অস্থি!···শুনেছি সে আত্মহত্যা করেছে, শুনেছি তাকে এইখানে পোড়ান হয়েছে, কিন্তু অস্থি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। অনেক দিন ধরে খুঁজছি।

সমস্ত বুক আমার বেদনার মুগুরে যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। তবুও আমি জোর ক'রে তার হাত-দুটো ধরে তাকে তুলে জিজ্ঞাসা করলুম, কার অস্থি খুঁজছ গৌরী, কার কথা বলছ ?

সে নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল, ওঁর কথা, আমার স্বামীর কথা বলছি। তাঁর অস্থি না পেলে যে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। নিশ্চিন্ত না হয়ে আমি কি ক'রে তাঁর কাছে যাব ?

কার কাছে যাবে গৌরী, কে সে ?

সে যেন অসহিষ্ণু হয়ে বললে, জানো না ? সোমেশের কাছে যাব। উনি বলেছিলেন যে 'আমার জীবন থাকতে আর তার দেখা পাবে না'—তাই খুঁজছি আমি তাঁর অস্থি। আর যে অপেক্ষা করতে পারছি না। আমাকে যেতেই হবে।

আর্তকণ্ঠে বললুম, গৌরী, আমাকে তবু চিনতে পারলে না? আমিই যে সোমেশ। তুমি ভাল ক'রে চাও, আমার দিকে তাকিয়ে দেখ—আমি তোমাকে এতকাল পরে খুঁজে পেয়েছি !

সে যেন নিমেষের জন্য ব্যাকুল হয়ে চাইলে আমার দিকে, তারপরই মাথা নেড়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললে, না, তুমি সোমেশ নও, আমাকে ঠকাচ্ছ। উনি বুঝি পাঠিয়েছেন তোমাকে, আমায় ধরে নিয়ে যাবার জন্যে ? কিন্তু আর আমি কিছুতেই যাব না—

তারপর আমি কোন রকম বাধা দেবার আগেই সে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে পালিয়ে গেল। ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে মুহূর্ত-মধ্যেই কোন গলির ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল !

শ্মশানের একটি মুদ্দফরাস হেসে বললে, বাবু কি পাগলীকে চিনতেন ?

আমি বললুম হ্যা। ওকে চেনো তুমি ?

সে বললে, ও তো প্রায়ই এখানে আসে। এসে ঐ ছাই আর কয়লা ঘেঁটে বেড়ায়। ও কি আপনার কেউ হ'ত বাবু ?

আমি তার কথার জবাব না দিয়েই জলের ধারে এসে দাঁড়ালাম।

ওপারে আবার চড়ায় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তারই কালিমা পৃথিবীর বুক থেকে যেন শেষ আলোটুকুও কেড়ে নিতে চায়!

সেই দিনই রাত্রের ট্রেনেই কাশী ত্যাগ করলুম।



বিমল কর

বিচিত্র প্রেম

দিন চারেক হল অতুল বাড়ি ছাড়া। পাড়া ছেড়েই পালিয়ে এসেছে। যে-রকম কেচ্ছা হয়ে গেল বাড়িতে তারপর কোনো ভদ্রলোকই আর মুখ দেখাতে পারে না। অতুলও মুখ দেখাচ্ছে না। অবশ্য এই মুখ আর দেখার মতনও নেই, চারদিনেই চুপসে গেছে, গালে দাড়ি জমেছে বিস্তর, চোখে হলুদ হলুদ ছোপ ধরেছে, মাথার চুলে জটের গন্ধ। তবু এই মুখই একজনকে অন্তত না দেখালেই নয় বলে



অতুল রেল স্টেশনের ডাউন প্লাটফর্মের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে বসে আছে।

এখন এদিকে কোনো গাড়িটাড়ি নেই। কখনো সখনো দু' একটা মালগাড়ি যাচ্ছে। যাক। অতুল প্লাটফর্মের কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় গোল করে বাঁধানো সিমেন্টের বেদীতে বসে। বসে বসে বিকেলের আকাশ দেখছে উদাস চোখে, মাঠঘাট নজর করছে বিষণ্ণভাবে, লম্বা

লম্বা নিঃশ্বাস ফেলছে, সিগারেট টানছে ঘন ঘন। আর থেকে থেকে দূরে ওভারব্রিজের দিকটা লক্ষ্য করছে।

অতুলের অপেক্ষার অবসান হল আরও খানিকটা পরে, বিকেলের আলো যখন মাঠঘাট ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়েছে এবং ক্রমশই ফিকে হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে—তখন।

প্রীতি কাছাকাছি আসতেই অতুল আবার বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল প্রীতিকে। অতুলের মতন লণ্ডভণ্ড চেহারা নয়, মোটামুটি ফিটফাট। ছাপা শাড়ি, কলাপাতা রঙের ব্লাউজ, চোখমুখ পরিষ্কার। বাঃ, বেশ! তোফা আরামে আছ মাইরি! সত্যি, মেয়েরা একটা জিনিস। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, তারপরও যেমন কে তেমন, মুখে পাউডার মাখতেও ভোলে নি। অতুলের রীতিমত অভিমান হল, কিংবা হয়তো ক্ষুব্ধই হল সে।

প্রীতি এসে সামনে দাঁড়াল। নজর করে দেখতে লাগল অতুলকে। তারপর একটা 'ইস্' শব্দ করল, দুঃখে না বিরক্তিতে বোঝা মুশকিল।

অতুল বলল, "যাক্, তা হলে এসেছ? আমি ভাবছিলাম, আসবে না।" ক্ষোভের গলাতেই বলল অতুল।

প্রীতি বলল, "বাঃ, কাজকর্ম সেরে আসব না! তা ছাড়া আমি খবরই পেলাম দুপুরে। যোগেন গিয়ে বলল, তুমি স্টেশনের প্লাটফর্মে দেখা করতে বলেছ! এত জায়গা থাকতে এই প্লাটফর্ম তোমার মাথায় এল কেন জানি না, বাবা! বাড়ি থেকে কম দূর?"

অতুল গম্ভীর মুখে বলল, "প্লাটফর্মই ভাল। অনেক মালগাড়ি যাচ্ছে। দু পা এগিয়ে গলাটা বাড়িয়ে দিলেই চলবে।"

প্রীতি টেরা চোখ করে কটাক্ষ হানল। বলল, "আহা কী কথা রে!"

অতুল একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। প্রীতি ততক্ষণে পাশে বসেছে।

"তোমার মার খবর কী?" অতুল জিজ্ঞেস করল।

"মা ভাল হয়ে গেছে। তবে বেশ গম্ভীর। কথাবার্তা বেশী বলে না।"

অতুল একটু চুপ করে থেকে বলল, "কেরাসিন তেলের এফেক্ট। বোধ হয় এখনও স্টমাক থেকে তেলের গন্ধ উঠছে।"

প্রীতি আড় চোখে দেখল অতুলকে। বলল, "তোমার বাবার খবর রাখ?"

"শুনেছি ভাল আছে।"

"শুধু ভাল কেন, সেই বুড়ো তো লাফ মেরে মেরে নাচছে.. বগল বাজাচ্ছে।"

অতুল ঘাড় ফিরিয়ে প্রীতির দিকে তাকাল। শ্লেষের গলায় বলল, "কথাগুলো কে শিখিয়ে দিয়েছে? তোমার মা?"

প্রীতির মাথা গরম হয়ে উঠল। "আমার মা যা শিখিয়েছে তোমার বাবা তোমাকে তার চেয়েও বেশী শিখিয়েছে।"

অতুল সিগারেটের টুকরোটা রাগের মাথায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। "আমার বাবা সম্পর্কে একটা রেসপেক্ট আমি তোমার কাছে আশা করি। নিজের শ্বশুর সম্পর্কে তোমার যে সব কথাবার্তা, বুড়ো লাফ মেরে মেরে নাচছে, বগল বাজাচ্ছে···ছি ছি···এসব কথা কানেও শোনা যায় না।"

প্রীতি বাঁ হাতটা মুঠো করে বুড়ো আঙুল দেখাল। "তোমার বাবা আমার শ্বশুর? বয়ে গেছে আমার। তোমার বাবা আমার ইয়ে—" বলে বুড়ো আঙুল নাড়াতে লাগল।

অতুল একেবারে থ'। কান কপাল গরম হয়ে উঠতে লাগল। সামান্য তোতলানো জিবে অতুল বলল, "আমার বাবা তোমার শ্বশুর নয়?"

"না।"

"অফিসিয়ালি নয়, কিন্তু আন্-অফিসিয়ালি তো বটে।"

"মোটেই নয়। অমন লোককে আমি শ্বশুর করব না। একটা

সত্তর বছরের বুড়ো—দুটো ঘুমের বড়ি খেয়ে ন্যাকামি করে বাড়ি মাথায় করল—ওই লোককে আমি শ্বশুর করব। কখখনো নয়।"

অতুল বেশ চটে গিয়েছিল, কিন্তু অবস্থাটা যা তাতে পুরোপুরি ঝগড়া করাও যায় না। সে তো মেয়ে নয়, পুরুষ। তার খানিকটা সংযম ও কাণ্ডজ্ঞান থাকা দরকার। অতুল বলল, "আমার বাবা সম্পর্কে তুমি যা-তা বলছ! সত্তর বছরের বুড়ো আমার বাবা নয়। সিক্সটি ফাইভ সিক্স হবে। ন্যাকামি করার জন্যে কেউ স্লিপিং ট্যাবলেট খায় না..."

"ভীমরতি হলে খায়," প্রীতি বেঁকা গলায় বলল।

"তোমার মা-ও কেরাসিন তেল খেয়েছিল," পাল্টা ঠোক্কর দিল অতুল, "তোমার মা কচি খুকি নয়। বয়সটাও ষাটের কাছাকাছি। আমিও বলতে পারি তোমার মা ন্যাকামি করে কেরাসিন তেল খেয়েছিল।"

প্রীতি রুক্ষ গলায় বলল, "আমার মাকে তুমি ছেড়ে কথা বলছ নাকি? প্রথম থেকেই তো যা তা বলছ!...তুমি বলো নি, মার স্টমাক থেকে এখনও কেরাসিন তেলের গন্ধ উঠছে?"

অতুল আর এগুলো না; হল্ট মেরে গেল। চেঁচামেচি, ঝগড়া বচসা করে লাভ হবে না। অতুল বলল, 'সরি! আমার অন্যায় হয়েছে! আসলে আমার মাথার ঠিক নেই। কটা দিন যা যাচ্ছে! কিন্তু তুমি এটা বুঝে দেখো, তোমার মা যদি আগে কেরাসিন তেল না খেত—আমার বাবা স্লিপিং ট্যাবলেট খেত না। এই কেলেঙ্কারীর শুরু তোমার মা করেছে, আমার বাবা নয়।"

প্রীতি পিছিয়ে যাবার পাত্রী নয়। বলল, "আমার মা কেরাসিন খেয়েছিল তোমার বাবার জন্যে। তোমার বাবা দোতলার খোলা বারান্দায় এসে আমার মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে গালাগাল দিত। বলত, ছেলেচোর, ডাইনী সর্বনাশিনী, আমার মার জিভ নাকি মা কালীর মতন লকলক করছে। এ-সব কথা শুনলে কার মাথার ঠিক থাকে! আমার মা ছেলেচোর? তুমি কোন্ রাজপুত্তুর যে তোমাদের ওই ধাড়-

খেড়ে দেড়খানা বাড়ির লোভে তোমায় চুরি করবে! নিজেকে তুমি রাজপুত্তুর ভাব নাকি? বেঁটে বাঁটকুল চেহারা, বিদ্যে তো বি. কম. চাকরি করো ব্যাঙ্কে—কেরানীর। তোমার মতন রাজপুত্তুর এ-শহরে গড়াগড়ি যাচ্ছে। বেশী কথা বলো না।"

অতুল একেবারে স্তম্ভিত হয়ে প্রীতির দিকে তাকিয়ে থাকল। এ মেয়ে না রক্ষেকালী? জিবটা শান দিয়ে এসেছে নাকি প্রীতি? এতটা দেমাকই বা কিসের? তুমি কোথাকার রাজকুমারী গো? হাইট্ তো পাঁচ এক, মোটা হিলের জুতো পরলে ইঞ্চিখানেক বাড়ে। গায়ের রঙটা একরকম ফরসা, তা বলে তুমি সোনার বরণ নও। চ্যাপটা-ধ্যাবড়া চেহারা, ভোঁতা নাক, ছোট কপাল, খরখরে চোখ। নিজের চেহারাটা আয়নায় গিয়ে দেখো না সখি, দেমাক ভেঙে যাবে। লেখা পড়াতেই বা কী? কোনো রকমে টুকেমুখে বি.এ.-টা পাস করেছ।

অতুল মুখ ফিরিয়ে রেল লাইনের দিকে তাকাল। যেন এখন একটা মালগাড়ি থামলে সে বোধহয় ঝাঁপ মেরে বসত।

একটু চুপচাপ। শেষ আলোটুকুও কখন আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। মাসটা ভাদ্র। হয়ত শেষাশেষি। গাছপালা মাটির ভেজা-ভেজা গন্ধের সঙ্গে শরতের হাওয়া মিশে রয়েছে। আর সামান্য পরেই ঝাপসা অন্ধকার নামবে।

অতুলের বুকের মধ্যে মোচড় মারতে লাগল। একেই বলে জগৎ। সেই কবে—টুনি—যার কিনা, পোষাকী নাম প্রীতি—সেই টুনির সঙ্গে তার সম্পর্ক। টুনি যখন ইজের পরত আর হরদম ইজেরের দড়িতে গিঁট লাগাত, গায়ে থাকত পেনি ফ্রক, মাথায় বব চুল—তখন থেকে টুনির সঙ্গে অতুলের গলাগলি সম্পর্ক। কতদিন টুনি অতুলকে দিয়ে ইজেরের দড়ির গিঁট খুলিয়ে নিয়েছে। সে-সব দিনে টুনি যত ছেলেমানুষ ছিল অতুল অতটা ছিল না—টুনি পাঁচ, অতুল দশ—বছর পাঁচেকের ছোট বড়। সেই টুনি এখন একুশ, অতুল ছাব্বিশ। এত বছরের ভাব ভালবাসার পর টুনি আজ বলল, তুমি কোথাকার রাজ-

পুত্তুর গো, ওই তো বেঁটে বাঁটকুল চেহারা, বিদ্যেতে বি. কম. ব্যাঙ্কের কেরানী .. !

অতুল ডান হাতটা মাথার চুলে চিরুনির মতন করে চালিয়ে দিল। বুক হুহু করছে, এবং মনে হচ্ছে অসাড় রেল লাইনের মতন তার হৃদয়-টৃদয়ও কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। গলার কাছটায় ফুলে উঠল অতুলের। কিন্তু এই রকমই হয়, এই তো জগৎ, সংসার, প্রেম, ভালবাসা।

অতুল বেশ শব্দ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তারপর বলল "তাহলে আর কী ! আমি যখন রাজপুত্তুর নই তখন এইখানে একটা শেষটেষ হয়ে যাক।"

প্রীতি এই সন্ধের মুখে কয়েকটা বককে সোঁ সোঁ করে উড়ে যেতে দেখছিল ! এবং টেরা চোখে অতুলকেও। বলল, "করো না শেষটেষ, আমার কী !"

অতুল মুখ উঁচু করে ওপারের প্লাটফর্মের দিকে তাকাল। বলল, "একুশটা বছর আমার নষ্ট হল। ওয়েস্ট·····।"

'একুশ কেন ?'

"তোমার পাঁচ ছ বছর থেকে ধরছি। আজ আমার ছাব্বিশ !"

"তুমি তোমার খুশি মতন ধরবে ? আমার যখন পাঁচ-টাঁচ তখন আমি এখানে থাকতাম নাকি ? মার সঙ্গে মামার বাড়িতে আসতাম টাসতাম। আমি এখানে রয়েছি পাকাপাকিভাবে চোদ্দ পনেরো থেকে।" বলে প্রীতি পিঠের বিনুনি বুকের ওপর টেনে নিল। বিনুনি নিয়ে কারুকর্ম করতে করতে বলল, "একুশ থেকে দশ বাদ দাও। তা হলে থাকছে এগারো। এগারো বছরের সম্পর্ক বলতে পার। ··"

অতুল যদি পুরুষ মানুষ না হত হয়ত কেঁদে ফেলত। মেয়েরা কি এই রকম নিষ্ঠুর হয় ? ফ্রেইলিটি না ক্রুয়েলিটি কোন্‌টা মেয়েদের ঠিক ঠিক ভূষণ ! কথার জবাব দিল না অতুল। আবার একটা সিগারেট ধরাল। টুনি যা বলেছে সেটা কোনো হিসেবই নয়। টুনি তো জন্মেছেই এখানে। তবু অতুল জন্মকাল থেকে ধরছে না। টুনির

বাবা কাতরাসগড়ের লোক। সেখানেই থাকত টুনিরা। এখানে টুনির মামার বাড়ি। অতুলদের বাড়ির পাশের বাড়িটাই টুনুর মামার বাড়ি ছিল। টুনির মাকে বরাবর পিসীমা বলে এসেছে অতুলরা। সেই পিসীমার বিয়েও দেখেছে অতুল—কিন্তু মনে নেই। টুনির জন্মও মনে পড়ে না; কেননা অতুল তখন খুবই বাচ্চা ছিল। কিন্তু যখন থেকে মনে আছে তখন থেকে বাদ দেবে কেন? অতুল কি বলেছে, টুনিরা এখানে বরাবর থাকত? না, অতুল সে-কথা বলছে না। অতুল বলছে, ওই পাঁচ-টাঁচ থেকে—টুনির যখন পাঁচ অতুলের বছর দশ বয়েস—তখন থেকে সব তার মনে আছে। টুনি পিসীমার সঙ্গে মামার বাড়িতে আসত যেত, মাঝে মাঝেই আসত, ছুটি ছাটায় থাকত, আবার ফিরে যেত। একেবারে পাকাপাকিভাবে অবশ্য এল টুনির বাবা মারা যাবার পর। এখানের বাড়িতে ছিল টুনির দিদিমা। তিনি আগেই মারা গিয়েছিলেন, টুনির মামা তখন বেঁচে, মামী মারা গেছেন, ছেলে-পুলেও নেই, কাজেই পিসীমা আর টুনির বরাবরের জায়গা হয়ে গেল এ-বাড়িতে। সেই মামা—তিনিও বছর দুই হল মারা গেছেন। এখন টুনিরাই এ-বাড়ির মালিক। বাড়িতে লোকজনও কম। নীচে এক ঘর ভাড়াটে আছে, ওপর তলায় থাকে টুনিরা।

সিগারেটে পর পর কয়েকটা টান মেরে অতুল বিমর্ষ গলায় বলল, "হিসেবটাকে তুমি আরও ছোট করতে পার, আমি পারি না। মেয়েরা বরাবর কৃপণ। আমি তোমার মতন কিপ্টে হতে পারব না।"

প্রীতি ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, "ছেলেরা হিসেব বাড়াতে পারে, তিলকে তাল করে—আমি তোমার মতন হিসেব বাড়াতে পারব না।"

"পেরো না।"

"পারব না। এগারো বছর ধরতে পারি।"

"ও-কে। সেই এগারো বছরের রিলেসান আজ শেষ হোক।"

"হোক। আমার কোনো আপত্তি নেই।"

"জানি-জানি। আমি তো রাজপুত্তুর নই। বেঁটে বাঁটকুল চেহারা,

ব্যাঙ্কের কেরাণী, বি কম। তুমি তো রাজকন্যে। হাঁটলে পায়ের নোখ থেকে ইয়ে ঝরে পড়ে।"

প্রীতি কনুই দিয়ে খোঁচা মারল অতুলকে। অতুল কাতরে উঠল।

প্রীতি বলল, "চ্যাটাং চ্যাটাং কথা যদি বলবে, টিপপিনি কাটবে—তোমায় আমি শেষ করে দেব।"

"আমি কিছু অন্যায় বলি নি।"

"ন্যায় বলেছ ?"

"হ্যাঁ।"

প্রীতি দু মুহূর্ত তাকিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। "তা হলে চলি।"

অতুল থতমত খেয়ে গেল। প্রীতি এইভাবে উঠে দাঁড়াবে সে ভাবতে পারে নি। বলল, "আমি তোমায় যেতে বলি নি।"

"তা হলে ন্যাকামি করছ কেন ?

অতুল আর কথা বাড়াতে ভরসা পাচ্ছিল না। বলল, "তোমার সঙ্গে কথা ছিল।"

"বলো।"

"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় নাকি! বসো।"

"চাঅলা ডাকো।"

"এখানে চাঅলা কই ?"

"ওদিকের প্লাটফর্মে আছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকো।"

অগত্যা অতুলকে উঠতে হল, ওভার ব্রিজের দিকে হেঁটে গেল খানিকটা। হাঁক পাড়ল বার কয়েক। টি স্টলের কেউ এদিকে আসবে মনে হল না। অতুলকেই লাফ মেরে রেল লাইনে নামতে হল, তারপর ওদিককার প্লাটফর্মে উঠে পড়ল।

চা এনে প্রীতির হাতে দিচ্ছে যখন অতুল—তখন অন্ধকার হয়ে গেছে।

প্রীতি বসল না। পায়চারি করতে লাগল প্লাটফর্মে। পাশে পাশে অতুলও। অতি মনোরম হাওয়া দিয়েছে তখন। তারা ফুটতে

শুরু করেছে। প্রীতি হাওয়ায় আঁচল উড়িয়ে পায়চারি করতে, করতে গুন্‌গুন্‌ করছিল।

অতুল বলল, 'তুমি এত ফুর্তি পাচ্ছ কেমন করে আমি বুঝতে পারছি না।'

"একটা সিগারেট দাও না?"—

"সিগারেট?"

"আরও ফুর্তি দেখাব।"

অতুল অবাক। এক আধবার সে নিজেই টুনির মুখে নিজের সিগারেট ঠেকিয়ে দিয়ে টানতে বলেছে, কেননা টুনি সিগারেটটা ঠোঁটে টিপে রাখতে পারে না, জিব লাগিয়ে ভিজিয়ে দেয়। অতুল যখন সেই সিগারেটটা আবার টেনে নিয়ে নিজের মুখে ঠোঁটে চেপে ধরে—অন্যরকম একটা স্বাদ লাগে তার, বেশ চনমন করে মনটা। কিন্তু আজ হল কি টুনির? সিগারেট ফুঁকতে চাইছে।

"তোমার যতই ফুর্তি হোক, আমার হচ্ছে না", অতুল বলল, "আমি মরে আছি।"

"কেন?"

"কেন? তোমার মা —মানে পিসীমা খেল কেরাসিন তেল, আমার বাবা স্লিপিং ট্যাবলেট। পাড়ায় একটা কেচ্ছা হয়ে গেল। এ রকম কেলেঙ্কারী আর কখনও হয় নি। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। পাড়ায় গিয়ে মুখ দেখাব কেমন করে?"

"আমি তো দেখাচ্ছি।"

"তোমার···", অতুল কোনো রকমে সামলে নিল। বলতে যাচ্ছিল—তোমার দু কান কাটা। সামলে নিয়ে বলল, "তোমার প্রচণ্ড সাহস। তা ছাড়া তুমি মেয়ে—যাবেই বা কোথায়! আমার মতন তো বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বন্ধুদের মেসে গিয়ে থাকতে পারবে না!"

"তুমি থাকছ কেন? কে বলেছে থাকতে?"

"বলাবলির দরকার করে না! যা কেচ্ছা হয়ে গেল—এরপর কোন্‌ ভদ্দরলোক বাড়িতে থাকতে পারে বলো—? আমার দাদাটি তো গিলে

খাচ্ছে আমায়, বউদি মুখ বেঁকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বসে আছে।" অতুল স্বখেদে বলল। টান মারল সিগারেটে, তারপর আবার বলল, "সমস্ত কেলেঙ্কারীটা আমাদের নিয়ে। শালা বিয়ে করব আমরা, প্রেম করব আমরা। এটা আমাদের বিজনেস। তোমাদের কী? তোমার মা—মানে পিসীমার রাগ করে কেরাসিন তেল খাওয়াই বা কেন, আর আমার বাবার স্লিপিং ট্যাবলেট গিলে মরতে যাওয়াই বা কেন? লোকে বলে না, বুড়ো বয়েসে ভীমরতি হয়, আমার বাবার তাই হয়েছে। এমনিতেই তো গলাবাজি করে সংসারটা কাঁপিয়ে রেখেছে তারপর ওই জেদ, জবরদস্তি। মরে মেতে ইচ্ছে করে ভাই।"

প্রীতি হেসে ফেলল।

অতুল বলল, "হেসো না, হাসার ব্যাপার এটা নয়। আমার বাবা একটি ওয়াণ্ডার। ছেলেকে জব্দ করতে কোনো বাপ ঘুমের ওষুধ খায়, শুনেছ?"

প্রীতি আরও জোরে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে নুয়ে গেল।

"হাসছ?" অতুল বলল।

"তোমায় জব্দ করতে না আমার মাকে জব্দ করতে?"

"পিসীমাকে জব্দ করতেও হতে পারে—তবে ওটা সেকেণ্ডারী। আমারটাই প্রাইমারী।"

প্রীতি অতুলের গায়ে ঠেলা মারল কাঁধ দিয়ে। বলল, "তুমি ঘোড়ার ডিম বুঝেছ! তোমার কোনো ব্যাপারই নেই।"

"নেই?"

"না, মশাই, তোমার কেসই এটা নয়। মাকে নিয়েই সব ঝঞ্ঝাট। মা রোজ রোজ তোমার বাবার—মানে মামার—এখন মামাই বলি—মামার হম্বিতম্বি, গালি-গালাজ, তড়পানি শুনতে শুনতে মনের দুঃখে কেরাসিন খেয়েছিল। পুরো বোতল খায় নি। আধ বোতল কি সিকি বোতল হতে পারে। আজকালকার কেরাসিনে যা জল, কতটুকু আর কেরাসিন পেটে গেছে—" বলতে বলতে প্রীতি ফট করে অতুলের

মুখ থেকে সিগারেটটা টেনে নিল। নিয়ে নিজেই বার দুই টানল। টেনে থুথু করে ছুঁড়ে ফেলে দিল প্লাটফর্মে।

অতুল ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকাল, কেউ যদি দেখে ফেলে। প্লাটফর্ম ফাঁকা।

অতুল বলল, "পিসীমা কেরাসিন তেল খেয়েছে শুনেই বাবার ঘুমের বড়ি খাবার জেদ চেপে উঠল বলছ?"

"তা আর বলতে!...তুমি কেবাসিন তেল খেয়ে আমায় জব্দ করবে ভাবছ, দাঁড়াও আমি ঘুমের ওষুধ খাব...এই আর কি।" প্রীতি হাসছিল।

অতুল মাথা চুলকে বলল, "আমার একটা ডাউট্ আছে। বাবা মাত্র দুটো বড়ি খেয়ে ইয়ে হবে কেমন করে ভাবল? ঘুমের ওষুধ পেলই বা কোথায়?"

প্রীতি বলল, "ঘুমের ওষুধ না কচু, সোডার ট্যাবলেট খেয়েছে—কে আর দেখতে গেছে?"

অতুল জোর করে অস্বীকার করতে পারল না।

প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তে পৌঁছে এবার ওরা ফিরতে লাগল।

অতুল বলল, "বাবার এ ছেলেমানুষীর কোনো মানে হয় না। সমস্ত বাড়ীতে একটা রই-রই পড়িয়ে দিল! পাড়াময় রটে গেল, জনার্দনবাবু ঘুমের ওষুধ খেয়ে মরতে গিয়েছিল। স্ক্যাণ্ডেল!"

"আমার মা-টিও ওই রকম; তবে তোমার বাবার মতন অতটা নয়।"

অতুল চুপ করে কয়েক পা হেঁটে এল। তারপর বলল, "দুজনের এই জেদাজিদি কেন আমি বুঝতে পারি না! কে কাকে জব্দ করবে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে নাকি?"

প্রীতি কিছুক্ষণ কথা বলল না, না বলে অতুলের বাঁ হাত নিজের ডান হাতে ধরে দোলাতে লাগল। যখন বেশ জোরে জোরে ওদের হাত দুলছিল—তখন আচমকা হেসে ফেলে প্রীতি বলল, "তুমি একেবারে কাঁচকলা। কিচ্ছু বোঝ না।"

"বুঝব কী! এর কিছু বোঝা যায় না।"

"যায়, মশাই, যায়।"

"কী যায়?"

"বলব?"

"বলো!"

"তোমার বাবা লোকটি আমার মার সঙ্গে যৌবন বয়েসে খুব "প্রেম করত।"

অতুল প্রীতির হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে প্রায় লাফ মেরে উঠল। বলল, "প্রেম—মানে বাবার ভাষায় প্রণয়।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রণয়। পাশাপাশি বাড়ীর ছেলেমেয়ে—ইয়ের বয়েস থেকেই প্রণয়।"

"যাঃ যাঃ!" অতুল হাঁচির শব্দর মতন যাঃ যাঃ করল।

প্রীতি বলল, "মোটেই যাঃ যাঃ নয়। তোমার বাবা একটা ইয়ে—কোনো সাহস নেই, ভীতু, ডরপোক্কা। মার বিয়ে হয়ে গেল। তোমার বাবার আর তো কোনো ক্ষমতা হল না—মার ওপর রাগ নিয়ে বসে থাকল। সেই জের এখনও চলছে ..."

অতুল সন্দেহের গলায় বলল, "আমার বাবা তোমার মার সঙ্গে প্রেম করত কে বলেছে ...?"

"দেখেছি", প্রীতি সটান গলায় বলল।

"তুমি দেখেছ?"

"হ্যাঁ মশাই দেখেছি। তোমার বাবার দেওয়া একটা বই মা এখনও কী যত্ন করে রেখে দিয়েছে। তাতে কি লেখা আছে জানো? লেখা আছে—আমার আদরের ধন লক্ষ্মীমণিকে।"

অতুল এবার সত্যি সত্যি লাফ মেরে উঠল। "যাঃ শালা। এই কেস্। কী বই, মাইরি?"

"চন্দ্রশেখর।"

"এই বইয়ের কথা তুমি আগে বলো নি তো?"

"আগে ছাই আমি দেখেছি নাকি! মা কোথায় লুকিয়ে রাখত কে জানে। বইটা তো সেদিন দেখলাম, মার কেরাসিন তেল আর তোমার বাবার ঘুমের ওষুধ খাবার পর। মা এখন মাথার কাছে বইটা রেখে শুয়ে থাকে।"

অতুল বার কয়েক মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে নিল। ফস্ করে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, "আমার বাবাটা চরিত্রহীন নাকি ?"

"চরিত্রহীন ?"

"না তেমন চরিত্রহীন নয়। ক্যারেক্টার নেই আর কি ? প্রেম করতিস তো করতিস—সো হোয়াট ? বিয়ে করলেই লেঠা চুকে যেত ?"

প্রীতি জোরে চিমটি কাটল অতুলকে। তারপর জিব দেখাল। "ঘোড়ার মতন বুদ্ধি তোমার। তোমার বাবা আর আমার মা বিয়ে করলে—আমাদের কী হত মশাই ? তোমায় যে দাদা বলতে হত !"

অতুলের খেয়াল হল যেন ব্যাপারটা। জিব কেটে ফেলল। বলল, "রিয়ালি, আমার কোনো সেন্স নেই। খাজা মাথা। তুমি ঠিক বলছ ! আমাদের ব্যাপারটার জন্যে ওদের স্যাক্রিফাইস করা উচিত ছিল। যাক গে, ওই বইটা আমাকে দিয়ো।'

"কী করবে বই নিয়ে ?"

অতুল রহস্যময় মুখ করে হাসল, ততোধিক রহস্যময় গলায় বলল, "ব্ল্যাকমেইল করব। প্রেসার দেব। তোমার আমার ব্যাপারে বাবা এবার যদি ঝামেলা করে—বইটা আমি আমার মার হাতে তুলে দেব। মা একটিবার শুধু দেখুক আমার ফাদারমশাই কাকে 'আদরের ধন লক্ষ্মীমণি' বলতেন। ব্যাস, ওতেই হয়ে যাবে। কিস্স্যু-আর করতে হবে না আমাদের।"

প্রীতি একটুর জন্যে থমকে দাঁড়াল। তারপর দমকা হেসে উঠল। হাসি আর থামতেই চায় না। হাসতে হাসতেই বলল, "ভীষণ বুদ্ধি তো তোমার ! এতো বুদ্ধি ওই মাথায় ধরে রেখেছিলে ! দেখি—দেখি—" বলে প্রীতি হাত বাড়িয়ে অতুলের চুলের ঝুঁটি ধরে মাথাটা নিজের মুখের কাছে নামিয়ে নিল। তারপর চকিতে একবার চারপাশ দেখে নিল প্লাটফর্মের। কেউ নেই।

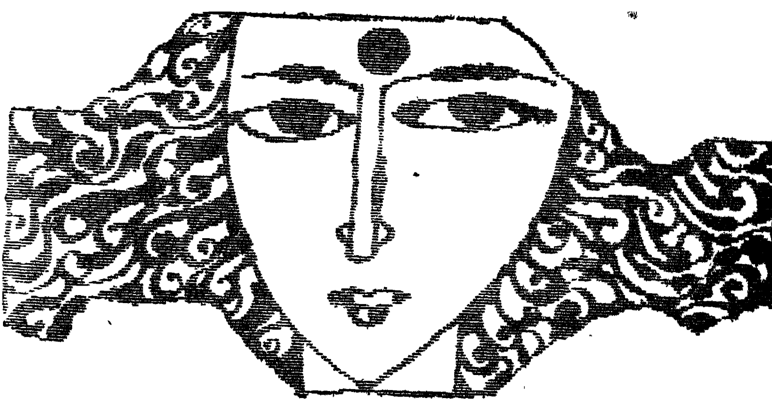
অতুল মুখ তুলে ভেজা গালের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "বড্ড দাড়ি হয়ে গিয়েছে। স্কিনে টাচ্ করল না।"

দুজনেই হেসে উঠল একসঙ্গে। হাসতে হাসতে ওভারব্রিজের দিকে এগিয়ে চলল।

সন্তোষ কুমার ঘোষ

করুণ শঙ্খের মতো

আদালত থেকে বেরিয়ে এসেই নন্দিতা একটা ট্যাকসি পেয়ে গেল। যেন বাড়ির গাড়ি ওর অপেক্ষাতেই ছিল। কপাল ভালো। কতটা ভালো, যেন সেইটে পরখ করতেই নন্দিতা ছোট্ট রুমালটায় তার কপালটা মুছে নিল। এত লোক এত চোখ, গা শিরশির করে। চালাও ট্যাকসি, যত তাড়াতাড়ি পারো, আমাকে এই মানুষের বন থেকে উদ্ধার করে ছুটে চলো। মানুষের বন, না বনমানুষের, রুমালটায়



শুধু ঘাম নয়, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিরও ছোপ। যে জল তার চোখে থাকার কথা, তা যেন জায়গা বদলে কপালে লেগেছে। রুমালটা ছোট্ট হলে কী হবে, ভারি দুষ্টুও। তুই ঘাম আর বৃষ্টির ফোঁটা মুছে নিবি, এই না কথা ছিল? অথচ ছাখো সিঁদুরের দাগটাও মুছে নিল। নকল সিল্কের বনাতটা লালে লাল। যে রক্ত নন্দিতার বুকের ভিতরে গোপনে, তাকে বাইরের বাতাসে একেবারে উতাল করে দিল। লোকে ভাববে কী?

ট্যাকসিটা মিটার ডাউন করেছিল। ড্রাইভার উৎসুক মুখে তাকিয়ে। বুকের ভিতরে ছপছপ আওয়াজ, নিজের কানে নিজেই শোনা যায়।

যেন কেউ তার শাড়ি শায়া জামা থপথপ করে কাচছে। নন্দিতার হৃদয়ে (এই নামে কিছু আছে কি? কখনও এই চরাচরে কোথাও ছিল কি?) কলতলা হয়ে গেছে। কোনও রকমে চাপা গলায় সে খালি বলতে পারল, যোধপুর পার্ক। আর দেরি নয়, হে ট্যাকসিওয়ালা দয়া করে দাঁড়ালে যদি, আর একটু দয়া করো। পার করে দাও এই পথটুকু, যত তাড়াতাড়ি পারো, তত।

তার কারণ সে ইতিমধ্যে অনেক না-চেনা চোখের মধ্যে এক জোড়া চেনা চোখ দেখতে পেয়েছে। বিরামের। বিরাম এখনও আদালতে বারান্দায়। নামেনি, হয়তো বৃষ্টির ছাট এড়াতে। নামেনি, তবু অপলক তাকিয়ে আছে। সিঁদুর জলে মাখামাখি রুমালটার আড়ালে থেকে নন্দিতা সব দেখতে পাচ্ছে। চোখ তো নয় যেন মিটমিটে দুটি আলো। রাত্তিরে বেড়ালের চোখ যে রকম জ্বলে, কতকটা সেই রকম। বিরামের চাউনিটা তীব্র না বিষণ্ণ, ভালো করে পরখ করার সাহস নেই নন্দিতার। সময়ও নেই। ট্যাকসির চাকা যখন গড়াতে শুরু করেছে, ভিড়ের মধ্যে তার ভেঁপু যখন চারপাশের সব চ্যাঁচামেচিকে চাপা দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে, নন্দিতা তখন, এতক্ষণে এই প্রথম, বুকের ভিতরটা ফাঁকা আর ফাঁপা করে দিয়ে শ্বাস ছাড়তে পারল।

রুমালটা তো রক্তে আর কান্নায় মানে সিঁদুরে আর জলে গোল্লায় গেছে, তাই তুলে নিল আঁচলের একটা কোণ। আরও একবার মুখটা মসৃণ মুছে ওই আঁচলটাই গুছিয়ে গায়ে জড়িয়ে জড়সড় হয়ে বসল।

বিরামের চোখে কষ্ট ছিল, না ধিক্কার বা তিরস্কার, সেটা যাচাই করে নেওয়াই হল না। পালাতে হবে যে, এক্ষুনি, এক্ষুনি। এই লোকজনের কাছ থেকে, বিশেষ করে একটি লোকের অদ্ভুত দৃষ্টির কাছ থেকে। কিংবা কে জানে, নন্দিতা হয়তো নিজের কাছ থেকে পালাতে চাইছে। এই মুহূর্তে।

বাড়ি পৌঁছুতে পৌঁছুতে অবশ্য অনেক মুহূর্তই কাটল। মিটারে কত উঠছে না দেখেই নন্দিতা একহাতে বাড়িয়ে দিল একটা দশ টাকার নোট, আর এক হাতে দরজা খুলে তড়বড় করে নেমে গেল।

সেই বাড়ি, সেই তরতর সিঁড়ি। চাবিটা ব্যাগে ঠিক খোপেই আছে, দরজার ফোকরটাও যথাস্থানে। কিছু হারায়নি, বা স্থানচ্যুত হয়নি। আবার কিছুই যেন যথাপূর্ব নেই। তখনও শেষবেলা সন্ধ্যার কোলে মুখ গুঁজে মুর্চ্ছা যায়নি, তখনও অন্ধকার দিনের রোদের রেশটুকুকে করেনি আত্মসাৎ। বাড়ির বাইরের মহা নিমগাছটা ঝিরঝিরে জল আর হাওয়া ঝরিয়ে দিচ্ছিল। একটুখানি আকাশ জানালার কাচের ফাঁকে, বাইরের রাস্তায় ক্বচিৎ একটা গাড়ির পোড়া পোড়া গন্ধ, কখনও বা রিক্সার ঠুনঠুন ছন্দ।

মেঘলা দিন, তাই বিকেলটাকেও সকালের মতো লাগে। মুখ ভারী, তবু করুণ হলেও মনোরম। অভ্যস্ত হাতেই সুইচ টিপে নন্দিতা ঘরটাকে আলোয় আলো করে দিল। তখন আলনার শাড়ি, দেওয়ালের ফটো আর আয়নাটা ওকে দেখতে পেল। যা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। অথচ থেকেও নেই। যে শূন্যতা বাইরের আচ্ছন্ন আকাশে সে শূন্যতার ছায়া নন্দিতা তার অন্তরেও অনুভব করছে। নেই নেই, সে নেই, কেউ নেই কিছু নেই। নেই থেকে কিছু হবে এই আশাতেই নন্দিতা তাড়াতাড়ি সংলগ্ন চানের ঘরটায় ঢুকল। যেন সেখানকার শ্যাম্পু, সুগন্ধি তেলের শিশি আর সাবানের মৃদু সুবাসে সে তার পুরানো হারানো সত্তাকে ফিরে পাবে। চানের ঘরের আয়তন ছোট বলেই বোধহয় এত আরাম, এত অভয় স্বস্তি। মাথার উপরে ঝরনা। ছিপি খুলে দিতেই তার ঝরঝর আদর নন্দিতার সমস্ত শরীর ধুয়ে দিতে থাকল। কার স্পর্শ? তার মায়ের? সে কতদিন আগেকার কথা? মাকে ছেড়ে এই বাড়িতে এসে উঠেছে অন্তত বছর ছয়েক আগে। আর মা তাকে—সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন কবে যেন, কবে যেন? সেও কম না বছর তিনেক হবে। দিন তারিখ সাল এখন আর মনেও পড়েনা।

তোয়ালে দিয়ে যখন গা রগড়াচ্ছে নন্দিতা, কার ছোঁয়া? তার স্বামীর? সেও তো হারানো। তার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে এই তো মোটে আধঘণ্টা আগে নন্দিতা পুরোনো বাড়িটাতেই ফিরে এল।

বিচ্ছেদ, পূর্ণচ্ছেদ। আঃ, এতক্ষণে যেন সব জুড়োল। ছড়ায় বলে, খোকা ঘুমোল। কোনও ছড়ায় কিন্তু খুকী ঘুমোল বলে না। বলবে কেন? আমি তো খুকী নই; আমি অনেকদিন ঘর করা নারী।

বিরামের সঙ্গে যতদিন ছিলাম, ততদিন আমার একটা নাম ছিল হয়তো। কিন্তু আমি যে আমি এই কথাটাও কি বোঝা যেত? শুধু যুক্ত ছিলাম এইমাত্র। কে জানে, সব বিবাহিতা মেয়ের আর একটা নাম হয়তো সংযুক্তা। আমি নেই, সে আছে। অথবা তার ছায়া হয়ে আমি আছি। কিন্তু যদি এমন কোনও সাজানো বাগানে আর একটা ছায়া পড়ে? তবে তো এই ছায়া আর একটা ছায়ায় ঢেকে যাবে!

আমি এখন আমি। শেকড় নই। ছায়াও নই, আমি রক্তমাংস মজ্জা মিলিয়ে কায়া। স্বাধীন। বেশ তবে তাই হোক, এবার সেই কায়ার বুকের ভাঁজে একটু সেন্টের সুগন্ধ ঢালি না। দরাজ হাতে স্প্রে করলে এই আমি ভুর ভুর হয়ে যাব। কিংবা কস্তুরী মৃগের মতো 'ম'। রক্তের রং তো ঢাকা যায় না! গন্ধটা যদি ঢাকা পড়ে।

নন্দিতার মগজে একটা ঝিমঝিম আবেশ নেশার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছিল, স্নায়ুর সংবেদনশীল কেন্দ্র থেকে যত শিরা আর উপশিরা রঙে রঙে চিৎকার করছিল। নন্দিতা জামাটার নিচের বন্ধনী আরও আঁটসাঁট বোতাম টিপে শক্ত করে দিল। এই নিচেকার জামাটাই তো সবচেয়ে নিচের নয়, তার তলাতেও আছে পরতের পর পরত, আছে মসৃণ ফর্সা চামড়া। সেই চামড়ারও নিচে? কে জানে কোথায় লুকিয়ে থাকে মন। "মনেরও স্তন আছে কিনা আজ পর্যন্ত কোনও বিজ্ঞানী দার্শনিক সে কথা জানাননি। থাকলে মনকেও ব্রা পরানো যেত। দূর, যাকে লাগাম পরানোই শক্ত তার আবার বক্ষ-বন্ধনী। তবু নন্দিতা ভাবল, বাইরের বুকে একটা বাঁধন থাকলে ভিতরের বুকটাকেও বুঝি বেঁধে আটকানো যাবে। যেমন স্ফীত কিছু সুডৌল মাংসপেশী, তেমনই অনুভূতি। শারীরিক স্ফীতিকে যদি শিকেয় তুলে তুঙ্গ করা যায় তবে মানসিক উচ্ছ্বাসের জন্যেই বা কোনও দড়াদড়ি, ফিতে হুকটুক নেই কেন?

আসলে খুবই কষ্ট হচ্ছিল নন্দিতার। সেটাকে ঢাকতে যত সেন্ট

আর পাউডার। আচ্ছা বিরাম আজকেই আদালতের বারান্দায় ওভাবে তাকিয়ে ছিল কেন? তখন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, নন্দিতার এতক্ষণে মনে পড়ছে, একটা পাকা বটফুল টুপ করে স্যাঁতসেতে মাটিতে পড়েছিল, শিরীষ গাছটার ফুলের রোঁয়া উড়ে এসে সুড়সুড়ি দিয়েছিল তার গলায় আর ঘাড়ে। কার ছোঁয়া, কিসের? সে জানে না। শুধু দৌড়ে এসে ট্যাকসিতে বসেছে। ট্যাকসিটার স্পিড ছিল অন্তত ষাট সত্তর কিলো-মিটার। কিন্তু বিরামের সেই চোখ আর চেয়ে থাকা? তার স্পিড কত? যেন আরও বেশি। যেন সিঁড়ি-টিড়ির বাধা মানেনি, ধাওয়া করে এসেছে এইখানে, এই ঘরে, এত দূরে। শুধু তাকানোও যে একটা কুকুরের মতো অনুগত অনুসারী হতে পারে নন্দিতা আগে জানতো না তো! ওই দৃষ্টি এখন লকলকে জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে। তা হাঁপাক না! নন্দিতার সারা শরীর আর সত্তাকে এত করুণ লেহন করছে কেন?

কথাটা নন্দিতা ড্রেসিং আয়নাকে জিগোস করল। আবার কপালে বড়ো করে পরল সিঁদুরের টিপ, যেটা ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে খানিক আগে মুছে তাকে অধবা করে দিয়েছিল। নির্ভুল কাচ তাকে দেখিয়ে দিল হাতের শাঁখা জোড়াও। নন্দিতার ঠোঁট একটু বেঁকে গেল। সোনা দিয়ে বাঁধানো হোক না, শাঁখা জোড়া ভেঙে দিলে বেশ হত। যাদের স্বামী মারা যায়, তাদের নোয়া লোকে নাকি খুলে নেয়, শাঁখা ভেঙে ভাসিয়ে দেয় জলে! আর যাদের স্বামী চলে যায়? তাদের শাখার কী গতি হয়, নন্দিতা ঠিক ঠাউরে উঠতে পারল না।

ইচ্ছে করলে এই তো আমি সিঁদুরের টিপটা ফের মুছতে পারি। সিঁথির লাল দাগটা তো কত কালই নেই? বুকের ভিতরের রাস্তা দিয়ে সরু কোনও লাল যন্ত্রণার আলপথ চলে গেছে কিনা, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নন্দিতা একটা আঙুল ছুঁইয়ে সেটা পরখ করতে চাইল।

এ কী অদ্ভুত ব্যাপার সে ভাবছিল। গিয়েও যে যায় না, সব শেষ হলেও পিছু পিছু পা টিপে আসে! কুকুরের মতো যার জিভ শুধু হা হা শ্বাস ছাড়ে। জিভ আছে অথচ লালা নেই, তাকানো আছে,

কিন্তু সেটা তাড়া করে না, নন্দিতা এই অসম্ভব অভিজ্ঞতার ঘূর্ণিতে পড়ে তোলপাড় হতে থাকল।

ঠিক তখনই সিঁড়িতে শোনা গেল ঠক্ ঠক্ জুতোর শব্দ, আমি জানি তুমি কে, আমি জানি এই পায়ের আওয়াজ কার। তোমার পায়ে পড়ি এক্ষুণি এসো না, অন্তত মিনিট দুই সময় দাও আমাকে। সামলে নিতে। ভেবে নিতে। যা ছেড়ে এলাম কিংবা যা আমাকে ছেড়ে গেছে। গঙ্গার ঘাটে কখনও যাওনি? সেখানে পুণ্যবতীরা সবাই ডুব দেয়। পাপবতী আমি, আমিও একটুখানি সময়ের জন্যে আগেকার জলে একবার শেষবার ডুব দিয়ে দিতে চাই। কয়েকটা মিনিট শুধু। ভিক্ষে করছি। এই শাঁখাটা বড্ডো ঢলঢলে লাগছে যে। সিঁদুরের এই কৌটাটা দরকার হয়, না হয় আবার মুছব আবার আঁকব—এবার যে আসছে সেই তোমার জন্যে।

একটু সময় দেবে? ধরো আমি যদি ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিই? আগেও কত রাত্তিরে দিয়েছি। তখন বাইরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, অথচ ভিতরে, সারা শরীরে ফটফটে ছটছাট আলো। জ্বলে জ্বলে। জ্বলন্ত জ্বলত। তোমার বুকের গন্ধ পাই না কেন? আমি চাপা হাসতাম সেই অন্ধকারে। আরও চাপা গলায় বলতাম, পাও না? বিরাম বলত, না। বলতাম, কেন এত যে আতর মাখলাম! সে বলত, সে তো কেনা! বলতে বলতে খামচে ধরত, আমার ঠোঁট, ঠোঁট ছাড়িয়ে জিভ চুষে শেষ করে দিতে চাইত। অন্ধকারে গাঢ় গলায় বলত, কেনা জিনিস তো চাই না। বলেছি, তবে? সে বলেছে, শুধু পেতে চেয়েছি, পেতে চাই।

আরও কত কত রাত, যখন আমার বুকের উপরে বলতে কি পায়ের নখ থেকে কপাল, আমার কপাল পর্যন্ত একগাছি সুতোও নেই, আমি মাঠের মতো, আকাশের মতো ব্যাপৃত, আমি উদলা, তখন সে আমার শরীরের অন্ধিসন্ধিতে কী জানি, কোন্ গন্ধ খুঁজতো। খুব নিচু গলায়, খুব উঁচু হয়ে বলতাম, কী খুঁজছো তুমি, কী চাও?

পায়ে পড়ি হে সিঁড়ির ধুপধাপ শব্দ, হে সময়, আমাকে আর একটু

সময় দাও। সব কথা নিজেকে বলে বলে খালাস হয়ে যাই, যেভাবে এক্ষুনি যদি ফের বাথরুমে যেতাম তবে আয়নাটার কাছে মনের সব চাপ আর তাগিদ হালকা করে দিয়ে আসতে পারতাম।

বিরাম সেই গন্ধভরা অন্ধকারে বলেছে, কোথায় তুমি? আমি বলেছি, এই তো। মায়েরা যেভাবে বাচ্চাকে ঘুম পাড়ায় সেই গলায়। বলেছি, দ্যাখো তো, আমার বুকের একটুও আড়াল নেই! সে মানতো না। সে কি বুকের ভিতরে আরও কোন বুকে আব্রু আছে কিনা সেইটাকে খুঁজতো? তাকে ছিন্ন ভিন্ন আর উদ্‌ভিন্ন করে দিতে চাইতো?

জানি না, আমরা তো জানি আমরা যা আছি তাই। আমার ভিতরে আর একটা যে আমি একেবারে খোলামেলা; বুকের তলায় আরও একটা বুক যে থাকতে পারে কখনও ভাবিনি। তাই নানা সুগন্ধি দিয়ে ওকে ঠেকাতে চাইতাম। কে জানে, হয়তো ঠকাতাম নিজেকেও।

রাস্তার একটা টিমটিম আলো মাঝে মাঝে ওই অন্ধকারকে জেব্রা করে দিত। বিরাম আমার খোলা আর খালি শরীরটাকে পাগলের মতো কাছে টানতো। বলত, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নিয়ে খালি বলত, আমি তোমার ভিতরটাকে জানতে চাই। আমি তো গা এলিয়ে, সমস্তটাকে ঢিলে করে দিয়ে শুয়ে আছি। বলেছি, যা জানবার জেনে নাও তুমি। সে বলত, প্রবেশ করব। বোকা ছেলে! একটা সিন্দুকের ডালা যদি বা ঘামে চিটচিটে হয়ে কেউ দু হাতে টেনে তুলল, তার পরেও ভিতরে যদি চকচকে কোনও সোনা দানা মোহর না দেখতে পাওয়া যায়? শরীরের দশাই তো এই। সে শেষে যেতে পারে না, শুধু শেষ হয়ে গিয়ে হাঁপায়। সেই কুকুরের লকলকে জিভ। অশেষের ঠিকানা পায়নি বলেই বিরাম রোজ বলত, রোজ রোজ বলত আর বলত, কী? না লাগছে। কোথায়? আমি বলতাম। তখন আমিও ইঁদারার মতো টলটলে হয়ে গেছি, বিরামের মুখ আমার উন্মুক্ত বুকে, বলতাম, সব তো খুলে দিয়েছি, তবু পারছো না? এ-যেন দস্যুর

হাতে চাবি তুলে দিলাম তার পরেও সে ধন-দৌলতের কোনও ঠিকানা পেল না।

বিরাম তুমি সেই দস্যু। কেন ফিরে ফিরে নিচের ঘরে, কেন কোনও মন্দিরের গর্ভগৃহে নিবিষ্ট প্রবিষ্ট সাষ্টাঙ্গে লিপ্ত হয়েও বলছ, লাগছে? কি সে বিরাম, কী সে? কোথায় বলোতো কোথায়? সারা গায়ে কিছু তো নেই, দেখছ না আমি এখন নির্বাস, আমি শুধু আমার নির্যাস। আছে শুধু শাঁখাজোড়া। তাতেই কষ্ট? সেইটাকেই তুমি বলছ, লাগছে? ওই একটুখানি বেড় কি বেড়া হয়ে যায়?

জানি না, ভাবতে পারছি না, সময় আমাকে আর সময় দিচ্ছে না। ধপধপ জুতোর শব্দ, এখন একেবারে দোরগোড়ায়। কলিং বেল বাজছে।

নন্দিতা জামা কাপড় গুছিয়ে সংবৃত হয়ে গেল। সাড়া দিল মানে দরজাটা খুলল। আমি জানতাম অনুপম তুমি আসবে। বাঃ তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে তো। তোমার জন্যেই তো নন্দা, তোমার জন্যেই। আমার মনের কথাটা যদি পড়তে পার তবে পড়ে নাও। আজকে এই সময়টায় লোডশেডিং হলে কী দারুণ হত বল তো? জিজ্ঞেস করার দরকার কী অনুপম। সব লোড় শেড় করেছি বলেই তো আমরা দুজন এখানে আজ মুখোমুখি হয়েছি। ষ্ট্রেচলনের ট্রাউজার পরে তুমি তৈরি, আমিও তাই নাইলনের শাড়ি সারা শরীরে জড়িয়ে। এসো সব ছাড়িয়ে যা কিছু আমাদের ছড়িয়ে আছে সব বাধা এড়িয়ে, এসো। জানি এরপর কী? তুমি যদি তৈরি থাকো তবে আমিও তৈরি। কপালের টিপটাকে ভালো লাগছে না? আমার জন্যেই পরেছ? ভালো না লাগলে মুছে দিও। চুমু দিয়ে জিভের ডগা দিয়ে। আজকেও তুমি এই সব কথা বলবে নন্দা? তোমার কথা কেমন যেন কাটা কাটা। দূর আমি সব হাত বুলিয়ে মিলিয়ে দেব।

আমি নন্দিতা। বিরামের চাকরিটা হঠাৎ কেন গেল বলতো? কেন তুমি তোমার অফিসে আমাকে একান্ত সচিব করে নিলে? আমার যে এক, তার যে তখনই অন্ত হয়ে গেল। স্বামীর কাজ নেই, আমার কাজের উপরে একটা ডবল কাজ মিলল। অনুপম, হে সম্রাট তুমি মহানুভব।

নন্দিতার এই সব মনোগত কথা অনুপম শুনতে পায়নি। সে বানানো কোনও নাটকের চরিত্রের মতো বানানো কোনও সংলাপ শুনছিল। তার কানে ভাসছিল, আমি, এই অনামিকা, এখন সব খুলে দিতেই রাজি। যে ভাবে দরজাটা খুললাম তার চেয়েও তাড়াতাড়ি। জানতাম তুমি আসবে। তাই তো একটু আগে বাথরুমে গিয়েছিলাম। কেন বলতো? আমার সমস্ত পুরোনোকে ধুইয়ে ঢেলে দিলাম। আর নতুনের জন্যে নিজেকে ছিমছাম তকতকে করে তুললাম। এক ঢিলে দুই পাখি। মেয়েদের মন যদি বা দুমুখো সাপ হয় তাদের শরীরটা শান বাঁধানো মেঝের মতোই। কোনও একজন পা ফেলবে এই জন্যেই তারা মসৃণ ধৌত তৈরি।

আচ্ছা অনুপম, তুমি খেয়ে এসেছ? রাত্তিরের খাওয়া? খাইনি নন্দা। তোমার নন্দা মানে এই নন্দিতা বলছি, তোমার চোখ দুটো এরকম ধূসর কেন? চোখকেই কি তোমার ভয়? না, তাও নয়। যখন তোমার একান্ত সচিব হলাম, তখন ছুটির পরে দুটো চোখ ছুটে ছুটে আমার পিঠের জামা ফুঁড়ত। আজকেও জানো, অন্য দুটো চোখ ধাওয়া করেছিল, যে চোখ দুটোর মালিকের সঙ্গে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আচ্ছা, পুরুষের চোখ কি শুধু ধাওয়া করে? চায় চায় আর যায়? আবার বলি আচ্ছা বিচ্ছিন্নতাবাদ কি একেই বলে? একটা মেয়ে কখনও একাকী কি কোনও দ্বীপ হয় বা হতে পারে? কী বললে, কী বললে তুমি? আমি তো আছি। নাটক হলে এখানে নায়িকার সংলাপের আগে ব্র্যাকেটে লেখা থাকত 'মৃদু হাস্য'। সে সব থাক আবার বলো, খেয়ে এসেছ, না খাবে? আমরা দুজনেই খাবো নন্দিতা, আমার নন্দা। এসো, আলোটা নিবিয়ে দিই।

কোথায় গেল স্ট্রেচ্‌লন কোথায় বা নাইলন? কিছু নেই, কিচ্ছু নেই। তার সমর্থ উরু কদলী কাণ্ডের মতো প্রকাণ্ড হয়ে গেছে, একটি পুরোনো পরিচিত বিছানায় আরও দুটি পা আর হাত হঠাৎ যেন অক্টোপাস, আতুর নিশ্বাস।

ওরা ডিনার খাচ্ছে।

তবু নন্দিতার শরীরে মনে কী যেন? কেউ ছিল এখন নেই। সেই স্মৃতি। পুরুষ। কেউ তাকে অবধারিত খুলতে চাইছে। পুরুষ।

পুরুষেরা জানে না কেন যে, খোলা মানেই মেলে দিতে পারা নয়। বোঝে না কেন প্রথম দ্বিতীয়ের পরেও তৃতীয় কোনও পুরুষ থাকতে পারে, তার নাম নেই, মুখ নেই, সে অতি-অতীত পূর্বতন কোনও ক্ষণ। সেই তৃতীয়টি এই মুহূর্তে নন্দিতাকে উন্মথিত উন্মোচিত করছিল। অনুপম তাকে বিগলিত গলায় বলল, আমাদের মধ্যে আর কিচ্ছু নেই। দারুণ, তাই না? এই সময়টার জন্যেই আমরা কতদিন ধরে বসেছিলাম বলো তো?

নন্দিতা মনে মনে হাসল। সেই হাসাটাই নির্বাক বলা: বসাটা শোয়া হয়ে গেল, তাই বলছ দারুণ, তাই না?

"ভীষণ ভালো লাগছে," অন্ধ-বন্ধ শ্বাস ছেড়ে গাঢ় কুয়োর তলা থেকে অনুপমের গলা ভেসে এল। সে বলল, "তুমি কিন্তু কিছুই বলছ না।"

"ভালো লাগছে আমারও," সারা শরীরে সাড়া দিতে দিতে নন্দিতা আস্তে আর স্তিমিত, বলল।—"ভালো লাগছে, কিন্তু একটু লাগছেও।"

ব্যথা দিচ্ছি? অনুপম বোকা বোকা গলায় বলল।—কোথায়? উত্তরে শুনল, জানি না। মরিয়া হয়ে বলল, শরীরে? তখন তীব্র চীৎকার করে উঠল নন্দিতা। হাত দুটো শূন্যে তুলে বলল, তোমার লাগছে না অনুপম? আমার কিন্তু লাগছে। ছাখো, এই দুটোতে।

নন্দিতার রোগা কব্জিতে পুরোনো একজোড়া শাঁখা অন্ধকারে সাজ্যাতিক শাদা হয়ে জ্বলতে থাকল।

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

মঙ্গল সূত্রম

বিরাট মণ্ডপের কপালে লাল শালু আঁটা। লালের মাঝে রূপালী অক্ষরগুলো ঝকমক করছে। আলো ঝলমল মণ্ডপের ভিতর-আর তিল ধারণের জায়গা নেই। রাস্তা থেকে ওপারে—ফুটপাথ পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য।

তামিলনাদ সঙ্গীত সম্মেলন। চিনু ফুটপাথের শেষ সীমানায় চারতলা বাড়িটার দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ভিড় ঠেলে গেটের কাছে পৌঁছনো দুঃসাধ্য ব্যাপার। বার-দুয়েক বৃথা চেষ্টা করেছিল।



এক এক করে বহু শিল্পীর বহু গাড়ি আসবার পর প্রত্যাশিত প্রতীক্ষার অবসান হল চিনুর।

মঞ্জীরার গাড়ি এসে দাঁড়াল।

স্বেচ্ছাসেবক, উদ্যোক্তাদের ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল চতুর্দিক থেকে। জমাট ভিড় দোল খেতে লাগল। স্বেচ্ছাসেবকরা পথ করে দিচ্ছে। উদ্যোক্তারা বিশেষ অভ্যর্থনার ভঙ্গীমায়, করজোড়ে মাথা নুইয়ে স্বাগত

জানায় মঞ্জীরাকে। মৃদু হাসির মাধুর্য ফুটে উঠেছে ঠোঁটের কোণে মঞ্জীরার। নমস্কার প্রতিনমস্কার করতে করতে গাড়ি থেকে নামল।

কাছে যাবার প্রবল ইচ্ছে ছিল চিন্নুর। হয়ে উঠল না। ভিড়ের চাপ পিছু হটিয়ে দিলে বার বার। দেখছে চিন্নু, নিওনলাইটের জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে মঞ্জীরার মুখে মুখে। অবাক হয়ে যাচ্ছে।—এখনো তিরুমাঙ্গল্যম।—বিয়ের মঙ্গলসুতো ওর গলায়! পাঁজরার সব কটি হাড় মোচড় দিয়ে উঠল চিন্নুর। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

মণ্ডপে প্রবেশ করলে মঞ্জীরা।

·· মাইক ঘোষণা করছে – দক্ষিণ-ভারতের খ্যাতনাম্নী লোকগীতি-গায়িকা মঞ্জীরা আয়ার দীর্ঘদিন পর আমাদের মাঝে এসেছেন আবার। অসামান্য সঙ্গীত শিল্পী কন্নন এখনো নিরুদ্দেশ। আশা হয়, তিনিও একদিন এঁর মতোই আকস্মিকভাবে আত্মপ্রকাশ করবেন। তাঁরই আবিষ্কার করা সুপ্রাচীন তামিল লোকগীতি 'ইয়েত্তাপত্তু' গাইছেন মঞ্জীরা—শস্য ফলনের সময় চাষী-মালিকদের সমবেত কণ্ঠের গান!

মণ্ডপ ভেঙে পড়তে লাগল করতালির আওয়াজে। ফেটে পড়তে লাগল মাইক। সঙ্গীত অনুরাগীরা শ্রদ্ধা-সম্মান জানাচ্ছে শিল্পীকে। চলল কিছুক্ষণ। শ্রোতাদের শ্রদ্ধা কুড়িয়ে গান ধরলে মধুক্ষরা কণ্ঠে মঞ্জীরা।

ভিতর-ধার নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ। শিশু-যুবা-বৃদ্ধ—সব বয়সের সকলে মন্ত্রমুগ্ধ। চিন্নুও। এ গান তার শোনা। অনেক ক্ষেত্রে এক সঙ্গে গাওয়া দু'জনের। তবু পুরোনোকে নতুন করে শুনছে যেন সে। জানছে যেন। সমস্ত স্নায়ু কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতি বয়ে যাচ্ছে।

সেই মঞ্জীরা!

রুকমিনী। সঙ্গীত সংসদের প্রধানা রুকমিনী আম্মা। সেদিন গ্রাম ভ্রমণে বেরিয়েছে। উদ্দেশ্য, দক্ষিণ দেশের হারানো লোকগীতির সন্ধান

সংগ্রহ। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রুকমিনী দলবল নিয়ে। দল তত্ত্বাবধানের ভার পড়েছে চিনুর ওপর।

…সেই একদিন দেহাতের মঞ্জীরা নদীর তীরে এসে থামতে নির্দেশ দিলে রুকমিনী চিনুকে, বিশ্রাম নেবে খানিক। স্থানটি মনোরম। ভাবপ্রবণ শিল্পী এক দৃষ্টে দেখছে মঞ্জীরার কাক-চোখ জল। তরতরিয়ে বয়ে চলেছে চাষীদের মৃত সঞ্জীবনী। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠল রুকমিনী। বাঁশীর গান ভেসে আসছে। পুলকে শিহরণ জেগে উঠল সর্বশরীরে। পেলে বুঝি সে এতদিনের ইপ্সিত ধন! মাটির—প্রকৃতির গান শুনছে প্রকৃত। গানের সুরের হাওয়া ধরে ধরে এগুতে লাগল। কদমতলায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। কলসী কাঁখে অলমেলু—গাঁয়ের মেয়ে জলে নামছে। বাঁশরীকণ্ঠীর প্রাণমাতানো গানে দিগন্ত মুখরিত। রূপসী অলমেলুর অপরূপ লাবণ্য ছেয়ে রয়েছে সর্বাঙ্গে। স্থানকালপাত্র ভুলে পলকহীন চোখে দেখছে ওকে সকলে। তন্ময় হ'য়ে গান শুনছে।

চোখ পড়ল কদমতলার অলমেলুর। গান থমকালো গলায়। রুকমিনীর দলও সচেতন হ'য়ে উঠল নিমেষে। এগিয়ে গেল রুকমিনী নদী কিনারে—অলমেলুর কাছে। মিষ্টি সুরে জিগ্যেস করলে—বাড়ি ?

লাজুক চোখের ইশারায় ওধারের পাতাছাওয়া খুপরিটা দেখিয়ে দিলে অলমেলু।

পিতৃমাতৃহারা অলমেলুর জ্ঞাতিকাকার খুপরিতে এসে হাজির হ'ল রুকমিনী। দলে থাকলে ভাইঝির ভবিষ্যত উজ্জ্বল—বৃদ্ধকে বোঝালে। রাজি হল বৃদ্ধ। রুকমিনীর সঙ্গে ছেড়ে দিল অলমেলুকে। মনে মনে প্রণাম জানালে রুকমিনী ইষ্টদেব শিবকে। তাঁরই প্রেরিত অলমেলু। ওর প্রার্থনা শুনেছিলেন তিনি। মঙ্গলময়ের অহেতুকী কৃপা এপথে টেনে এনেছিল আজ ওদের।

অলমেলুকে নিয়ে এলো শহরে রুকমিনী। ভগ্নী-স্নেহের যত্ন পেতে লাগল অলমেলু রুকমিনীর কাছে। মঞ্জীরা নদীর স্বচ্ছন্দগতি অনুভব

করতো রুকমিনী অলমেলুর গানের গলায়। বলতো—ওই তো গানের মঞ্জীরা নদী। শ্রোতাদের মনে শান্তি-আনন্দের ফসল ফলাবে। শিবচতুর্দশীর পুণ্য দিনে—পুজো-পাঠ শেষ করে, অলমেলুর নামকরণ করলো মঞ্জীরা।

রুকমিনীর ঈশ্বরদত্ত অন্তর্দৃষ্টি। মানুষের মধ্যে সঙ্গীত প্রতিভা আবিষ্কার করার ক্ষেত্রেও অদ্বিতীয়া। কন্নন-চিন্নু-দলের প্রত্যেক শিল্পীই ওর আবিষ্কার।

সকল শিল্পীকেই সমান স্নেহ করে, সমানভাবে শেখায়—পক্ষপাতিত্ব নেই কারোর ওপর—এ সুনাম রুকমিনীর বরাবরের। কিন্তু, বরাবরের সুনামেও কালোছায়া পড়তে শুরু করল। দলের অনেকেই কানাকানি করতে লাগল—মঞ্জীরাকে পাওয়ার পর থেকে রুকমিনীর চোখ যায় না তাদের ওপর আর। তারা যেন অপাংক্তেয় হয়ে পড়ছে। স্নেহ মমতা, সঙ্গীত পুঁজি—সবকিছু উজাড় করে দিচ্ছে রুকমিনী মঞ্জীরাকে। অনেকেরই চক্ষুশূল হ'য়ে উঠল মঞ্জীরাও—মেয়েটা যাদু জানে। মোহে অন্ধ ক'রে রেখেছে রুকমিনীকে। এইসব অপপ্রচারে রুকমিনীর জিদ বেড়ে গেল আরো। নিঃস্ব হ'য়ে ও সর্বস্ব ক'রে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল মঞ্জীরাকে, প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

রুকমিনীর শিক্ষাপুষ্ট মঞ্জীরা জলসা-আসরের প্রতিবারের অনুষ্ঠানেই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর স্বাক্ষর রাখছে। গ্রামের মেয়ের অকৃত্রিম গায়কি ঢঙে —মাটি-নদী-গাছ-গাছালি যেন জীবন্ত হ'য়ে ভেসে ওঠে শ্রোতাদের চোখের সামনে। পঞ্চমুখে প্রশংসা করে সকলে। আনন্দ গর্বে রুকমিনী ফুলে ফুলে ওঠে।

যশের শিখরের এক একটি সোপানে উঠেছে মঞ্জীরা ঊর্ধ্ব থেকে আরো ঊর্ধ্বে। দলের তামিল সঙ্গীত বিশারদ কন্ননের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে দিলে রুকমিনী মঞ্জীরার। তামিল লোকগীতি 'ইয়েত্তাপত্তু' শেখার জন্যে। তামিল-তেলেগু—দুটি ভাষার পল্লীগীতিতেই পারদর্শিনী হ'য়ে উঠবে মঞ্জীরা। আজ পর্যন্ত কোনো গায়িকা হয় নি।

কন্ননের শেখানোর গুণে আর মঞ্জীরার একনিষ্ঠ সাধনা-অনুশীলনের ফলে, অল্পদিনের মধ্যেই তামিল লোকসঙ্গীত আয়ত্ত করে নিলে সুন্দরভাবে মঞ্জীরা।

মঞ্জীরা যশের চরম শিখরে উঠল। দু'টি ভাষাভাষী লোকদের প্রতিনিধিস্থানীয় দু'টি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান—তামিলদের 'ইয়েত্তাপত্তু গীতি-চক্রম্' আর তেলেগুদের 'একুবাক সঙ্গীত চক্রণে'র কাছ থেকে স্নেহধন্যা-সঙ্গীতপ্রাণা আখ্যা পেল। আনন্দ আর ধরে না রুকমিনীর। কন্ননেরও। কিন্তু কন্ননের আতিশয্য দৃষ্টিকটু লাগল রুকমিনীর। স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে ফুলের স্তবক হাতে দিয়ে, মঞ্জীরার গলায় গোড়ের মালা পরিয়ে দেওয়াটা মোটেই শোভনীয় হয়নি—অন্তত তার সামনে। দৃঢ়চিত্ত রুকমিনী অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। গম্ভীর মুখে ফাটল ধরল। বিরক্তি ছেয়ে গেল। সংযমী অভ্যাসের গুণে মুখ মনের ভাব পরিবর্তন করতে দেরী হল না কিন্তু রুকমিনীর। মুখে ছদ্ম হাসি টেনে বললে কন্ননকে—কাল সকালে একবার দেখা করো অতি অবিশ্যি।

রাতভোর চোখেপাতায় এক করতে পারেনি রুকমিনী। কন্নন দলের প্রধান হবে ভবিষ্যতে। তার সারা জীবনের সাথী হবে—এইটাই স্থির বিশ্বাস ছিল কিন্তু সে বিশ্বাসে যেন সন্দেহের দানা বাঁধছে। ভাঙন ধরছে। কন্নন সম্বন্ধে চিন্নুর অভিযোগ কানে বাজছে কেবল।—মঞ্জীরা-কন্ননের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠছে। দলের সকলেরই নজর পড়ছে। একজনের গান যে আসরে সে-আসরে অন্যজন যাবেই। বজ্রাঘাত হলেও, শরীর অসুস্থ থাকলেও।

এসব কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি রুকমিনী। ভেবেছিল, ঈর্ষা প্রণোদিত ব্যাপার এটা স্রেফ। কন্নন-মঞ্জীরার সুনামের জ্বালা, যা তা ধারণা করা জ্বালা ধরারই প্রতিক্রিয়া। এখন বুঝছে, মিথ্যে লাগানি-ভাঙানি করেনি চিন্নু। মঞ্জীরা-কন্ননের মিলনের

মূলই রুকমিনী। তাকেই বিচ্ছেদ করানোর সূত্র খুঁজে বার করতে হবে।

পরের সকাল। কন্নন এলো। রুকমিনী চিনুর সমস্ত কথা জানালে। নিজেও হুঁশিয়ার করে দিলে, সংসদের মানসম্ভ্রম নস্যাৎ হ'য়ে যাক—এটা কন্ননের কাছ থেকে কেউই আশা করেনা। কন্ননও নিশ্চয়! মঞ্জীরার সঙ্গী হওয়া বরাবরের জন্যে বন্ধ করে দিতে হবে।

কন্ননের কানে শ্রদ্ধেয়া দলনেত্রীর আদেশ কেমন নির্মম শোনাল। কি যেন চিন্তা করলে ও। কোনো প্রত্যুত্তর না দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে।

চেয়ে চেয়ে দেখল রুকমিনী কন্ননের চলার গতি। একটা উন্মত্ত উল্লাসের আমেজে মন ভরে উঠছে তার। কন্ননের মর্মস্থানে ঘা মেরেছে সে। তার আদেশ মানতে বাধ্য। সংসদের সঙ্গে কন্ননের নাড়ির যোগ। প্রচার-প্রতিষ্ঠা করতে নিঃস্ব হয়ে অর্থসামর্থ্য-মন—সবকিছু ঢেলে দিয়েছে। এটা ধ্বংস হোক চাইবে না ও। কখ্খনো না। নিজেকে সংযত করে নেবে বরং।

পরপর দু'দিন কেটে গেল। সংসদের বাড়িতে আসেনি কন্নন। তৃতীয় দিনে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। কন্নন-মঞ্জীরা একসঙ্গে এসে উপস্থিত হল রুকমিনীর ঘরে। রুকমিনী বিস্ময়ে বিমূঢ়। তার নিষেধ সত্ত্বেও কী দেখছে! কী অবিশ্বাস্য কথা শুনছে কন্ননের মুখে :—আমরা দুজনেই সংসদ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

বিস্ময়ের ঘোর কাটবার পূর্বেই মঞ্জীরার কথাগুলো গরম সীসেগলা ঢাললে রুকমিনীর কানে—আমাদের বিয়ে।

নির্বাকমুখে স্থাণুর মতো বসে রইল রুকমিনী। ওরা কখন চলে গেছে, কোনো খেয়াল নেই। চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে

ক্রমে। সংসদ ডুববে, সে ডুববে—কন্ননকে হারাতে হ'ল চিরকালের মতো। চোখের কোণ টনটনিয়ে উঠছে রুকমিনীর। মুখ ঢাকলে দুহাতে।

চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়েছিল চিন্নু। লক্ষ্য করেছে সব, শুনেছে সব। সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল। কর্ত্রীর ভেঙে পড়া অবস্থা দেখে করুণা হ'ল। সংসদের মান সম্ভ্রম নস্যাৎ হ'য়ে যাক—সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল। —মোহগ্রস্ত হয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছে ওরা। কন্নন মঞ্জীরা দুটি শ্রেণীর —তামিল-তেলেগু সমাজের। ওদের পরস্পরের রীতি-নীতি ভাবধারায় বহু অমিল। এই অমিলই বিয়ের প্রধান প্রতিবন্ধক।

অন্ধকারে আলো দেখলো রুকমিনী। চিন্নুই একমাত্র প্রধান অনুগত। তারা ব্যাথা বুঝেছে। সহানুভূতি আছে। বুদ্ধি খাটিয়ে—যুক্তি দেখিয়ে, ওই কন্ননকে ফেরাতে পারবে। চিন্নুর ওপরই কন্ননের ভার ছেড়ে দিল রুকমিনী।

কন্ননদের বাড়ি গিয়েছিল চিন্নু। দুটি সমাজের দুস্তর পার্থক্যের কথাও তুলেছিল। ফল ফলেনি। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল কন্নন। বলেছিল, প্রকৃত শিল্পী দল-পক্ষ-সমাজ গণ্ডীর বাইরে।

কন্নন-মঞ্জীরার বিয়ে হ'য়ে গেছে শুনে খুব মুষড়ে পড়ল রুকমিনী। চিন্নু কিন্তু একটুও বিচলিত হল না। বরং প্রতিজ্ঞা করলে রুকমিনীর কাছে। —ওদের মনে ভাঙন ধরাবার জন্যে ছায়ার মতো অনুসরণ করবে সে। ওরা তাদের ছাড়লেও, সে ছাড়বে না ওদের।

প্রতিশ্রুতি পালন করেছিল চিন্নু। রোজই আসতো কন্ননদের বাড়ীতে। নানান কথাবর্তার মাঝে, একবার করে তামিল নীতিগুলির কদর্থ করতে ভুলে যেতো না কোনদিন।

সেদিন চিন্নুর নিয়মিত বক্তব্যের মোড় ঘোরাবার জন্যে সঙ্গীত শাস্ত্রের ঘরানা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে সবে কন্নন, মঞ্জরা এসে আছড়ে পড়ল বিছানায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। শক্তমনের দুঃসাহসী মেয়ের অস্বাভাবিক কাণ্ডকারখানায় চিন্নু-কন্নন—দুজনেই হতভম্ব।

কান্নার হেতু জেনে, জোরে হেসে উঠেছিল কন্নন। —মঞ্জীরার গলার সুতো ছিঁড়েছে। বিয়ের দিন স্বামীর পরানো এয়োতীর চিহ্ন। —মঙ্গলসূত্র। সুতোয় গিট বেঁধে, গলায় পবাতে পরাতে, কৌতুক করে বলেছিল কন্নন—অরন্দুপোজাল্ এল্ ভয়ম্? কানামল পোনালতানে …ভয় কিসের? হারায় নি তো। না হারালে আত্মা বাঁধা থাকবে তোমার কাছে।

মুখে হাতচাপা দিয়েছিল মঞ্জীরা কন্ননের। ওসব অমঙ্গলের কথা শুনতে সে চায়না মোটে।

এই ঘটনার মধ্যেই চিন্নু যেন রুকমিনীর উদ্দেশ্যসিদ্ধির মোক্ষম মন্ত্র খুঁজে পেল। মঞ্জীরার কাছ থেকে কন্ননকে তফাৎ করার মন্ত্র। চোখের বার হলে, মনের বার হয়ে যাবে ও কন্ননের।

চিন্নুর সিদ্ধান্ত সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলে রুকমিনী। আহত দিক্‌ভ্রষ্ট পাখীর মতো রুকমিনী যেন পথের সন্ধান পেল। হৃদয়ের ক্ষত শুকানোর প্রলেপ পেল।

রুকমিনীর ডাকে সাড়া দিল সরল-প্রাণ কন্নন। রুকমিনী নাকি বিশ্রাম নিচ্ছে মঞ্জীরা নদীর অপর পারে—এক নিভৃতকক্ষে। চিন্নু সঙ্গে করে নিয়ে এলো কন্ননকে সেখানে। রুকমিনী নেই। আছে দুজন বলিষ্ঠ দেহী জোয়ান। ওদের জিম্মায় ছেড়ে দিলে কন্ননকে চিন্নু। কন্ননের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে—রুকমিনী আসবে শীগগিরই। বজ্রকণ্ঠে আদেশ দিলেন জোয়ানদের চিন্নু, আদমী পালাবার চেষ্টা করলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যেন আটকানো হয়।

মঞ্জীরার কাছে পালিয়ে আসবার চেষ্টা করেছিল কন্নন। চিন্নুর কথা পালন করেছে দুজন জোয়ান। সর্বশক্তি দিয়ে আটকেছে। কিন্তু আটকানোর ধকলে, একেবারে এ দুনিয়া থেকে মুক্তি পেয়েছে কন্নন।

নির্দয় ঘটনা জানতে পেরে মূর্ছা গিয়েছিল রুকমিনী। চিন্নুর চোখ ফেটে জল এসেছিল। এভাবে কন্ননকে হারাতে চায়নি। কন্ননের

মৃত্যুর কারণ হল সে-ই। অপরাধবোধের বৃশ্চিক দংশনে জর্জর হয়ে পড়তে লাগল।

নিদারুণ মনঃকষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে মঞ্জীরার ওপরই সমস্ত দোষ চাপিয়েছিল চিন্নু। অলক্ষুণে মেয়েটার সঙ্গে মিশেই, কন্ননের মতো সঙ্গীত প্রতিভা তুনিয়া থেকে হারিয়ে গেল। রুকমিনী জীবন্মৃত। কী কুক্ষণেই সাক্ষাৎ ঘটেছিল।

রুকমিনী-চিন্নু ছাড়া কন্ননের মৃত্যু সংবাদ জানতো না আর অন্য কেউ। দেশময় রটে গেছে সঙ্গীত সংসদের চিন্নুই কন্ননকে গুম করেছে। থানায় দৃঢ় কণ্ঠে বলেছে মঞ্জীরা, চিন্নু ডেকে নিয়ে গিয়েছিল কন্ননকে।

হাজতবন্দী হয়ে রইল কিছুদিন চিন্নু। বিনা বিচারেই মুক্তি পেল একদিন হঠাৎ। মুক্তির কারণ জেনে হতবাক হয়ে গেল। দ্বিতীয় জবানবন্দীতে জানিয়েছে মঞ্জীরা—কন্ননকে ডেকে নিয়ে যায় নি চিন্নু। ক'দিনের খোঁজখবরে কন্ননের হদিস মিলল না। মাথাটা কি রকম হয়ে গিয়েছিল। চিন্নু আসতো বলে ওরই ওপর সন্দেহ হয়েছিল প্রথমে। তু'রকম জবানবন্দীতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল থানা। এদিকে মঞ্জীরাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাওয়া যায় নি তাকে।

মঞ্জীরা কেন এমন করলে? আসল কথাটাকে ঘোরালে কেন? এই প্রশ্ন প্রায় সব সময়ই মনে খচখচ করে বিঁধতো চিন্নুর।

প্রশ্নের উত্তর মিলল চিন্নুর। স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশের জন্মদিনে—১৯৫১ সালের ১লা অক্টোবরে। মঞ্জীরার জ্ঞাতিকাকা এসেছে দেশ থেকে। ভাইঝির বাড়ি থেকেই শহরের উৎসব মিছিল দেখবে। পূর্ব-ঠিকানায় সংসদে পেলে না মঞ্জীরাকে। চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল বৃদ্ধ। দিনকতক আগে একবার কাকার কাছে গিয়েছিল মঞ্জীরা। বড্ড অস্থির দেখাচ্ছিল ওকে। তু'চোখ ছলছল করছিল। জানিয়েছিল, দেশে থাকতে তার ইচ্ছে করছে না এক মুহূর্তও। যে তুটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান স্নেহধন্যা সঙ্গীতপ্রাণা আখ্যা দিয়ে বিখ্যাত করেছিল, সেই তুটি প্রতিষ্ঠানের কতক কতক লোক তলায় তলায় তুঁষের আগুন জ্বালিয়ে চলেছে।

ইয়েত্তাপত্তু গীতি চক্রমের প্রধান মহাখাপ্পা হ'য়ে উঠেছে মঞ্জীরার ওপর। তাঁর আত্মীয় চিন্নুকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রধানের অনুরাগীদের বেশীর ভাগই মঞ্জীরার অন্যায় কর্ম—চিন্নু সম্বন্ধে মিথ্যা অভিযোগ বরদাস্ত করতে পারবে না। এরুবাক সঙ্গীত চক্রমের অনেক তরুণই আবার মঞ্জীরার ওপর অতি সদয় হয়ে উঠেছে তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে। সঙ্গীতপ্রাণার বিরুদ্ধে যে কোন অসম্মানজনক ঘটনা—প্রতিষ্ঠানেরই মানহানি করা হচ্ছে ধরে নেওয়া হবে। মানহানি রুখতে, উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পিছপা হবে না তারা। মত্তহস্তীর আক্রোশে দুটি দল লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক—দু'টি মহত্তর লোক-শিল্পী পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক—জীবন থাকতে হ'তে দেবে না মঞ্জীরা। দিতে পারে না।

কেন চিন্নু মুক্তি পেল, কেন মঞ্জীরা নিরুদ্দেশ—সবকিছুই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। মঞ্জীরার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানালো। মাথা নত করলে চিন্নু। মঞ্জীরা দেবী। চোখের জল ঝরে পড়ল। মঞ্জীরার কি সর্বনাশ করেছে সে।

এরপর অনেক খুঁজেছে মঞ্জীরাকে দেশে বিদেশে চিন্নু। পায়নি। মঞ্জীরার জন্য আফসোসের অন্ত ছিল না। অন্তত একটিবার দেখা না হলে দোষের কথা না জানালে, ক্ষমা না চাইলে—মরেও শান্তি হবে না।

অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরই শুধু জানা ছিল চিন্নুর এই মনোবেদনা। অন্তরঙ্গদের একজন রঙ্গন। মঞ্জীরার সংবাদ পেয়েই খবর দিয়ে আনিয়েছে চিন্নুকে রঙ্গন। তামিলনাদ থেকে সোজা কলকাতায় চলে এসেছে চিন্নু। দীর্ঘ বারোবছর পর মঞ্জীরার সাক্ষাত পাবে। বুকভরা আশা নিয়ে এসেছে।

মঞ্জীরার গান থামল। আবার হাততালির অভিনন্দন শোনা যাচ্ছে মাইকে।

মণ্ডপের গেট দিয়ে বেরুচ্ছে মঞ্জীরা। উদ্যোক্তারা পিছনে। হাতে ফুলের তোড়া-মালা। স্বেচ্ছাসেবকরা বৃত্তাকারে ঘিরে নিয়ে আসছে

মঞ্জীরাকে। গাড়িতে তুলে দিল ওরা। করজোড়ে চতুর্দিকে তাকালো একবার মঞ্জীরা।

গাড়ী চলছে।

কাছে আসবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে চিনু। পারছে না। একপাও নড়তে পারছে না। ফুটপাথ যেন দু'পা আঁকড়ে টেনে রেখেছে। ঠোঁট দুটি শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছে চিনুর। কথা বেরুচ্ছে না। মুখের কথা মনে তলিয়ে যাচ্ছে। দেখছে চিনু। মঞ্জীরার গলায় মঙ্গলসূত্র দুলছে। হলদে সূতোয় বাঁধা সোনার গোল চাকতি দুটোর মাঝখানের চৌকোণাটাই চক্‌চক্ করছে বেশি। মঞ্জীরা বাঁচিয়ে রেখেছে কন্ননকে —সুরের ভিতর দিয়ে, গানের ভিতর দিয়ে শিল্পীকে। বাঁচিয়ে রেখেছে মঙ্গল সূতোয়। চিনুর চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে যেন। চারকোণার খোদাই শিবদুর্গার মুখ দুটি কেমন হ'য়ে যাচ্ছে। কন্নন-মঞ্জীরার মুখ ভেসে উঠেছে। চিনু শুনছে কন্ননের কথা—কানামল পোনালতানে··· মঙ্গলসূত্র না হারালে আমার আত্মা বাঁধা থাকবে তোমার কাছে।

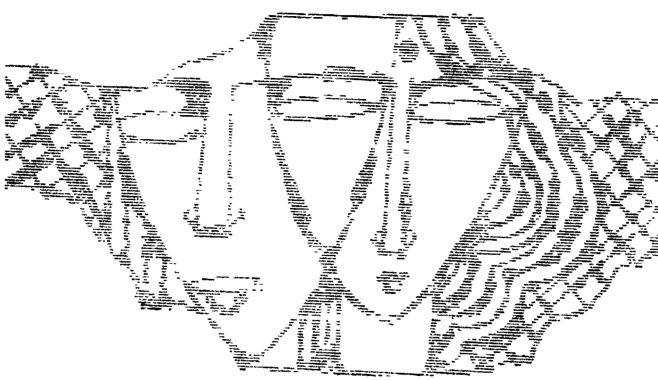
শ্রীমতী বাণী রায়

লোলিটা

লোলা সময় পায় না মোটে।

একদা নিম্নবিত্ত পিতার সন্তানরূপে সে যখন জন্মগ্রহণ করেছিল তখন তার নাম ছিল লীলা। একটু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখল পিতার বাড়ী ও গাড়ী। ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হয়ে নামটি পাল্টাল সে—'নাম রেখেছে লোলা।"

লোলা নামানুযায়ী কর্ম হল। জীবনের বিন্যাস ওই নামেরি পাকে



পাকে। যেমন আধুনিক ইঙ্গবঙ্গ তরুণী দেখা যায় সমাজের উচ্চস্তরে তেমনি দেখা দিল লীলা 'লোলা' রূপে।

এম-এ পাশ করে সে বসল বাড়ী আলো করে। বর্তমান যুগপরিধিতে সাধারণ এম-এ পাশের মূল্য এত অধিক নয় যে বিশেষ উচ্চপদ লাভ হবে। তাই লোলা গৃহে বসে পুরোপুরি সোসাইটি গের্ল হল।

তবু লোলা সময় পায় না।

নিদ্রাভঙ্গ আটটার পরে। চা-সংবাদপত্র ইত্যাদি নয়টা পর্যন্ত।

অতএব সুদীর্ঘ স্নানপর্ব। তারপরে প্রায়শঃ শপিং বা বন্ধুবান্ধব, কিঞ্চিৎ সমাজসেবামূলক কাজকর্মের প্রস্তুতি ও আয়োজন। এর মধ্যে টেলিফোনে কথাবলা, চিঠিলেখা আছে। একটায় লাঞ্চ। তিনটে পর্যন্ত অন্য প্রোগাম না থাকলে বিশ্রাম। তখন বিউটি স্লীপ ও নভেল পাঠ। সন্ধ্যা প্রত্যহ রঙীন। নিদ্রা প্রায় একটা রাত্রে।

এমন করে দিন কাটে—বসন্ত দিনে ফুলফোটা শেষ হয়। প্রথম গ্রীষ্মে ফুল ঝরে। কিন্তু আকাশে নামে না আষাঢ়।

কোন ভোজের আসরে একজন তরুণ সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ হল। নাম হলেও ঠিক ওই সার্কেলের লোক নয় সে ব্যক্তি। গেঁয়ো স্বাদ গায়ে মাখা।

অল্প বয়স তার, লোলার থেকে অবশ্যই ছোট। চোখে গভীরতা, অধরে তারুণ্য। প্রশস্ত ললাটে তার এখনও দীপ্তির ছাপ। প্রত্যেক দিনের একঘেয়েমীর মধ্যে পথচলার আঘাতে সে দীপ্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—যাবেও একদিন।

খাবার টেবিলে ভয়ে ভয়ে চলছে সে। এদিক-ওদিক চেয়ে আনাড়ি হাতে মাছের ছুরী, মাংসের ছুরী বেছে বেছে সন্তর্পণে তুলছে। সামনে তার জীবন্ত আধুনিকতা লোলা রায়।

ফ্রুট-স্যালাডে চামচে ডুবিয়ে লোলা স্থির সোজা লক্ষ্যে তাকাল তার দিকে। সারাক্ষণ ওই দুটি চোখের লক্ষ্য হয়েছিল লোলা। এবার লক্ষ্যকে লক্ষ্যভেদ করল।

লোলা পুরুষদৃষ্টি-পূজায় অভ্যস্ত। কারণ রূপ না থাকলেও দীপ্তি ছিল লোলার। কিন্তু সেই পূজা শাসিতরূপে প্রকাশ। পূজার যুগ চলে গেছে এখন। তবু বহু যুগের ওপার থেকে চিরন্তন পূজা বিংশ শতাব্দীর জর্জরিত বক্ষে ফিরে এল বুঝি।

খাবার পরে পানীয় গ্লাস হাতে পায়েপায়ে চলে এল তরুণ। চোখে চোখে সুরাপানের মত কাপ্তেন নয় সে। একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছে। অথচ ঈষৎ হলুদ পানপাত্রের ওপরে চোখে তার নীলাভ আকাশ—সেখানে ছায়া পড়েছে লোলার।

কৃষ্ণাভ বাদামী চুলের গোছা আস্তে আস্তে রূপালী হাত দিয়ে পাণ্ডু দালিমের মত কপালের পাশ থেকে সরাল লোলা। সোফায় হাত রেখে বলল, "বসুন না।"

গ্লাস নামিয়ে রেখে সঙ্কুচিত তরুণ সন্তর্পণে লোলার পাশে বসল। চুল তার এখনও আঙ্গুরের গুচ্ছের মত। বাতাস বইলে হয়তো সেই চুলের বাসা এলোমেলো হয়ে যায়। হয়তো বা সেখানে পলাতক কোন পাখী নামতে পারে। চুলের আড়ালে চঞ্চু তার ডুবে যায়। আবার পাখীর বাসা সেখানে বাঁধা হয়।

শীতের দিনে সে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে এসেছে। একটা হলুদে সাল পিঠের ওপর এলানো। শালের গাঢ় বাদামী রঙের লাল কাজগুলো এখন উজ্জ্বল নয় আর। হয়তো অনেকদিন আগের বস্তু।

লোলা চোখ নামিয়ে বসে রইল। গাঢ় ছাই রঙের শাড়ীটি টেনে কাঁধের ওপরে দিয়ে নামিয়ে আনল। হঠাৎ বুঝি শীত শীত করছে। চোখের পল্লব দীর্ঘ লোলার। কিন্তু এখন সেখানে অন্ধকার ছায়া। জীবনে বুঝি বিষাদ ওর চোখের পল্লবগুলো অমন কালো করেছে। সোসাইটি গের্ল-এর একঘেয়ে জীবন বোধহয় অনেকদিন হয়েই গেছে।

"আপনার পুরো নামটি জানতে ইচ্ছে হয়।"

"আমার নাম লোলা রায়।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে যেন গান বেজে উঠল। তরুণের কণ্ঠে সুর জেগে উঠল ঘরের সামান্য সাধারণ পরিবেশে। সেই সুর হ্যাটর‍্যাকে—সেই সুর ডিভানের গায়ে।

"লোলা? বা, বা! লোলা! লোলা—ললিটা!"

লোলা চমকিত হল। নবোকভের নায়িকার সঙ্গে তার নামের মিল আগে কেউ দেখেনি।

টুক্ টুক্ পি-আনোর ঝঙ্কারের মত টুক্‌টুক্ করে আল্‌গা আল্‌গা সুর বেজে বেজে একটা গান আবার লোপ হয়ে গেল। তারই রেশ বাজতে লাগল এখানে ওখানে।

পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁয় বসে লোলা বলে উঠল, "কেন যে চা খাওয়াতে নিমন্ত্রণ করলেন, বুঝলাম না।"

কাঁপা-ভাঙা গলায় সম্বরণ বলল, "ইচ্ছে হয়েছিল, তাই।"

চা ঢেলে নিয়ে বাঁ হাতে স্যাণ্ডউইচ-এ কামড় লাগাল লোলা। আস্তে ফুলকাটা রুমাল বার করে ঠোঁট মুছল। ঠোঁটের রং আর নখের রং ডালিমফুলী। আজ শাড়ীখানাও তার জয়পুরী—হাল্কা রংয়ের ডালিম সে শাড়ীর গায়ে গায়ে ফেটেছে। নিজের নিভন্ত দিনে একটা রংয়ের পাড় বসাতে চেয়েছে লোলা। অনেক দেখার শ্রান্তিতে শ্রান্ত চোখের তারায় রং জ্বালার বাসনা তার।

"আপনার পরিচয়ের মধ্যে জানলাম শুধু আপনি 'দিগন্ত' পত্রে আছেন।"

"এই সমস্ত পার্টিতে আমি যাবার ছাড়পত্র পাই না। সেদিন হঠাৎ ওপরের সকলেই অন্যত্র আবদ্ধ ছিলেন—তাই আমাকে যেতে হল।"

বাঁকা চোখে চেয়ে দেখল লোলা। বেশ-ভুষায় সাধারণ ছাপ। এত দামী চা-করে ডাকা তার পর্যায়ের লোকের পক্ষে উচিত হয়নি।

এ কে, উদ্বাহু বামন কিম্বা চালিয়াৎ?

অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। মিথ্যাবাদীর কপট পরিচয়ে ও কি লোলার সমাজপরিধির দিকে হাত বাড়াচ্ছে?

"কিন্তু লোকের অন্য পরিচয়ও তো থাকে?" লোলা কথা টেনে নিয়ে গেল।

"কি পরিচয় চান আপনি?" হাসিমুখে সম্বরণ জিজ্ঞাসা করল।

"পরিচয় সামাজিক আছে, পারিবারিক আছে, সাংস্কৃতিক আছে।"

"সামাজিক, নিম্নমধ্যবিত্ত"—ভীরু গলায় বলে চলল সম্বরণ, পারিবারিক, বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে। একান্নবর্তী পরিবারের নাম শুনে আজকাল লোকে ভয় পায়। সাংস্কৃতিক, বিশেষ কিছুই নয়। আপনার কাছে মিথ্যা বলব না। এম-এ'টা পাশ করিনি। তবু তো আপনাকে খুঁজে বার করলাম।"

এ কী ভাষা! সোজা-সহজ। কিন্তু দৃঢ়প্রত্যয়শালী। বিমনা হয়ে

লোলা ছোট টেবিলটায় চোখ নামিয়ে রইল। নবোকভের ললিটা সে নয়—হবেও না কোনদিন। তরুণ কিশলয় বয়স বহুদিন পার হয়ে গেছে। পাপের হস্তলিপি হয়ে কালের বুকে ফুটে উঠতে সে সুযোগ পায়নি। সাধারণ নারীর যা চাহিদা, তারও তাই।

ইতস্তত করে সে বলল, "বাড়ীতে কে কে আছেন?"

"মা, দাদারা, কাকারা, আর আমি। সকলেরি নিজস্ব একটি করে ইউনিট আছে। বাবা মারা যাওয়ায় মা ইউনিট ভ্রষ্ট।"

"আপনার?" সাগ্রহে লোলা প্রশ্ন করল।

"আমার ইউনিটে আমার স্ত্রী আর ছোট মেয়েটি।"

পি-আনোর কর্ড এবার ভাঙ্গাস্বরে শেষ হল।

তবু তো—

লোলা, ললিটা!

আমার স্বর্গ ও নরক, আমার পাপ, আমার মুক্তি।

দিনগুলো লোলার বিরক্ত হয়ে ওঠে। কি করে সে বোঝাবে সম্বরণকে তার সময় নেই? খেলাধুলার দিন তার শেষ হয়েছে। যেখানে পরিণতি নেই, সেখানে লোলা আর সময় কাটাতে পারে না।

সম্বরণের ডাকার বিরতি নেই।

টেলিফোনে সে শতবার ডাকে লোলাকে, চিঠি লেখে ক্রমাগত। উত্তর না দিলে অভিমান হয় তার। চায়ের নিমন্ত্রণ জানায় ক্রমাগত।

দুই-চারবার লোলাকে চা-খাওয়াবার পরে লোলা লক্ষ্য করে দেখল হাতে পাথরের আংটিটা নেই তার। লাল একটা পাথর বসানো মরা সোনার আংটি ছিল। হয় পৈতে নয় বিবাহ উপলক্ষে পাওয়া।

তারপরে সম্বরণ চায়ে ডাকলে কোন না কোন অজুহাতে লোলা না করত। সে নিয়ে মানাভিমানেরও অন্ত ছিল না। মাঝে মাঝে নিজের বাড়ীতে বাধ্য হয়ে তাকে ডাকতে হত লোলার।

ভিখারীর মত যে লোক চেয়ে থাকে লোলার লোলার দিকে লোলার সামান্য ভ্রূকুঞ্চনে যার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, তাকে নিয়ে চলা বিপদ। অথচ ছাড়বে না সে লোলাকে।

"আপনি বিবাহিত আপনি পিতা। এভাবে আমার সঙ্গে-

একদিন দ্বিধার বাধা কাটিয়ে লোলা বলেছিল, "আপনার স্ত্রী জানেন যে আপনি আমার সঙ্গে মিশছেন এত ?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি কিছু মনে করেন না ?"

"না তো। আমি অনেক লোকের সঙ্গেই মিশি ওভাবে হয়তো তাই।"

"আপনি এত—বাইরে ঘোরা ছাড়ুন।" লোলা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল।

গায়ের জামার মত শাদা হয়ে উঠল সম্বরণের মুখ।

"না, না। না।" বলে উঠল সম্বরণ।

"না কি। আমার সঙ্গে মেশা হবে না আপনার।" তর্জন করে বলে উঠেছিল লোলা।

"লোলা, ললিটা! আমাকে দয়া কর। এমন কথা বলো না।"

শিহরিতা লোলা চুপ করে গিয়েছিল।

তারপরে ?

দিনগুলো জট বেঁধে গেল লোলার। হাস্কা মেঘে ভাসা দিনগুলো শ্রাবণের বর্ষণবিকারে ভারী হয়ে উঠল।

যে প্রেমে শেষ দিগন্ত দেখা যায় না, কুয়াশায় আবৃত যার দিগন্ত, তেমন প্রেমে মনে শুধু আসে নৈরাশ্য। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের স্বল্পবিত্ত ছেলে স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে। সে ঘর ভাঙ্গতে চায় না লোলা।

ভেঙ্গে যা পাবে, তাতে লোলার চলবে না।

অথচ সম্বরণ বারণ শোনে না। এড়ানো যায় না তাকে।

ধর্মতলা দিয়ে গাড়ী চলছিল সেদিন লোলার বালিগঞ্জের দিকে। বাবাকে হাওড়ায় তুলে দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল বাড়ীতে।

একটু বিষণ্ণ ঔদাস্যে রাস্তার দুপাশে পেভমেণ্টের দোকান দেখতে দেখতে চলেছে লোলা। চৌরঙ্গী পাড়ার এধারে বাজার করতে আসে না সে। এখানে নাকি খুবই সস্তায় জিনিষপত্র পাওয়া যায়, বন্ধুরা বলেছে।

আজকাল মন ভালো থাকে না লোলার। সম্বরণ তার প্রেমকে

সম্বরণ করবে না, বারণ শুনবে না। ও রকম 'ড্যাম্পিশ নোবাডি' লোককে লোলার দারোয়ান ও বেয়ারাই আদেশ পেলে ঠেকিয়ে রাখত। কিন্তু লোলা সে আদেশ দেয়নি। কেন লোলা সস্তা সাংবাদিককে সরাতে পারছে না, জানে না সে।

শুধু মন তার অবসাদে নিভে আসছে। অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে আছে লোলা।

রাস্তার বেসাতির ওপর ঝুকে সম্বরণের মত দর্শনধারী এক ব্যক্তি কি যেন কিনছেন। ঠিক যেন সম্বরণ।

ও তো সম্বরণই। আরে! সোজা হয়ে বসল লোলা। বেলা প্রায় এগারোটা। ফুটপাতের সস্তা পশরা মেলার ধারে উবু হয়ে বসে সম্বরণ কি কিনছে?

হয়তো পত্নীর জন্য সস্তা প্ল্যাষ্টিকের চিরুণী কিম্বা কন্যার জন্য খেলনা। এখানে? এই পরিবেশে?

এই তো ওর যোগ্যস্থান। একান্ত সংসারী লোকটি ছিটকে এসেছে লোলার কাছে। সে প্রেমিক নয়, সুবিধাবাদী।

বিষণ্ণ মন লোলার শক্ত হয়ে উঠল। আত্মগ্লানির উদয় হল।

তারপরে কয়েকদিনের মধ্যে লোলা চলে গেল বোম্বাই শহরে পিসতুতো দিদির বাড়ী। জামাইবাবু আধুনিক ও ধনী, দিদি স্নেহশীলা। এখানে সম্বরণকে জানিয়ে গেল না।

চন্দ্রালোকে জুহু বীচ, প্রমোদ ভ্রমণের স্বর্গ।

শীতের সন্ধ্যা, কিন্তু শীতের চিহ্ন নেই এখানে। চির বসন্ত বিরাজমান। ছোট ছোট ঢেউ নিয়ে সমুদ্র সমতল বালির বিছানায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। আধো অন্ধকারে দলে দলে লোকের সেখানে নানা আনন্দের আবর্তে গতায়াত। কলেজের ছাত্রছাত্রী স্ল্যাকস সালোয়ার পরা খালি পায়ে সোনার মত উজ্জ্বল মিহি বালু ঠেলে ঠেলে জলের ধারে নেমে আসছে। ঝিরঝিরে জল তাদের পা ভিজিয়ে দিচ্ছে, জামা-কাপড়ের নিম্নাংশ ভিজিয়ে দিচ্ছে। কল কোলাহলে ছুটে তারা পালাচ্ছে, আবার জলের বুকে নেমে আসছে।

প্রবল বাতাসে জামা-কাপড় গায়ে লেগে যায়, গঠন-শ্রী ফুলে ওঠে। কামনার স্বর্গ জুহুসৈকত।

লোলা এসেছে এখানে, পরিবারের সঙ্গে। দিদি জামাইবাবুর বন্ধুর দল এসেছে।

হৈ-চৈ চলছে কলিকাতাবাসিনী অনূঢ়া, আধুনিকা লোলাকে কেন্দ্র করে। পুরুষের ছোট একটি দল ঘিরে আছে ওকে।

'লোলা, বল তো কাকে পছন্দ তোমার? এরা সবাই যে শেষে ডুএল লড়ে ধ্বংস হবে।" জামাইবাবু সহাস্য প্রশ্ন করলেন। 'কি যে বলেন, অসিতদা!" লোলা অনুযোগে স্বর অসহিষ্ণু করে তুলল।

এদের সঙ্গে সামান্য আলাপ তার, গভীরতার প্রশ্ন ওঠে না। তবু তার সমাজে এমন রসিকতার চালান আসে অবিরত।

এদের কাউকে ভাল লাগে না। মনে হয়, বাইরে পোষাকপরানো ডামি। অন্তঃসারশূন্যতা কথাবার্তায়, চলাফেরায় প্রকট হয়ে উঠছে।

"না, না, বেছে নিতে হবে, নিন একজনকে।" হাল্কা পরিহাসটাকে বিলম্বিত করে নূতন রসক্ষেত্র সৃষ্টি করল তারা। চাঁদের আলোয়, শান্ত সমুদ্রের মৃদু ঘুমপাড়ানিয়া গর্জনে যেন নেশা জমে উঠেছিল।

ব্যারিষ্টার অমরেশ বসু এগিয়ে এল। আস্তে কাঁধে হাত রাখল তার, পাইপ-ধরা ঠোঁটে টিপে টিপে বলল, "না হে না, তরুণের দল। আমরা দুজনই পৃথিবী বহুদিন দেখেছি। লোলা ইজ মাই গের্ল।"

অমরেশ বসুর সম্প্রতি দ্বিতীয়া পত্নী শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা চলছে। বয়স হয়েছে তাঁর চল্লিশ! মেদসম্পন্ন বেঁটে চেহারা, কালবর্ণ, বর্তুলাকার মুখে মেচেতার ছাপ।

লোলার মুখ চাঁদের আলোয় নীলাভ হয়ে গেল অপমানে। তখনি উঠে এল অন্ধকার সমুদ্র কিনারা থেকে অস্পষ্ট যেন জলদেবতা কোনো। দু-একটি লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল সে এতক্ষণ দূরে।

বালি বেয়ে আসতে হচ্ছে, পায়ে জোর লাগছে। তাই দেহ ঈষৎ অবনত তার। বাতাসে গায়ের জামা ফুলে ফুলে উঠছে। স্থির লক্ষ্যে সে দৃঢ়ভাবে জটলার দিকে এগিয়ে এল।

লোলার কাঁধে তখনও প্রৌঢ় লম্পটের হাত থাবার মত আঁকড়ে আছে। হাসছে সকলে তাদের ঘিরে।

কঠিন হাতে লোলার মণিবন্ধ চেপে ধরল আগন্তুক, দৃপ্ত গলায় বলল, ' নো, শী ইস মাই গের্ল।"

তরুণ সুন্দর একখানা মুখ। চুলের থোকায় তার সামুদ্রিক বাতাসের খেলা। দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ অঙ্গ তার। লোলা চমকে উঠল। সারা জটলায় তখন চমক লেগেছে। লোলার দিদি জামাইবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। হাসিঠাট্টার কথার মধ্যে সম্পূর্ণ বাইরের ব্যক্তি চলে এল কেন?

"তুমি? এখানে এসেছ?" লোলার প্রশ্নে সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ। অল্প টাকায় একটা ট্যুরের লোভ ছাড়তে পারিনি। তুমি এখানে আছ, তা অবশ্য জানতাম না। জুহুতে এসে পেলাম।"

"সম্বরণ,—তুমি কি একা—?" প্রশ্ন পাঠাল লোলা।

"না, একা নই।" অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে সম্বরণ বলল, "আমার স্ত্রী ও মেয়েও এসেছে। ঐ যে ওখানে তারা দাঁড়িয়ে।" জলের দিকে আঙুল দেখাল সে।

জলের ধারে বালির কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে সজীব পোঁটলা একটি। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অশিক্ষিতা ঘরোয়া বৌ। ভুল হবে না কারুর যে জড়দগবকে টেনে এনেছে উৎসাহী স্বামী। সস্তা পোষাকে মোড়া সন্তানটি গেঁয়ো মেয়েদের মত ট্যাঁকে গোঁজা।

এরই স্বামী সকলের সম্মুখে লোলার হাত ধরে টেনে বলতে সাহস পায় লোলা তার প্রিয়া!

অসহ্য রাগে লোলার সভ্যতার বাঁধ ভেঙ্গে গেল। ঝাঁকুনী দিয়ে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বলে উঠল সে, "কী আস্পর্ধা!" আমার কাজ নেই তোমার মত একটা লোকের—তায় আবার বিবাহিত, মেয়ের বাবা! আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখোনা। আমার সাম্‌নে থেকে দূর হয়ে যাও।"

লোলা নিজেই গট্‌গট্ করে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল উঠে বালি পেরিয়ে পথের দিকে।

পেছনে জটলা শতধা হাসিতে ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

কিছুদিন পরে অনেক দূর থেকে একখানা চিঠি এল—'লোলা আমার পাপ, আমার স্বর্গ! তেরো হাজার ফিট উঁচু থেকে তোমাকে এই চিঠি লিখছি। আমি এখন নেফা এলাকায়। বাড়ীতে মিথ্যা বলে পালিয়ে এসেছি এখানে আমি। সাংবাদিক হিসাবে দেশের প্রতি আমার কর্তব্য করা হয়নি।

আমি নবোকভের নায়ক নই। স্ত্রীর প্রতি উদাসীন না হয়েও তোমাকে ভালবেসেছিলাম সত্য। সেজন্য আমাকে তুমি ঘৃণা করেছ, তা-ও জানি। আমি চরিত্রহীন নই। দুটো ভালবাসাই আমার কাছে সত্য। কিন্তু তারা বিভিন্ন রকম।

আজ এখানে এসেছি আর এক ভালবাসার টানে। আমার চারদিকে নির্মম—বিশ্বাসঘাতক শত্রু। যে কোন উপায়েই পররাজ্য-গ্রাসী, লোলুপ পরদেশী ড্রাগনের গ্রাসে হয়তো আমার মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই এসেছি। তবু এই ভালবাসা আমাকে ঘর থেকে টেনে এনেছে।

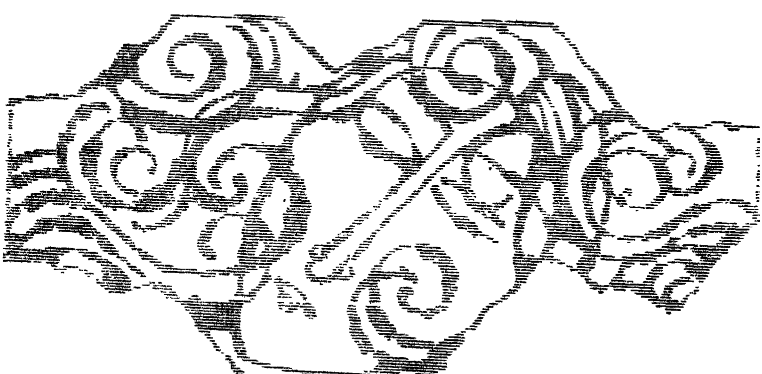
লোলা, ললিটা! আমার জীবনে এই তিন ভালবাসার সমন্বয়ে গড়া মানুষ আমি। কোন্ ভালবাসা আমার কাছে শ্রেষ্ঠ এখনও জানা হয়নি! —সম্বরণ

দেবেশ দাশ

বিজয়া দশমী

দেশের জন্য প্রায়ই বড্ড মন কেমন করে। এই বিলেতের বরফ-মারা ঠাণ্ডায় হাত-পাগুলো একেবারে কালী মেরে যায়। সূর্য্যিমামার মুখ দেখিনি বোধ হয় মাস তিনেক। আর বাপ-মার কাছে আবার যে কবে ফিরে যাব তারও ঠিক নেই। মনের অবস্থাটা তা'হলে কেমন তা বুঝতেই পারছেন। শীতের মতন মনকে তো আর মাফলার-ওভারকোট চড়িয়ে গরম রাখা যায় না।

এমনি একটা শীতের রাতে কলেজ থেকে বাড়ি ফিরবার সময় ল্যাণ্ড-



লেডির মুখটা মনে পড়ল। একে দেশ থেকে ঠিক সময়ে টাকা আসেনি বলে এ সপ্তাহের ভাড়া আর খাবারের বিল মেটাতে পারি নি, তায় ঘরে ফিরে ওকেই অনুরোধ করতে হবে—কয়লা দিয়ে ফায়ার-প্লেসটা জ্বালিয়ে দিয়ে যেতে। চুল্লীতে যদি কয়লার বদলে আমার মনকে বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সম্ভবত দেশলাইয়ের কোন দরকার হবে না আজ। বুড়ীর ঠাণ্ডা চাহনিতেই জ্বালিয়ে দেবার মত আগুন থাকবে প্রচুর।

কিন্তু সেজন্য নয়। এমনিতে বাড়ির জন্য মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে ছিল। তাই সোজা ঘরে না ফিরে ডিনারটা সেরে নিতে গেলাম কাফে ইণ্ডিয়ানে। গেলাম দেরিতে। যাতে বসে থাকতে পারি অনেকক্ষণ। তার চেয়ে বড় কথা—ঘরে পৌঁছে আর চুল্লী জ্বালাতে হবে না। সোজা বিছানায় গিয়ে যাকে বলে সেই পিঠের একসারসাইজ করা।

তা পিঠের ব্যায়াম ছাড়া আর কি-ই বা বলা যায়? আজ রাতে ঘুম আসার আশা নেই। ক্রিসমাস ইভ—কাল থেকে বড়দিনের ছুটি। সারাটা বিলেত তেড়ে ছুটে চলেছে নিজের নিজের প্রিয়জনের কাছে। আর আমি লাজুক কুণো বাঙালী ঘরের ছেলে। আমি ছুটে যাব কার কাছে? তায় তা আবার বাড়ী থেকে টাকা আসতে দেরি হচ্ছে।

ঝাল-মশলার সোয়াদ ছাড়া বিলেতী রোষ্ট আর গ্রীল খাওয়া জিবে ততক্ষণে বেশ জল এসে গেছে। মাছের ঝোলটা আঃ, কি ফার্ষ্ট—কেলাসই না হয়েছিল। ঝাল খেতে অনভ্যাসের জন্য জিবের জল আর চোখের জল পাল্লা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। কৃপণের ধনের মত খুঁটে খুঁটে খাচ্ছি আর চুপিসাড়ে চোখ মুছে নিচ্ছি।

ততক্ষণে কাফে ইণ্ডিয়ান প্রায় খালি। রেডিওর বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু পাশের টেবিলে একটু টুং-টাং আওয়াজ কানে এল। তাকিয়ে দেখি—সোনার চুড়ির আওয়াজ। আচ্ছা, ঠিক জলতরঙ্গের মত মিঠে শোনাচ্ছে, না যে?

ভদ্রমহিলাও আমার দিকে তাকালেন। মুখে একটু মৃদু হাসি। প্রসন্ন আভা ছড়ানো। যেন শরৎকালে আমাদের তুধন নদীর পারে ঝাঁকে ঝাঁকে কাশফুল ফুটে আছে।

প্রায় একই সময়ে তুজনেই উঠে পড়লাম। বাইরে ঝুরঝুর করে বরফ পড়ছে। ওভারকোট আর টুপি ঝোলানোর ট্রি' অর্থাৎ গাছ থেকে তিনি ওভারকোট তুলে নিতেই আমি ওঁর অনুমতি নিয়ে ওঁর গায়ে সেটা পরিয়ে দিলাম। দরজাটা খুলে ধরলাম, উনি যাতে আগে বেরোতে পারেন। বিনিময়ে পেলাম একটু মিষ্টি হাসি আর ধন্যবাদ।

ল্যাণ্ড-লেডির গোমড়া মুখ আর বরফ-শীতল চাহনির কথা ভুলে গেলাম।

আর একটু এগোতেই রাস্তায় বাংলা কথা শুনে চমকে উঠলাম। সেই মহিলাই বটে! একটা ট্যাক্সি থেকে মুখ বের করে আমি কোন্ দিকে যাব জিজ্ঞেস করলেন। হ্যাম্পষ্টেডে যাব শুনে বললেন—আসুন না আমার সঙ্গে ট্যাক্সিতে। আমি যাচ্ছি প্রিনরোজ হিল। অনেকটা পথ একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

অপরিচিতা বটে, কিন্তু আমারই দেশের একজন রূপসী যুবতী। বাইরে বরফ পড়ছে বলে নয়, উনি একা যাবেন, বাংলায় ডেকেছেন। আমি যদি এটুকু কথাও না রাখি, তাহলে বিলেতে এসে সভ্যতা শিখলাম কোথায়?

ওঁর বাড়ির দরজায় সামনে এসে নামলাম। চাবি দিয়ে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি শুভরাত্রি জানিয়ে চলে আসছি, এমন সময় আবার উনি ডাকলেন,—আসুন না একটু ভেতরে; কফি খেয়ে যাবেন। আর সন্দেশ, নিজের হাতে বানানো। অবশ্য আপনার যদি দেরি না হয়ে যায়—

একজন নতুন-চেনা যুবতী মহিলার ঘরে এত রাতে কি করে যাওয়া যায়? কিন্তু সন্দেশ, ওর নিজের হাতে করা! সেটার নেমন্তন্ন তো আর এই দূর বিদেশে ফেলে দেওয়া যায় না?

ভদ্রমহিলার বাড়ির অবস্থা বেশ ভালই। আমাদের মত একখানা বেড-সিটিং রুম—শোয়া-বসার ঘর নয়। আলাদা একটা বৈঠকখানা! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। স্বদেশী বিদেশী কোন সামাজিক রীতিতেই আমায় দূষতে পারবে না। তিল থেকে তাল বানানোর লোকের তো অভাব নেই।

বিলেতে একজন সুন্দরী বাঙালী মহিলা—হ্যাঁ অবশ্যই তাকিয়ে দেখবার কথা। এখানে তো আর লুকিয়ে লুকিয়ে তাকাতে হবে না। সহজ দৃষ্টিতে দেখলে এদেশে কোন অসভ্যতা হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে একবার বৈঠকখানাটাও ভাল করে দেখে নেওয়া যাক। লোকের পরিচয় ছড়ানো থাকে বৈঠকখানায়, শোবার ঘরে।

ম্যান্টল-পীসে দুখানা ছবি। দুটোরই দুপাশে সাজানো ফুলদানি।

তাতে টাটকা ফুল, রোজ বদলানো হয় চারটে ফুলদানিই। ব্যাপার কি!

ভাই আর স্বামী! হুঃ। তুই ভাই? না, তাও না। তুই বন্ধু? হতেই পারে না। একজন চোস্ত মিলিটারী ইউনিফর্ম পরা, আরেকজন বেশ চালাক, কিন্তু দেশী সাবেকী ঢঙের ধুতি পাঞ্জাবি পরা। তবে কি জগৎ সিংহ—ওসমান? ধেৎ, ভাবতেই হাসি পেল। যিনি নিজের দেশের অচেনা লোককে ডেকে হাতের তৈরী সন্দেহ খাওয়ান তার সম্বন্ধে এ-সব কথাই ওঠা ঠিক নয়!

কি, হাসছেন যে মিস্টার রয় আমার আনাড়ী গিন্নীপনা দেখে হাসি পাচ্ছে? তা, নিজের ঘরে চা-কোকো তৈরী করা আপনারও বোধ হয় অভ্যেস আছে?

না, না, মিসেস চৌধুরী। আপনার কফির সুন্দর গন্ধে মনটা খুশি হয়ে গেছে, তাই।

একেবারে বাঙালী মেয়ে বটে। এটুকু কথাতেই গলে গেলেন। পরের দিন অর্থাৎ বড়দিনের দিন রাতে ওর ফ্ল্যাটে এসে খিচুড়ী খাবার নিমন্ত্রণ করে ফেললেন।

মহাখুশি হয়ে বরফের মধ্যে দিয়ে হেঁটে ফিরে চলেছি। ক্রিসমাসের রাতে এদেশে নেই লুটোপাটি, হৈ-হল্লা। স্বজনদের সঙ্গে ওরা চুপচাপ নিরেমিষ আনন্দে দিন কাটায়, সন্ধ্যা ভরে তোলে। মিসেস চৌধুরী এ হেন রাতের জন্য আমাকে ডেকে নিলেন। এম. সি এই দুটো অক্ষর সই করা ছবিটা বোধ হয় শ্রীমতীর স্বামীর। সি অর্থাৎ চৌধুরী। কিন্তু এম? এম? নিশ্চয় শ্রীমতীর ভাই নয়—আর যাই হোন, একেবারে দেশী ধাচের লোকের বোন হতে পারেন না তিনি।

২

নো ডার্লিং, নো!

হঠাৎ কথাটা শুনে থমকে দাঁড়ালাম।

দুটো ছবি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। সারাদিন ঠেসে

পড়তে হয়েছে। সন্ধ্যে সাতটার সময় মিসেস চৌধুরীর দরজার সামনে ঘন্টি টিপব, এমন সময় শুনতে পেলাম ওর গলা। দরজার ঠিক ওপারেই কাকে তিনি বলছেন, নো, ডার্লিং, নো!

একটু থেমে অপেক্ষা করতে হল। কিন্তু কৌতূহলও কম নয়। কানে তো আর তুলো গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না! বিশেষ করে এমন একটা কথা শোনার পরে। ছবি দুটোর কথাও মনে পড়ল।

না, আমি আর দেশে ফিরে আসতে পারি না। তুমি বোঝ না কেন ডার্লিং।......

এখনও তোমায় ভালবাসি। সেজন্যই ফিরতে পারব না। কিন্তু সে কথা থাক। .....

শুধু তোমার স্ত্রী নয়, তোমার কথা আর এমন কি আমার কথা ভেবেও আমার পক্ষে ফেরা সম্ভব নয়।......

এক তরফা কথা শুনতে পাচ্ছি। তাহলে টেলিফোনেই আলাপ চলছে। হ্যাঁ, ঠিকই তো। টেলিফোনটা তো দরজার ঠিক পাশেই ছিল দেখেছি কাল রাত্রে। কান পেতে রইলাম।

না, 'সু'র ডাকেও ফিরব না। সে-ও আমায় খালি বলছে, ফিরে এস। কিন্তু সবচেয়ে ভাল হচ্ছে—না আসা।......

ঠিক, এটা দুর্বল লোকের কথা মনে করতে পার। কিন্তু আমি যে বড় দুর্বল, মুরলী। 'সু'র কাছ থেকেও এমন কোন বল পাইনি যে তোমার ডাককে একেবারে উপেক্ষা করতে পারব।...

না, না, তাকেও ছাড়তে পারব না। আমার অসহায় মুহূর্তে সে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, নিজেকে আবার গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। ভুলো না যে তাকে আমি বিয়ে করেছি। প্লিজ, প্লিজ। আমার কথা ভাব। বি কাইণ্ড টু মি...

জানি, তোমারও খুব কষ্ট হচ্ছে। 'সু'রও কষ্ট হবে। তার চেয়ে আমায় এখানে একা থাকতে দাও তোমরা। আমি ফিরতে চাই না দেশে। কিন্তু হ্যাপি ক্রিসমাস টু ইউ, ডার্লিং।

তিন মিনিট আন্দাজ কথা চলার পর বন্ধ হয়ে গেল। ফিরে যাব

না, ভিতরে আসব এখন? দুটো ছবির সমস্যাটার উপর একটা নতুন আলো পড়েছে। একটু ভেবে দেখা দরকার।

শেষ পর্যন্ত ইতস্তত করতে করতে ঘণ্টাটা টিপেই দিলাম। শ্রীমতী দরজা খুলে দিলেন। মিনিট খানেক সময় লাগল। কিন্তু যে রকম হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন তাতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল বলে মনে হল না।

বেশ ঘটা করে হৈ-চৈ করে তিনি বড়দিনের শুভেচ্ছা জানলেন। নিজ থেকেই দুষ্টুমি করে বললেন যে, কালকের জন্য কড়িকাঠে 'মিসল-টো' ডাল টাঙ্গানোর বন্দোবস্ত করছেন না? অর্থাৎ 'বকসিং ডে'তে অবাধ চুমু খাবার এই সুযোগটা কাল তার ঘরে থাকবে না?

হেসে ফেললাম। বাইরে এত হাড়কাঁপানো শীত, আর ভিতরে এমন মন-মাতানো উত্তাপ। ভুলে গেলাম টেলিফোনের কথা, ম্যান্টল-পীসে (আতস খানার উপরে) সাজানো ছবি দুখানা।

বললাম—তা 'মিসল-টো'র দরকার কি? এত ফুল দিয়ে ঘর ভরে রেখেছেন। তা অবশ্য আর্যপুত্রীরা এসময় সাধারণতঃ ফুল ভালবাসেন।

চোখ বড় বড় করে উনি বললেন – আর্যপুত্রী?

হ্যাঁ, আপনাকে দেখে আমার রূপে-গুণে মমতায় সব দিক থেকে মহীয়সী মহিলাদের কথাই মনে হয়। তাই সংস্কৃত কথটা বললাম। কেন বললাম যে আপনারা ফুল ভালবাসেন! ওই ভালবাসাটা উভয়ত। ফুলও তো আপনাদের ভালবাসে। দু পক্ষই সৌরভ বিলায়—তাই।

মৃদু হেসে ফেললেন তিনি—বড্ড ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন আপনি এ সব কথা বলে!

ভয় কেন? ফুল শুকোয়, চাঁদের কলা কমে যায়, কিন্তু শুধু মেয়েরাই দিনে দিনে বিকশিত হয়ে ওঠে।

বলেই ভাবলাম যে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বলতে গেলে প্রথম দিনের আলাপ। কি জানি কি ভাববেন। মনের কথা পড়বার কল বিজ্ঞান বের করতে পেরেছে। কিন্তু মেয়েদের মন নয়। কারণ তার যে তলও নেই, সীমাও নেই।

একেবারে কামিনীভোগ চালের সুবাস। তার উপর খাঁটি গরুর দুধের মাখন। বাঃ, এই রুইয়ের পেটি-ভাজা পেলেন কোথায়, মিসেস চৌধুরী?

উনি প্রসন্ন হেসে বললেন, না রুই নয়। হোয়াইটিং মাছ। স্বাদটা অনেকটা এ রকম।

আর এ যে বেগুন দেখছি। বাঃ চমৎকার বেগুন! মাশরুমের (ব্যাঙের ছাতা) চেয়ে ভাল।

হ্যাঁ, বেগুনই তো এটা। স্পেনের জিনিস। নাম ওবর জিন। ব্রিন্‌জাল ইংরেজী কথাটা ওই থেকে এসেছে।

আদর্শ গৃহিণী আপনি। আহা, চৌধুরী সাহেব কি ভাগ্যবান!

মন্তব্যটা অবশ্য ইচ্ছা করে করলাম।

উনি সরমে পুলকিত হলেন কি? মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সরমের কোন ছোপ না দেখে হঠাৎ বলে ফেললাম, —কই কর্তার নামে যে বড় ব্লাশ করলেন না?

হেসে জবাব দিলেন—ব্লাশ জিনিসটা যখন স্বাভাবিক ছিল, তখন তার মেয়াদ ছিল কম। এখন ম্যাক্স ফ্যাক্টরের কল্যাণে সাঁঝ থেকে রাত ভোর তক জেগে থাকে মুখের উপর। সে জন্যই আপনাদের নজর পড়ে না।

মুগ্ধ হয়ে গেলাম ওর রূপের ছটায়, কথার ঘটায়। বললাম—সত্যি, আপনি এত দিল-খোলা, এত সরল যে মুখের উপরেই প্রশংসা করতে ইচ্ছা হচ্ছে! আচ্ছা, আপনিই বলুন না, এদেশে মেয়েরা এত সব সময় সাজে-গোজে কেন? শুধু পুরুষের নজর কুড়োতে? না, অন্য মেয়েদের হিংসা জাগাতে?

দুই-ই, দুই-ই মিষ্টার রয়। আর তাছড়া উপরি লাভ আয়নায় নিজের হাসি।

আবার ওঁর হাসিমুখের দিকে তাকালাম। আর একবার ম্যান্টিল-পীসের উপর রাখা দুখানা ছবির দিকে। কার জন্য মিসেস চৌধুরীর মুখের হাসি? কার বুকে জাগায় তা বেদনা? কার খুশির ছায়া পড়ে তার মনের আয়নায়?

কিন্তু ভাবতে হল না। ক্রিং-ক্রিং করে আবার টেলিফোন বেজে উঠল। ওদিককার কথা অনেকখানি শোনা যাচ্ছে। রেডিও টেলিফোন এসেছে। কলকাতা থেকে। মিষ্টার চৌধুরী ডাকছেন।

শ্রীমতী চৌধুরী একবার আমার দিকে তাকালেন। একবার ম্যান্টল-পীসে ছবি দু'খানার দিকে। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করবার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু উনি আঙুল নেড়ে মানা করলেন। উনি করছেন এত ভদ্রতা, কিন্তু আমি অভদ্র হই কি করে?

প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে যেন কিছুই শুনছি না এ রকম ভাব দেখিয়ে বইয়ের তাকগুলি দেখতে লাগলাম! খুব মনোযোগ দিয়ে। যেন পরীক্ষা পাশের মন্ত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কানে তো আর ছিপি দিয়ে রাখি নি!

হ্যাপি, মোস্ট হ্যাপি ক্রিসমাস টু ইউ ডার্লিং। আশা করি খুব ভাল আছ।

এখানে বরফ পড়ছে বটে। তবে তুমি ভেব না। না, না তোমায় আসতে হবে না।......

না, না, না। তোমায় ভালবাসতে চাই বলেই কাছে যেতে চাই না। তুমি তো সবই বোঝ, সু।......

প্লিজ, ভুল বুঝো না। তোমার দোহাই। আরেক জনের কথা তুলো না। তাতে আমার স্মৃতি ব্যথা পায়, তোমারও মনে ছায়া পড়ে। সে কথা এনোই না এর মধ্যে। একটু সময় দাও আমাকে সু।......

ও, তোমার সঙ্গে তার মুখোমুখি কথা হয়েছে? তোমরা দুজনেই "সিলি ফুল" না হয়ে সহজ হয়ে চললে আমার পক্ষে সহজ হয়। তা বোঝবার চেষ্টা কর, প্লিজ। আমার প্রতি অবুঝ হয়ো না।......

হ্যাঁ, সে-ও রেডিও টেলিফোন করেছিল এই ঘন্টাখানেক আগে। তোমাদের দুজনকেই বলছি, এস না তোমরা এখানে। টেনো না আমাকে দেশে। তাতে এ জট আরও জড়িয়ে যাবে। আমায় দূরে থাকতে দাও, প্লিজ, প্লিজ......

তুমি তো সবই জানতে, আমিও কিছুই লুকোই নি। তবু যে তুমি

আর আমি বিয়ে করেছি—এটাকে একটা মানসিক পরীক্ষা বলে ধরে নাও। আমায় সাহায্য কর এ পরীক্ষায় জয়ী হতে। অগ্নি-পরীক্ষায় জয়ী হতে। তোমাদের দুজনেরই তাতে লাভ হবে। আমায় দূরে একা থাকতে দাও।……

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমায় খুবই মনে পড়েছে। সে কথা মনে করেই আজ নিজের ঘরে বসে খিচুড়ী রাঁধলাম।……

ঠিক, ঠিক। কোন দিন সে ঘর শুধু আমার নিজের না-ও থাকতে পারে। কিন্তু ততদিন তোমরা দুজনেই আমায় একলা থাকতে দাও। তুমি ভুলো না ওর উপস্থিতির কথা। সেও যেন না ভোলে তোমার স্বামিত্বের কথা। ওঃ, ছ মিনিট হয়ে গেল। আচ্ছা, সো লঙ্। হ্যাপি ক্রিসমাস।

সব চুপ হয়ে গেল। মিসেস চৌধুরী হ্যাণ্ড মাইক্রোফন রিসিভারটা এমন ভাবে ধরে রইলেন, যেন হাতল নয়, কারও এগিয়ে দেওয়া হাতটিতে তিনি ধরে আছেন। না পারছেন রাখতে, না পারছেন ছাড়তে।

আমি ততক্ষণে মুখ ফিরিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি ওই দুটি ছবির দিকে।

মিসেস চৌধুরীর একতরফা কথাগুলি শুনে অনেক কিছুই বুঝে নিতে পারলাম। মহাসাগরের এপারে দাঁড়িয়ে এক নারী, বহু আকাঙ্ক্ষার ধন বরনারী! ওপার থেকে আকাশের মধ্য দিয়ে তাকে ডাক দিচ্ছে দুজন পুরুষ। একজন প্রিয়, আর অন্যজন স্বামী কিন্তু অপ্রিয় নয়। শুধু তাই নয়, যে প্রিয় সে স্বামী আসার আগে থেকেই এই নারীর প্রিয়। এখনও তার দিগন্তে প্রিয়ের প্রেমের বর্ণচ্ছটা মিলিয়ে যায় নি। অথচ উদয় হয়েছে আরেক জনের প্রেম। সংসারের দাবী করে তুলেছে সে প্রেমকে জোরালো। যদিও স্বামী এখনও সংসারের সঙ্গে মিশে যায়নি। দুই সূর্যের উত্তাপ সইতে পারবে কি করে এক চাঁদিনী? কাজেই সে সরিয়ে দিয়েছে নিজেকে সে আকাশ থেকে।

আহা!

মনে শুধু এই কথাটুকুই বলতে পারলাম! কিন্তু উচ্চারণ করবার

সাহস নেই। এ সম্বন্ধে কোন কথা তোলাও সভ্যতায় বাধবে। আস্তে আস্তে ছবি দুটো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম। যেন কিছুই শুনি নি, কিছুই ভাবি নি।

শ্রীমতীই প্রথম কথা কইলেন—ও হো, আমায় মাপ করবেন মিঃ রয়, ভুলেই গিয়েছিলাম যে ক্রিসমাস পুডিংটা এখনও বাকী আছে। এ কি, বসুন বসুন। ওটা পাশের ঘর থেকে নিয়ে আসি।

পাশের ঘর বটে, কিন্তু যেন কত দূরে। ফিরে আসতে বেশ কিছু সময় লাগল। কিন্তু যখন এলেন, তখন তাঁর মুখে আবার পূর্ণ চন্দ্র ফুটে উঠেছে।

কিছু বুঝতে বাকী রইল না। একেবারে যাকে বলে টিপিক্যাল সোসাইটি গার্ল। পাখনা মেলা প্রজাপতি। এত সব নাকিস্বরে প্রেমের কথা, দোটানার কথা অন্যকে অপরিচিতকে না শুনিয়ে বললে রস জমবে কেন? তা না হলে এর পরেও পাশের ঘরে গিয়ে মুখের চুনকামটুকু ঠিক সেরে নিয়ে এসেছে। পুডিং তো অছিলা মাত্র। এ ঘরেই একপাশে ছিল।

ক্রিসমাস পুডিং-এর উপর নিয়ম মাফিক একটুখানি 'রাম' মদ ঢালা ছিল। তাতে দেশলাই দিয়ে আগুন ধরানো হল। আমি অন্যমনস্ক হয়ে শ্রীমতীর মুখে দেখতে লাগলাম আগুনের আলো।

আলো কিন্তু ফুলঝুরির মত কথা ঝরাতে শুরু করল। আমাকে একেবারে ভাবতেই দিল না আলোর চারদিকে ঘেরা আঁধারের কথা, সংঘাতের কথা। তিনি বললেন—দেখুন তো, বড়দিনের জন্য কি রকম একটা বাজে পুডিং এদেশে তৈরী করে! অথচ কত সুন্দর স্বাদের পুডিং করা যায়!

আমারও তাই মনে হয়! এরা ট্রাডিশনকে, আবহমান কালের ধারাকে এত আঁকড়ে পড়ে থাকে!

আশ্চর্য, অথচ এরা সবচেয়ে বেশী উৎসাহী নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করছে।

হঠাৎ একটু লোভ হল কথার মোড় ঘোরাতে। এর জীবনে

রহস্যের উপর যে ঘন অথচ লোভনীয় পর্দা টানা আছে তা একটু তুলে দেখতে কৌতুহল তো কম নয়। তাই বললাম—সেটা ঠিক। এদের আবিষ্কার হচ্ছে সব বাইরের জগতে। নিজের ঘরে, নিজের সংসারের মধ্যে কিন্তু ইংরেজ একেবারে রক্ষণশীল। ঘর এরা ভাঙবে, তবু ভাগাভাগি সহ্য করবে না।

কথা কোন্ খাতে বওয়াবার চেষ্টা করছি তা তিনি বুঝতে পারলেন. মিষ্টি হেসে বললেন—ওদের সারা জীবনটাই হচ্ছে একটা একসপেরিমেণ্ট. তত্ত্বের সন্ধান। ভাঙবার সাহস আর গড়বার ক্ষমতা ওদের মধ্যে পাশাপাশি পাবেন। এই দেখুন না···

বলতে বলতে কথার তোড়ে উনি আমায় কত রকমের রসাল কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারের বাইরের বিষয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। শুনতে শুনতে এমন এক জায়গায় এলাম, যখন উনি বললেন—আচ্ছা বলুনতো, আপনাদের পুরুষদের চোখে মেয়েদের কখন সব চেয়ে সুন্দর দেখায়?

ফস্ করে বলে বসলাম—যখন মেয়েরা হাসে, লজ্জা পায় অথবা চোখে জল এনে ফেলে!

আর তারও মধ্যে?

তারও মধ্যে বেশী, যখন তার চোখে থাকে জল আর মনে ভালবাসা। বলেই একবার ওঁর দিকে তাকালাম। একেবারে পুরোপুরি—যুদ্ধং দেহি ভাবে। যৌবনের ধর্মই হচ্ছে আঘাত হানা, আক্রমণ করা। মন শক্ত করে নিলাম।

কিন্তু উনি সে আক্রমণকে মানলেন না। পাশ কাটিয়ে গিয়ে টিপ্পনী কাটলেন যে মেয়েদের চোখে তো জল আসে হামেশাই।

আমিও ছাড়লাম না। বললাম—তার কারণ মেয়েরা অস্ত্র চালাতে ওস্তাদ আর সর্বদাই লড়াই করতে প্রস্তুত।

কেন? মনের ভালবাসা আর চোখের জলে আপনারা কোন তফাৎ পান না বুঝি?

পাই বৈ কি মিসেস চৌধুরী! একটা হচ্ছে বালিকার সরল ঝরণা-

ধারা, আরেকটা অভিজ্ঞতার সাগর। একটা হচ্ছে তাজা, মিষ্টি। অন্যটা অনেক দিনের জমানো, নোনতা।

বলে আড়চোখে একবার ছবি দুটোর দিকে তাকালাম।

মিসেস চৌধুরী লক্ষ্য করলেন, কিন্তু আমল দিলেন না। যেন কিছুই নেই আমার চাহনিতে। এদিকে আমি এই দুটো টেলিফোনের কথাবার্তার রহস্য, তার ইতিহাস জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি। বার বার চেষ্টা করছি একজন সোসাইটি-গার্লের মনের উপর যে ঘোমটা টানা আছে তাকে তুলে ধরতে।

ইনি স্বচ্ছন্দে হেসে উঠলেন—বাঃ, বাঃ, মিঃ রয়, আপনার দেখি জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। যদিও বয়স বোধ হয় কুড়ির কোঠা সবে পেরিয়েছে, কি পেরোয় নি।

গরম হয়ে প্রতিবাদ করলাম—দেখুন, আমি শিশু নই!

আরও বেশী হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়লেন তিনি। হাসির ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে গিয়ে তিনি বললেন—সে কথাটা আপনার বান্ধবীদের জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। যদি অবশ্য আপনার সে কপাল হয়ে থাকে। তা স্বীকার করতেই হবে যে যৌবন তো বয়সের হিসেবে হয় না, হয় মনের মাপকাটিতে।

ওঃ, মনে হচ্ছে আপনি ব্যারিষ্টারী পড়ছেন। নিশ্চয় খুব সফল হবেন আপনি এ লাইনে।

না, আমি ইউনিভার্সিটিতে আর্ট পড়ছি।

এবার সুযোগ এল মোক্ষম ডেপথ চার্জ অর্থাৎ তলফোড় দেবার। দেখি শ্রীমতীর মনের সাগরে আমার এই বোমা কি তোলপাড় তোলে! বেশ ওজন করে, পুরোপুরি ওঁর দিকে তাকিয়ে, যেন ওঁকে বিশেষ লক্ষ্য করে বলছি এমন ভাবে বললাম—শিল্পকে ফোটাতে গেলে চাই প্রেম, আর প্রেম চায় যে শিল্প ফুটে উঠুক। আশা করি আপনার জীবনে দুইয়েরই আগমনী বেজে উঠেছে।

উনি কি টললেন তাতে? দিলেন কি মনের মণিকোঠার দরজা খুলে আমায় উঁকি মারতে? অথবা বেদনায় বিবশ হয়ে করলেন সহানুভূতির প্রত্যাশা?

শুধু বললেন, আরও উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঘরকে সচকিত করে

বললেন—আপনার যা অবস্থা দেখছি, তাতে শীগগির আপনার হৃদয়ে হিরোশিমার য়্যাটম বোমা ফেটে পড়বে। সময় থাকতে সাবধান হবেন, মি. রায়! রাত অনেক হল। বাইরে এখন বরফ পড়ছে। কিন্তু এত আদর-যত্নে এত খেয়ে পেট আর মন দুই-ই ভরে গেছে। শুধু এই রূপসীর মনে সত্যি কোন টানা পোড়েন চলছে কিনা, কোন দুঃখ আছে কিনা, তার গোপন রহস্যটা জানতে পারলাম না। সম্ভবত এই দুটো টেলিফোনই বড়লোক বন্ধু আর বড়লোক স্বামীর খেয়াল হবে। ওদের যখন দুঃখ থাকে না অভাব থাকে না, তখন এমন করেই মনগড়া দুঃখ অতৃপ্তি বানিয়ে নিয়ে আর্টিষ্টিক বেদনা উপভোগ করে। এই শ্রীমতী চৌধুরীও নিজের সৃষ্টি করা বেদনা বেশ রসিয়ে রসিয়ে আস্বাদন করছেন। আর্ট শিখছেন কিনা।

একেই বোধ হয় বলে সফিস্টিকেশন, অর্থাৎ কিনা সভ্যতার ভেজাল। আরে, যেতে দাও ওসব সখের খেয়াল। রূপ আর রূপোর বাসায় এরকমই হয়ে থাকে।

মন থেকে মুছে দিলাম নিজের মনে বানানো দোটানার কথা। শুভরাত্রি আর ধন্যবাদ জানিয়ে, আবার এসে খেয়ে যাবার ভয় দেখিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম—বরফের মধ্যে, অন্ধকারের মধ্যে।

হঠাৎ খেয়াল হল উনি সামনের ঘরের দরজাটা ঠিক মত বন্ধ করেন নি। হয়তো আর খেয়ালই করবেন না। খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়বেন। তাই সেটা জানিয়ে আসবার জন্য ফিরে গেলাম। পা টিপে টিপে গিয়ে দেখি, দরজাটা সত্যি বন্ধ হয়নি। দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকে সে কথা বলতে গেলাম।

উনি তখন ওই ছবি দুখানার সামনে মেঝেতে কার্পেটের উপর বসে আছেন। দুচোখে জলের ধারা। নিঃসাড় তন্ময় শ্রীমতী চৌধুরী!

আমি কি করব বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে উনি খুব নীচু গলায় বললেন—আজ বড়দিনের রাত। আমাদের বিজয়া দশমীর মত। প্রিয় জনের সঙ্গে মিলতে হয়। তুমি এখন যাও, ভাই!

মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলাম।

কবিতা সিংহ

স্বামী নয়, প্রেমিকও নয়

মুখটা খুব বেজার করে চারু ফোনটা নামিয়ে রাখল। তারপর বলল—ধ্যেৎ সব বাজে!

বিজু সাগ্রহে তাকিয়েছিল চারুর দিকে। চারু আর কিছু ভাংছে না দেখে বলল—কি রে, কি হলো? তোর বয়ফ্রেণ্ড কি বলল?

চারু ভুরু কঁচকে তাকিয়ে নিজের সিটে গিয়ে ব্যাগ গুছোতে গুছোতে বলল—তুই বিদেয় হ তো! যেখানে যেতে হয় যা না, খামোখা বসে আছিস কেন?



বিজু হাসতে হাসতে বলল—বাব্বা, মেজাজ একেবারে খাপ্পা! বল না, কী বলল তোর দীপক?

চারু সশব্দে টাইপ মেশিনের ওপর ঢাকাটা বসাতে বসাতে বলল—স্পষ্ট বুঝলাম ফোনের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, ওর সেই বন্ধুটাকে দিয়ে বলিয়ে দিল, অফিসে নেই। বেরিয়ে গেছে। অথচ গত মাস পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক শনিবার…

—অর্থাৎ তোর পার্টি এখন পাখি হয়ে ফুড়ুৎ—

বিজু হাসতে হাসতে চারুর দিকে পিছন ফিরল। নিজের ড্রয়ারটা লক্ করার সময় তার সমস্ত মুখে চারুর জন্যে গাঢ় সমবেদনার কয়েকটা রেখা ফুটে উঠলো। মিলিয়ে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার হেসে উঠলো বিজু—কি আর করবি? চল্, আমার সঙ্গেই ডেট কর্। মধু অভাবে গুড়!

চারু ভুরু দিয়ে বিজুকে বকে উঠে বলল—ধ্যেৎ—

আবার সশব্দে হেসে উঠলো বিজু। সারা হলঘরে আর কেউ নেই। শনিবার। বহুক্ষণ সবাই চলে গেছে। কেবল ঝাড়ুদারের ঝাঁটার শব্দ। ঝাঁট দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। চারু আর বিজু অপেক্ষা করছিল। সবাই চলে না গেলে তো আর ফোনে দীপকের সঙ্গে কথা বলা যায় না! চারু আর বিজু একপাড়ার ছেলেমেয়ে। চারু টাইপিষ্ট। বিজু ক্লার্ক। সকালবেলা প্রায়ই শ্যামবাজারের এঁদো গলি থেকে বেরিয়ে দুজনে একই স্টপ থেকে বাসে ওঠে। তবে সন্ধ্যেবেলাটা অন্য রকম!

কারণ চারু একজন প্রেমিক চায়। আর প্রায়ই সন্ধ্যেবেলা ওর প্রেমিকদের সঙ্গে ডেট করা থাকে। বিজুর এখনও কোনো প্রেমিকা জোটেনি। সে জন্যে একটু আধটু দুঃখ থাকলেও, সব মিলিয়ে মহা-ফুর্তিতে আছে।

চারুর রেগে গেলেই ধ্যেৎ বলা অভ্যেস। আর খুব দুমদাম শব্দ করে কাজ করে তখন সে। বিজু দেখছিল আর মজা পাচ্ছিল খুব। ড্রয়ার বন্ধ করে, লাল বড় ব্যাগে টিফিন কৌটো ভরে, চারু সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। বিজু আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল—চল তা হলে, কোথায় যাবি বল? লেক-এ না ইডেন গার্ডেনে?

চারু ঘাড় ফিরিয়ে, চোখ বড় বড় করে বলল—ফের ইয়ার্কি করছিস বিজু। একে আমার মন ভালো নেই!

—আহাঃ আজ খালিই তো আছিস, একদিন আমার সঙ্গে ডেট কর না। তোর ওই হোঁৎকা দীপকের চেয়ে আমি এমন কিছু খারাপ নই বুঝলি? পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করে দেখ না।

—তুই একটা নেই-আঁকড়া, নাছোড়বান্দা—নে চল্!

বিজু বলল—উঁহু, ওসব চলবে না। দীপকের সঙ্গে যাবার সময় তুমি যেমন পাউডার মেখে ফিট হয়ে বেরোও, আমার সঙ্গেও তেমনি করে বেরোতে হবে!

চারু এবার হেসে ফেলল, বলল—ধ্যেৎ। পকেট থেকে ছোট চিরুনি বের করে নিজের চুল ফেরাতে ফেরাতে বিজু বলল—কেন বিজন হালদার ফেলনা নাকি? ইচ্ছে করলে তোর মত ছটা মেয়েকে নাকে দড়ি দিয়ে বোকা বানাতে পারি জানিস?

চারু বলল—কেবল মুখ ভাগবত। আসছি, বোস্ একটু!

চারু আর বিজু হাঁটতে হাঁটতে যখন মেট্রোর কাছে পৌঁছল, তখন শীতের দুপুর হলেও রোদ্দুরে বিজুর শার্টের পিঠটা ঈষৎ ভিজে উঠেছে। চারুর পাউডার ফুটে ঘাম। বিজু বলল—হাউস-ফুল, না হলে তোকে সিনেমা দেখাতাম!

চারু বলল—চল্ বরং তোর ঘরে যাই। মেহবুবার গানগুলো শুনি গিয়ে, এই রোদে খামোখা···

বিজুর চোখ দুটোয় দু ফোঁটা আলো জ্বলে উঠলো। বলল—মাথায় বুদ্ধি এসে গেছে। চল এগোই একটু!

চারু অবাক হয়ে বিজুর দিকে চেয়ে বলল ও বাব্বা, আরো হাঁটবো?

বিজু বলল—হাঁটার কষ্ট ভুলিয়ে দেব তোকে। চল্ না। পার্টির সঙ্গে যখন ময়দানে চরে চরে ঘাস খাও, তখন হাঁটো না বুঝি?

—ধ্যেৎ, —চল্।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চলল।

ফুটপাথে ছোট ছোট পালক লাগানো প্ল্যাস্টিকের পুতুল যুদ্ধ করছে। বিজু আর চারু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। বিজু বলল—বেশ মজা হয় পুতুল কিনলে। পুতুলওয়ালা একটু দূরে নিয়ে গিয়ে কানে মন্তর পড়ার মত করে নিচু গলায় পুতুল খেলানোর কৌশল বলে দেয়। ওইটাই বাড়তি মজা। কিন্তু ওই পুতুলওয়ালা ছাড়া অন্যের হাতে পুতুলগুলো যুদ্ধ করে না কিছুতেই।

চারু বলল—ও-ও বুঝেছি! তার মানে তুই কিনেছিলি এবং ঠকেছিলি!

বিজু উদাস গলায় বলল—কে না ঠকে? ছোটবেলায় মাটির বেহালা কিনে ঠকিনি আমরা? কোনো দিন বেহালা-অলার মত সুর বাজাতে পেরেছি? চাট্টিখানি কথা নাকি?

জুতোর দোকানের শো-উইণ্ডোর সামনে এসে বিজু বলল, কোনটে পছন্দ বল্ কিনে দিই।

চারু বল,—দ্যাখ্ দ্যাখ্ ওই লাল হিলতোলাটা।

—ওঃ, তেষট্টি টাকা নিরানব্বই পয়সা এক্সক্লুডিং সেলস ট্যাকস. না ভাই, অত কম দামের জুতো আমরা কিনি না!

বিজুর রকম সকম দেখে তুটি বোরখা তুলে শো-উইণ্ডো দেখা লাজুক মেয়ে হাসাহাসি করলো একটু।

বিজু আর চারু চলল।

চারু লক্ষ্য করল হাঁটতে আর তার তেমন কষ্ট হচ্ছে না।

কথা বলতে বলতে শো-উইণ্ডো থেকে পছন্দসই জিনিস মিছিমিছি কিনতে কিনতে চারু আর বিজু চলেছে। এভাবেই কখন যে তারা পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত চলে এসেছে,—খেয়ালই নেই।

বিজু ইতিমধ্যে চারুকে টেনে, 'সেল' বোর্ড লাগানো একটা বিরাট দোকানে ঢুকে পড়েছে। এত প্রশস্ত দোকানে চারু এর আগে জীবনে কখনো ঢোকেনি। ঢুকে চারু খুব ইতস্ততঃ করছিল। বিজু অবলীলাক্রমে জিনিষপত্র দেখে বেড়ানো লোকেদের মধ্যে চলে গেল। কার্পেট, ফোমের গদী, নানা রকম ষ্টীলের ফার্নিচার সাজানো আছে চারিদিকে বিজু এক জোড়া অবাঙালী দম্পতির মাঝখান দিয়ে গলা ঝুলিয়ে দিল দুজন লোক গলদঘর্ম হয়ে তাদের নানা রকম কার্পেট দেখাচ্ছে। বিজু খুব সমঝদারের মত বলল,—এতো সেকেণ্ড ক্লাশ কোয়ালিটি! কি চারু? ওটা নেবে? কিহে সেলে স্কোয়ার ফুট কত যাচ্ছে?

যে লোকটা কার্পেট দেখাচ্ছিল সে অবাক হয়ে বিজুর দিকে তাকালো।

বিজু আবার বলল,– টারকোয়াস ব্লু হ্যায়!

—ও-তো ফিনিস্ হো গিয়া সাব্! বিজু বলল, ঠিক আছে,—চলো চারু—ওদিকে বড় কাজ করা কার্পেটগুলোই দেখি। প্লেন কার্পেট বাদ দাও।

কাউনটার থেকে লোক ডাকিয়ে নিয়ে বিজু মেঝেয় বিছিয়ে রাখা বড় বড় কার্পেটের ওপরের ঢাকা ত্রিপল সরিয়ে দেখতে লাগলো।

চারু ভাবলো এবার বিজু ঠিক চ্যাংড়ামি করার জন্য বকুনি খাবে। ও, মা! অসমসাহসী বিজু একবার দূর থেকে, একবার কাছ থেকে, বসে দাঁড়িয়ে হাটুগেড়ে, উলের কোয়ালিটি পরীক্ষা করে, একেবারে কাণ্ড বাধিয়ে তুলছে। তিনজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলাকে প্রায় অগ্রাহ্য করে সেলস্‌ম্যান কেবল বিজুর সংগেই কথা বলে যাচ্ছে। অনেক দেখার পর একটা হাজার পাঁচেক টাকার মত কার্পেট বিজুর সামান্য পছন্দ হল। সে রুমালে শপিঙ্ ক্লান্ত মুখ মুছে বলল,—দ্যাখো, অগত্যা এটাই নিতে হবে আর কোনো রং না পেলে। কিন্তু আবার খরচের ধাক্কা। তোমাকে এই কার্পেটের জন্যে সোফার কালার বদলাতে হবে। পর্দার কালার বদলাতে হবে একটু বরং দেখে আসি চারু! কি বলো?— আচ্ছা এই লেমন গ্রীনের সংগে তুমি কি রঙ দিতে চাও সোফা কভারের?

চারু বলল—লাল!

—লাল? কি যে বলো? উদ্ভাসিত চোখে বিজু বলল,– শকিং পিঙ্ক্, শকিং পিঙ্ক্।

পরমুহূর্তেই তারা রাস্তায়।

চারু বলল,—বিজু, তোর কি সাহস রে?

—সাহস? সাহস কতদূর জানিস, ওই দ্যাখ ওই ফরেন গাড়িটা দেখছিস?

—ওই যে মস্ত গাড়িটা

ওই যে ভেতরে যে মোটামুটি কার্পেট দর করছে, ওদের!

চারু খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠ্‌লো। বলল,—আচ্ছা তুই এত সব জানিস কি করে?

কার্পেটের নাম, কোয়ালিটি, রং!

—সব শোনা কথা। মাঝে মাঝে সন্ধ্যে বেলা দোকানে দোকানে ঘুরি তো। তাই ওরা মুখ চেনা দেখে ভাবে আমি প্রায়ই কিনিটিনি। বল্, চেহারাটা তো রাজপুত্তুরের মত। আর রঙ? এরা নীলকে বলে পাউডার গ্রীন, খয়েরীকে ওয়াইন কালার, এদের কথাই আলাদা। আমি কেবল মুখস্থ রাখি।

—বাঃ বেশ মজাতো!

— মজাটা পেতে আরম্ভ করেছিস তাহলে, চল্ তোকে তাহলে দশ পয়সার বটিয়া সরবত খাওয়াই!

চারুকে নিয়ে চক্‌চকে টিনের বাক্‌স সাজানো লেবুর জল ওয়ালার সামনে গিয়ে বিজু মেজাজের মাথায় বলল,—বানাও দেখি ছুটো বটিয়া করে!

জল খেতে খেতে বিজু বলল,—ওই যে মস্ত হোটেলটা দেখছিস, ওখানে একপট্ চা কত জানিস, সাড়ে সা-ত টাকা?

—তুই খেয়েছিস বুঝি?

—আমাকে 'টুপি' পরাবে? পাগল! তবে দেখে এসেছি ভিতরটা। কিছু বলে না।

একদিন সন্ধ্যেবেলা এ পাড়ার সব কটা হোটেলে ঘুরে ঘুরেই কাটিয়ে দিলাম হয়তো!

—ও-ও সন্ধ্যেবেলা তুই বুঝি এইসব করিস?

—কতরকম খেলা আছে। একদিন বরানগর চলে গেলাম। গলিতে গলিতে ঘুরলাম খুব। একদিন কলকাতার পুরোনো মন্দির দেখলাম হয়তো। আচ্ছা ভাবতে পারিস এই পার্ক স্ট্রীট কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে? আমি একদিন গান্ধীজির স্ট্যাচু থেকে শুরু করে হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিলাম।

—কোথায় পৌছলি?

—তিলজলা বস্তীতে!

—সত্যি?

গেলাসটা নামিয়ে রাখলো চারু। বিজু ছুটো দশ নয়া ফেলে দিয়ে বলল, চল্। চারু বলল—সত্যি আজ বিকেলটা খুব মনে থাকবে বিজু!

বিজু বলল,—ও তোমার দীপক বুঝি শরবৎ ঘোল এসবই খাইয়েই তোমাকে ফুটিয়ে দিতো?

চারুর মুখটা আবার দুঃখী দুঃখী হলো। বলল,—ওর কথা থাক্ না!

বিজু বলল,—এখন যাবি কোথায়? এই তো খেলা শুরু! সন্ধ্যের পার্ক স্ট্রীট দেখে যা একটু!

ফুটপাতের শীত বিকেলের লাল আলোর ঢলের উপর দুজনের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে। শিরশিরে সুখাবহ ঠাণ্ডা। রেস্তোরাঁর দরজা খুলে যাচ্ছে, সুখাদ্যের গন্ধ-ঝলক। আর বাজনদারদের এক পলক চেহারা। চারুর চোখ গোল গোল হয়ে যাচ্ছিল। একটা ফার্নিচারের দোকানের সামনে এসে চারু অবাক যেন নিভৃত শয়ন ঘরের সজ্জো সাজানো। শেড্ দেওয়া ল্যাম্প্, ড্রেসিং টেবিলে ফুলদানী। পরিপাটি বিছানা পাতা খাট।

—কি সুন্দর, না, বিছানাটায় শুতে ইচ্ছে করছে!

—একা না পার্টিকে নিয়ে? বিজু বললো,—যা না শো না, আমরা সব কাঁচের এ-পাশ থেকেদেখি! বেশ হবে!

—ধ্যেৎ!

বিজু বলল,—চল্ আর একটা জায়গায় নিয়ে যাই,—আজ বেশি ঘোরাবো না, তোকে রেজালা আর তন্দুর রুটি খাইয়ে দেবো তারপর!

পাখ্না গজানো পায়ে দুজনে প্রায় উড়েই চলল। মস্ত দোকান। দোকান না বলে মিউজিয়াম বলাই ভালো। দুপাশে মার্বেল পাথরের বড় বড় মূর্তি। মস্ত উঁচু রঙীন চীনে মাটির টব, ঝাড় লণ্ঠন জ্বলছে। ঝোলানো কার্পেট, খোদাই করা ফার্নিচার, পোর্সিলিনের পুতুল। কাচের এপাশ থেকেই দেখা যাচ্ছে লোকজন গম্ভীরভাবে ঘোরাফেরা করছে। স্পিরিট আর তার্পিনের উগ্র গন্ধ!

বিজু চুপি চুপি বলল—এটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড্ শপ্। মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে চারু টুক্ করে একটা ঝাড়ের কলম ছুলিয়ে দিতেই মৃদু ট্যাং-টাং শব্দ উঠলো। চারু চোখ তুলে তাকিয়ে দেখ্‌লো একটা লোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ভয়ে তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে চারু বলল,—বিজু, বাড়ি চল্ আমার বুক দুরদুর করছে!

বিজু বলল,—চল্ আগে খেয়ে নিই। তুমি যদি চার আনার বেশি টিপস্ না দাও, তাহলে সাড়ে পাঁচ টাকার মধ্যেই সব হয়ে যাচ্ছে!

খেতে খেতে চারু কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। চেয়ারের তলা দিয়ে চারুর পায়ে ধাক্কা দিয়ে বিজু বলল,—কীরে?

কান্নার রেখায় নিজের সমস্ত মুখটা চুরমার করে ভাঙতে ভাঙতে চারু বলল,—দ্যাখ বিজু আমি সাধ্যের অতিরিক্ত সবই তো করেছি। ওই মাইনেতে এত দামী শাড়ি ব্লাউজ মেক্ আপ হয়? বল?—তা-ও কিছু হলো না!

চারুর ঠোঁটের কোণে ঝোলের দাগ। মুখে কেবিনের গরমে বিনবিন করে ঘাম উঠ্‌ছে। তবু চারুকে ভালো লাগছিল বিজুর। খুব মমতা হচ্ছিল তার।

বলল,—দুঃখ করিস না। হয়তো দীপক কোনো কাজে-টাজে বেরিয়ে গেছে!

—ধ্যেৎ—ভুরু কোঁচকালো চারু,—এক মাস ধরে লক্ষ্য করছি। আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো ভাব। আমরা মেয়েরা সব বুঝতে পারি। জানিস?

—চল্ উঠি। বরং আমার ঘরেই চল। বলছিলি গান শুনবি! সাইগলের একটা এল, পি কিনেছি। নাইস্। পুরোনো রেকর্ডের দোকান থেকে! মশ্‌লা খেতে খেতে চারু বলল,—সত্যিরে বিজু, বেশ আছিস তুই!—হিংসে হয়!

বেশ কেমন আধতলায় আলাদা ঘর। ছিমছাম্। বই-এর গাদা। রেকর্ডপ্লেয়ার আর আমার অবস্থা ছাখ্। বাড়ি ফিরলেই একঘরে ছটা বোনের মেছোবাজার! বিজু হাসল একটু, কিছু বলল না।

চারু বলল,—এত্ত জিনিষ-পত্তর ছাখালি। আমি কিন্তু তোর ওই ছোট্ট ঘরটা পেলেই বর্তে যাই!

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে বিজু মাথা নীচু করে চারুর কথা শুনছিল আর জুতোর কোণা দিয়ে একটা ইটের টুক্‌রোকে স্যুট মারার চেষ্টা করছিল। চারু বলল,—কি-রে? কি ভাবছিস? উত্তর দিচ্ছিস না কেন?

বিজু চোখ তুলে কেমন অন্যরকম স্বরে বলল,—বলব, শুনবি আমার কথা?

—এতই যদি ভালো লাগে? একদম সবসময়ের জন্যে চলে আয় আমার ঘরে!

চারু ভুরু তুলে তাকালো। প্রথমে হতভম্ব। তারপর অবাক! চোখের পাতা দুটি খামোখা ভিজে উঠ্‌লো তার। ধরা গলায় সে বলল,—পাগল, অত বোকা নাকি আমি। তুই আমার জমার খাতায় তোলা আছিস বিজু, তোকে কি আমি খরচের খাতায় ফেলতে পারি? ধ্যেৎ।

সমরেশ বসু

সুবর্ণা

প্রায় মাস চারেক পরে শিল্পীবন্ধু ভুবনের একটি দীর্ঘ পত্র পেলাম। লিখেছে: ভাই নীরেশ, নিশ্চয় এতদিনের নীরবতায় রাগ করেছিস। কিন্তু বিশ্বাস কর, এতদিন বন্ধ দরজার অন্ধকার কোণেই পড়েছিলুম। কারুর সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল না। মা আমাকে এত বেশী চেনেন যে কখনো ডেকে জিজ্ঞেস করেন নি, ঘরের কোণে কেন আমার এ নির্বাসন। কাজের মধ্যে হাঁক-ডাক ছুটোছুটি করা আমার



অভ্যাস, যে জন্য বন্ধুদের ধারণা, ষোল আনা প্রতিভার সিকিখানেক আমার বাকী রয়ে গেল, আমি বারো আনার কারবারী রয়ে গেলুম।

সেই আমি এতদিন রং তুলি ছুঁইনি, বন্ধুহীন একলা ঘরে একটা অসহ্য কষ্ট, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাময় একটি বিশাল অন্ধকার জিজ্ঞাসার গ্রাসে চাপা পড়েছিলাম।

অথচ আমি জানি, কারণটা শুনলে তোমরা সবাই খুব তুচ্ছ মনে করবে। হাসতেও পার। না হয় তুচ্ছ মনে করা গেল, না হয় হাসাই গেল, কিন্তু তুচ্ছও যে ক্ষেত্র বিশেষে বড় উচ্চ হয়ে বাজে, বহুদূর গভীরে

পৌঁছায় তার প্রতিধ্বনি, তা মানবে আশা করি। আমার বেলায় তাই হল। একটি তুচ্ছতাই আমার চিরদিনের দরজা-বন্ধের কৌতূহল ও আগ্রহ হয়ে রইল।

দিল্লীতে, ফ্রেঞ্চ এম্‌ব্যাসি থেকে যখন প্যারিস প্রদর্শনীর কথাবার্তা বলে বেরিয়ে এলুম, মনটা তখন আনন্দে ভরপুর। ভাবলুম, কলকাতায় ফেরার আগে কোথাও একটু বেড়িয়ে যাই। আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল আগ্রার কথা। আগ্রার সঙ্গেই একটা অপরিচিত কৌতূহল, একটি মেয়ের মূর্তি ধরে আমাকে ডাক দিল। যার নাম জানি, অনেক সংবাদ জানি, কিন্তু কখনো চোখে দেখিনি, মূর্তিটি সেই সুবর্ণা রায়ের। সুবর্ণার দু'একটি পত্র তুমিও দেখে নিয়েছ আমার কাছে। একটু-আধটু ঠাট্টাও করছে। কারণ তোমরা যাদের Fan বল, এমন অনেকের সঙ্গে আমাকে পত্রালাপ করতে দেখেছ, কিন্তু দু'বছর ধরে পত্রে যোগাযোগ রাখতে কখনো দেখিনি। আর তা রাখিও নি কারুর সঙ্গে, কারণ সম্ভব নয়। কিন্তু সুবর্ণার সঙ্গে যে কেন রেখেছিলুম, আমি নিজেও তা খুব ভালো জানিনে। বোধ হয় ওর পত্রের মধ্যে একটি বিশেষ মেয়ে, একটি বিশেষ মনকে ঝলকে উঠতে দেখেছিলুম। যার অনায়াস গতির মধ্যেও একটি আশ্চর্য ব্রীড়া লীলায়িত হয়ে উঠেছিল। অপরিচয়ের মধ্যেও, চোখে একটি ধরাপড়া পরিচয়ের হাসি ছিল লুকিয়ে। আমার ভাল লেগেছিল। তাই, সুবর্ণার প্রথম অনুরোধেই ওকে 'তুমি' সম্বোধন করেছিলুম। পত্রে কথা দিয়েছিলুম, আগ্রায় যদি কখনো যাই, ওকে নিশ্চয় সংবাদ দেব, দেখা করব।

আমার খেয়াল ছিল, সুবর্ণা এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। দিল্লী থেকে দিলুম চিঠি লিখে। তারিখ দিয়ে জানালুম, তিন দিন পরে, সকালবেলার ট্রেনে আগ্রা পৌঁছুচ্ছি। এবং কোন হোটেলে উঠব সেটাও লিখে দিলুম।

ঠিক তারিখ মতোই সকালবেলা আগ্রা গিয়ে পৌঁছালাম। যাত্রীর তেমন ভীড় ছিল না গাড়িতে।

টিকিট কালেক্টরকে টিকিট দেবার মুহূর্তেই, গেটের বাইরে লক্ষ পড়ল

একটি মেয়েকে, যে আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল। আমি বাইরে এলুম। মেয়েটির মুখে যেন একটু হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। সে আমার সামনে এগিয়ে এলো আরো। প্রায় অপরিচিতার মতো।

আমি জিজ্ঞেস না করে পারলুম না, আপনি কি সুবর্ণা—

কথার আগেই সিল্ক শাড়ির আঁচল এবং আবাঁধা এলোচুল প্রায় লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ের কাছে। ও যে সুবর্ণা, এতে যেন সেটাই প্রমাণ করে দিলে। এসবে আমি ভীষণ অনভ্যস্ত। লজ্জায় তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, এ কি করছেন।

ততক্ষণে সুবর্ণা উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'আপনি' করে বলছেন যে?

সেটা নিশ্চয় আমার প্রথম দর্শনের আড়ষ্টতা। কিন্তু সুবর্ণা শাস্ত্র-সম্মতভাবেই সুবর্ণা। এবং বিম্বোষ্ঠা, এবং আয়ত কালো চোখ এবং—

থাক্। সুবর্ণার বর্ণনা আমার পক্ষে লিখে দেওয়া সম্ভব নয়। ওটা তোমাদের এক্তিয়ারে। শুধু পত্র লেখায় যাকে দেখেছিলুম, এ সুবর্ণা তার চেয়ে কিছু বেশী কিংবা পত্রে যা ঢাকা ছিল, শারীরিক আবির্ভাবে ঘুচে গেল তা। ওর চোখের গভীর থেকে যেন একটা স্বপ্নে পাওয়া খুশি উপচে পড়ল। যেন বাতাসের ঘায়ে একটি বেপথু ফুল। দেখলুম ওর চোখের ওপর এসে পড়েছে সাপের মতো চুলেরগুছি। মিথ্যে বলব না, স্বপ্ন ভর করল আমারই চোখে।

জিজ্ঞেস করলুম, আমাকে চিনলে কেমন করে?

অনেকদিনের পরিচিতার মতই একটু লজ্জা মিশিয়ে বলল, যেমন করে সবাইচেনে। কাগজে ফটো দেখেছি।

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ও চোখ নামাল। কিন্তু মাথার মালপত্র নিয়ে কুলি দাঁড়িয়ে। বললুম সুবর্ণা, আমি এখন হোটেলে যাব।

সুবর্ণা বললে, ওবেলা কিন্তু আমি আপনাকে বাড়ী নিয়ে যাব। আর, এখন আপনার সঙ্গে একটু হোটেলে যাব?

ওর অনুমতি চাওয়া দেখে, ওকে যেন আরো বেশী করে চেনা গেল, মনে মনে খুশী হয়ে বললুম, তোমার অসুবিধে না হলে—

সুবর্ণা যেন ওর উচ্ছ্বাসকে চাপা দিয়ে বললে, এখন আমার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না একটুও। আপনার অসুবিধে হবে না তো?

বললুম একটুও না।

মনে মনে অবাক হলুম। দেখামাত্র এতখানি মুগ্ধতা, প্রায় যেন মোহের সঞ্চার করল আমার মধ্যে। থরে বিথরে সাজানো আমার ত্রিশোর্ধ্বের বুকের একটি নিশ্চিন্ত জায়গা সহসা এমনি এমোমেলো হয়ে উঠছে কেন? সুবর্ণাকে দেখে সব থেকে আগে আমার আঁকাব কথা মনে পড়ল। এবং এই প্রথম আমার মনে হল, আমার সব রং জড়ো করলেও বুঝি ওকে কুলোবে না। আমার সব গতি দিয়েও ওকে হয়তো ধরা যাবে না।

ওকে সঙ্গে করে যেন নিমেষে হোটেলে এলুম। দোতলায় আমার ঘর ঠিক করাই ছিল। ঘরে ঢুকে, সুবর্ণাকে বসতে বললুম। বেয়ারাকে বললুম চা খাবার দিতে।

কিন্তু সুবর্ণাকে দেখলুম, মাথা নত করে টেবিলে আঙুল খুঁটছে এবং হাসছে। জিজ্ঞেস করলুম কি হোল?

সুবর্ণা প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল, ভীষণ লজ্জা করছে।

দেখলুম, সত্যি ও আরক্ত প্রায়।

জিজ্ঞেস করলুম, কেন?

বলল, চিঠিগুলোর কথা মনে করে। আমার চিঠি পড়ে আপনি নিশ্চয় খুব হাসতেন?

বললুম, কাঁদিনি তো বটেই।

সুবর্ণা হেসে উঠল। আবার চোখ নামিয়ে বলল, কিন্তু নিশ্চয় ভেবেছেন, মেয়েটা ভারি বেহায়া।

বললুম, না। ভেবেছি, মেয়েটি ভুবন চৌধুরীকেই বেহায়া করে তুলল। তাই ছুটে এলুম।

সুবর্ণার হাসি যেন চুড়ির নিক্বনে বেজে উঠল। বললে, ইস্!

আমিও হেসে উঠলুম।

কিন্তু সুবর্ণার মুখে একটি করুণ ছায়া পড়ল সহসা। আমি যদিও

বয়স এবং মান, দুই-ই বজায় রাখার চেষ্টা করছিলুম, তবু জিজ্ঞেস করলুম, কী সুবর্ণা ?

সুবর্ণা চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে। এবং অসঙ্কোচে বলল, আপনি এত দেরী করে চিঠি দেন, আমার কষ্ট হয়।

সুবর্ণার গলায় তার কষ্ট এমন সহজ ও অনাড়ম্বর ব্যক্ত হল যে, আমি স্তব্ধ হয়ে গেলুম।

সহসা কিছু বলতে পারলুম না। সুবর্ণাই আবার বলে উঠল, কিন্তু আমি ভাবতাম, আপনি আপন মনে ছবি আঁকছেন, আমার কথা আপনার মনে নেই। মনে যখন পড়বে, তখন ঠিক চিঠি দেবেন।

তখন আমার নিজের মুখ আড়াল করতে হয়েছে। ওর অসহায় ব্যথাটা যেন আমাকে চেপে ধরল।

আমি কিছু বলার আগেই, বেয়ারা এসে চা জলখাবার দিয়ে গেল। ফিরে দেখলুম সুবর্ণার পলকহীন চোখের দ্যুতিতে বিস্ময় ও আনন্দ রৌদ্রচকিত দীঘির মত অনায়াস। বললে, আপনাকে দেখার জন্যে কতদিন ধরে বসেছিলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, কেমন দেখলে ?

বললে, বলতে পারব না।

সুবর্ণার ঠোঁটে একটা বিচিত্র হাসি ফুটল। তাকাল আমার দিকে। আবার চোখ নামাল হেসে।

বলল, আমার একদম যেতে ইচ্ছে করছে না এখন। কিন্তু এবার যেতে হবে।

যাওয়ার কথা শুনে আমি বিমর্ষ হয়ে উঠলুম। বললুম, যেও, চা খাও আগে। চা খেতে খেতে বারে বারে ওর চোখে সেই ধরা-পড়া লুকোন হাসি আমি দেখতে পেলুম।

সুবর্ণা বললে, আমি এবার যাই ?

বললুম, বিকেলে আসছ তো ?

ও বললে, নিশ্চয় !

কিন্তু আবার বললে, যাচ্ছি, অ্যাঁ ?

বারে বারে জিজ্ঞাসায় ভিতরে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলুম। মনে হল সুবর্ণা যেন, রং-এর শেষ প্রলেপের পর, ঘাম তেল মাখা এক অলৌকিক উজ্জ্বল প্রতিমা। আমার হাত ওর হাতের কাছেই। আমার সব রক্ত যেন আমার হাতেই তখন আবর্তিত। কেন, সুবর্ণা এমন বারে বারে যাবার অনুমতি চাইছে কেন ?

তারপরে সুবর্ণা যাবার আগে হঠাৎ নীচু স্বরে বললে, আমি বোধ হয় সম্মান করতে শিখিনি। কিন্তু ভাললাগা আর মনের খুশিকে একটুও চাপতে শিখিনি। তাই আমার বুকের মধ্যে কতদিন কেঁপে কেঁপে উঠেছে — কেন সুবর্ণা ?

সুবর্ণা বললে, যাঁর ছবি দেখে আমার মন ভরেছিল, সেই মানুষের অন্তরঙ্গ হবার আশায় সব যেন আমার শূন্য ঠেকছিল।

একথা শুনে আমার বুকের রক্ত যেমন চলকে উঠল, তেমনি দিশেহারা হলুম, সুবর্ণাকে ঠোঁটে ঠোঁট টিপতে দেখে। দেখলুম, ওর চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে। আবার আমি নিঃসঙ্কোচে ওর একটি হাত ধরে প্রায় স্খলিত গলায় ডাকলুম, সুবর্ণা ?

সুবর্ণা যেন স্বপ্নের লজ্জা থেকে সহসা জেগে উঠল। যেন নিশ্চিন্ত হল আর ওর মুখে চকিত হাসির আলো উঠল ঝলমলিয়ে। বললে, এবার তাহলে যাই ?

আমি ভুবন চৌধুরী, এত দেখার পরেও সেই মুহূর্তে কোনো কথা বলতে পারলুম না। হাত ছেড়ে দিলুম ওর। বারান্দা দিয়ে নীচে নেমে গেল ও। আমি দোতলার বারান্দা থেকে দেখলুম। ও একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে হাসল তারপর হারিয়ে গেল।

আমার ঘরের সমস্ত নৈঃশব্দের মধ্যে একটি লুকানো-প্রাণের হাসি-কান্নার আনন্দধ্বনি আমাকে ব্যাকুল করে তুলল। আমার ভিতরের রং ও গতি যেন পেল আর এক নতুন মুক্তির সন্ধান।

রাত জাগার ক্লান্তি আমার গেল। কোনো রকমে স্নান খাওয়া সেরে বিশ্রামের ছদ্মবেশে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম।

প্রায় বেলা তিনটের সময় বেয়ারা দরজায় ঘা দিল। বললে, এক

মেমসাহেব দর্শনপ্রার্থী। আমার বুকের স্পন্দন বাড়ল। মনে মনে বললুম, মেমসাহেব নয় রে, ও যে মহারাণী। নিয়ে আসতে বললুম।

কিন্তু পর্দা সরিয়ে যে ঢুকল, সে অন্য একটি মেয়ে। যার রূপ আছে, সজ্জা আছে কেশে বেশে নিপুণ। আশাহত বিস্ময়ে বললুম, আমার নাম ভুবন চৌধুরী, আপনি?

বললে আমার নাম সুবর্ণা রায়। আমি চমকে, প্রতিবাদের সুরে বললুম, না না। মেয়েটি অবাক হয়ে বললে, আমাকে কিছু বলছেন? আমি সুবর্ণা রায়। আপনি যে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন আজ পৌঁছুবেন বলে। পাছে ভুল হয়, তাই আপনার চিঠিটাও নিয়ে এসেছি।

চিঠিটাও ওর হাতে দেখা গেল।

তাড়াতাড়ি বললুম, ও।

কিন্তু আমার বুকের ভেতর ঝড়ের দোলা। বিশ্বাস অবিশ্বাসের এক ব্যথাধরা সংঘাত। এও কি কখনো সম্ভব? কেন? তা কেন হবে? তবু, বলতে গিয়ে আমি থমকে গেলুম। যাক্ এখন নয়। হয়তো পরে কিছু জানা যাবে। কিন্তু এক অনিবার্য অসহায় আচ্ছন্নতা আমাকে ঘিরে রইল।

এই সুবর্ণা বললে, দেখি।

বলে নমস্কার করল পায়ে। আমি প্রাণহীন ভাবে বাধা দিলুম। আর সকালবেলার সুবর্ণার নমস্কার আমার মনে পড়ে গেল।

এই সুবর্ণা বললে, আমাদের বাড়ি যাবার সম্মতি দিয়েছিলেন পত্রে। যাবেন তো?

মনে পড়ল, সকালবেলার সুবর্ণার কথা, আমি কিন্তু বিকেলবেলা আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাব।

সে সুবর্ণা নয়? সে তবে কে? সে কে? আমাকে নিয়ে এমন খেলা তবে কে খেলেছে? সে যদি সুবর্ণা নয়, না-ই বা হল। সহস্র ছদ্মবেশ তার থাকুক। তবু সে কি আসবে না আর? আমি তো শুধু তার কথাই শুনিনি। আমি যে তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। আমার হাতে যে এখনো তার স্পর্শের অনুভূতি তীব্র হয়ে আছে।

এই সুবর্ণা উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে বললে, আপনার শরীর খারাপ না কি? থতমত খেয়ে বললুম, অ্যাঁ? উঁ, হুঁ।

এই সুবর্ণা বললে, তাহলে আপনি আজ বিশ্রাম করুন। কাল সকালে কিন্তু নিয়ে যাব।

আমি হেসে সম্মতি দিলাম, কিন্তু চলে যেতে ওকে বাধা দিলুম না।

তারপর শেষ ফাল্গুনের বাতাসে ভর করে কখন রাত এসে পড়ল, জানতে পারিনি। কিন্তু সকালবেলার সুবর্ণা এল না। সন্দেহ গেল, কিন্তু আমার বিনিদ্ররাত শুধু একটি প্রশ্নে মথিত হতে লাগল, সে কে? সে তবে কে?

আর কোন দিনই তার জবাব পেলুম না। তার পরেও চারদিন আগ্রায় ছিলুম। বিকেল বেলায় সুবর্ণাদের বাড়ি গিয়েছি, আলাপ করেছি সকলের সঙ্গে, খেয়েছি, তাজে এবং দুর্গে আর ফাতেপুরসিক্রীতে বেড়িয়েছি। পথে পথে যত মেয়ে দেখেছি, চমকে চমকে তাকিয়েছি সকলের দিকে। আর কেবলি মনে হয়েছে, সকাল বেলার সুবর্ণা যেন অদৃশ্যে আমারই আশেপাশে ফিরছে আর মুখে আঁচল চেপে হাসছে।

কিন্তু কেন? কেন এই নিষ্ঠুর খেলা? সে কে? তার কাছে আমি কী অপরাধ করেছি? যত ভেবেছি, ততই সেই সকালবেলার কয়েকটি মুহূর্ত আরো স্পষ্ট তীব্র হয়ে উঠেছে। চার মাস ধরে বন্ধ ঘরে শুধু এই ভেবেছি। সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা!

মনে মনে অনেক রাগ করেছি, ঘৃণা করেছি সকালবেলার সুবর্ণাকে। কিন্তু মিথ্যে বলব না, তারপরেও কান পেতে আমি আমার কান্নাও শুনতে পেয়েছি।

ভাই, এ যাত্রা আর তোর সঙ্গে দেখা হোল না। পরশু ফ্রান্সে রওনা হচ্ছি। হয়তো যেতে পারতুম না। কিন্তু চার মাসের বন্ধ ঘরের অন্ধকার আমাকে একটি সত্যের আলোর বাইরে এনেছে। তা হল, আমাদের জীবনে দু'জনের আগমন এমনি ঘটে। যারা আসবার পূর্ব মুহূর্তেও কোনো জানান দেয় না। ছায়া যদি বা ফেলে, আমরা টের

পাইনে। একজন আসে জীবনে একবার। আর একজন হয়তো নানান বেশে একাধিকবার।

একজন মৃত্যু, আর একজন আমাদের মহাপ্রাণের চিরপ্রার্থিত স্পর্শমণি, মনের মানুষ। তারা আমাদের সীমানায় থাকে কিন্তু প্রত্যহের কুলায় ওরা কুলোয় না। আজ এই এখানেই ইতি করলুম।

—তোর ভুবন

ভুবনের চিঠিপড়া হল, কিন্তু সকালবেলার সুবর্ণা ভাসতে লাগল আমার মা•সপটে।

কমল দাশ

অম্লান ফাল্গুনী

অম্লান আর ফাল্গুনীর বিয়ে।

বিয়ে-বাড়ি যেমনটি হবার কথা! ঠিক তাই। আজকালকার ফ্যাশানে।

বাড়ির সামনে সানাইওয়ালারা বসেনি। সকাল থেকে সময়ের সঙ্গে তাল দিয়ে পোঁ ধরছে না। আগে যেমন আলো-আঁধারির সন্ধিক্ষণে সানাইয়ের সুরের মূর্ছনায় বিয়ে-বাড়ির সকলের ঘুম ভাঙত, সবার মনে এসে ধাক্কা দিত এক অনাগত ব্যথা ও আনন্দের দোলা।

বলতে গেলে একই সঙ্গে সেই দিনের নাটকের যে প্রধানা নায়িকা—মানে, কনের মনে নূতন জীবনের স্বপ্ন নূতন মানুষের চিন্তা মনকে ভরে তুলত ঠিক সেই রকমই জানা থেকে অজানাতে যাবার আশঙ্কা, এতকালের ভালবাসার জনদের ছেড়ে যাবার দুঃখটা প্রাণের মধ্যে গুমরে উঠত।

তাই বোধহয় সানাইয়ের সুর সুখ-দুঃখে মেলানো। আজকাল আর সেই সানাইয়ের সুরও নেই, সেই অনুভূতিও নেই।

সবই জানা, সবই চেনা।

অম্লান আর ফাল্গুনী একই পাড়ার ছেলেমেয়ে। একই সঙ্গে বড় হয়েছে। অবস্থার দিক দিয়েও পার্থক্য বিশেষ নেই। ছেলের বাবা ক্লার্ক। কোন একটা মার্চেণ্ট অফিসে। ফাল্গুনীর বাবা দালালী করে দু পয়সা কামায়। দুই পরিবারে ভাব-সাবও আছে।

কখন যে এরা কি করছে অতশত ভাববার বা দেখবার সময় খুব একটা নেই। দুজনেই যার যার পরিবারে বড়। ছোট ছোট ভাই বোন আছে। তাদের নিয়ে ও হেঁসেল ঠেলা এই দুকাজে মায়েরা শশব্যস্ত। বাপেরা অবশ্য কাজের শেষে সামান্য যা সময় মাঝে মধ্যে পায় তা পাড়ার কারও ঘরে বসে পরনিন্দা পরচর্চা বা তাস পেটানো নিয়ে কাটিয়ে দেয়।

অম্লান ও ফাল্গুনীর যদিও একই সঙ্গে একই ভাবে বড় হবার কথা ছিল তা কিন্তু ঠিক হয়ে ওঠেনি।

ফাল্গুনী ক্লাস ফাইভে উঠতে বড় মাসীর সঙ্গে দিল্লী চলে গিয়েছিল। মেসো ওখানে সেকেণ্ড ডিভিসন ক্লার্ক হলে কি হবে। ওখানকার মাইনে স্টেটের চাইতে বেশি। তাই সংসারও স্বচ্ছল।

একবার কলকাতাতে এসে বোনের দুরবস্থা ও এণ্ডি পেণ্ডির বহর দেখে বলেছিল—দেখ বুড়ী, তোর যা অবস্থা দেখছি, তার চাইতে তোর বড় মেয়েটিকে আমার সঙ্গে দিয়ে দে। আমার ছোট ছেলেটির সঙ্গে স্কুলে পড়বে। হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করলে দেব তোর কাছে পাঠিয়ে।

সব দিক বিবেচনা করে ফাল্গুনীর বাবা মা দিয়েছিলেন ওকে পাঠিয়ে।

পরে ও কলেজে পড়বার জন্য কলকাতাতে এসে হাজির হয়। সেই থেকেই কলকাতাতে।

ফার্স্ট ইয়ারেই ওর অম্লানের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। নূতন করে, নূতন ভাবে।

অম্লান তখন শেষ সিঁড়িতে পা দিয়েছে। মানে, কলেজ জীবনের অবসান আসন্ন।

ফাল্গুনীর শুরু। শুরু আর শেষ দেখা হয়ে গেল সিঁড়ির মাথায়।

'এই যে, ফাল্গুনী না? মাসীমা বলছিলেন অবশ্য আসার কথা।

কি দারুণ বড় মনে হচ্ছে। কি বলা যায় আপনি, তুমি না তুই ? ছোট মেয়েটি যাকে তুই, তুই, করে কান মলতেও দ্বিধা হত না তার চিহ্ন যে কোথাও নেই।

একটু হেসে ফাল্গুনী বলেছিল, আপনি তুমিই বলবেন।'

'বাস রে, এ কিরকম হল ? আপনি আজ্ঞের মাঝখানে তুমি তো হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে। তার চাইতে এসো একটা রফা করা যাক তুমিরই হোক জয় জয়কার। দুপক্ষের জন্য তুমিই থাক। কি বল ?'

এতক্ষণ ফাল্গুনী সপ্রতিভ অম্লানকে দেখছিল। সেই ছোট্ট অম্লান কিন্তু অম্লানের মধ্যে বেশ উঁকি ঝুঁকি মারছে। তখনও চার চোখে কথা বলত, এখনও বলে।

চেহারা সাধারণ, কিন্তু চালচলনে বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে। চটক আছে।

'কি হল ? ভাবনায় পড়ে গেছ ? যদি আগের মত কোন কিছুর উত্তর চট করে দিতে নারাজ।'

'না, তা কেন হবে - সেই কথাই রইল আমিও তুমি বলব।'

এই ভাবেই ওদের শুরু হয়ে গেল সেই বিশেষ বয়সে যা হতে পারে।

'এই ফাল্গুনী, মাসীমাকে বলে আসবে কালকে কলেজের পরে ফিরতে দেরি হবে। বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছি, মানে ক্লাসের পর দুজনে যাব একটা সিনেমা দেখতে।'

'সেটা কি ঠিক হবে ? অনেক রাত হয়ে যাবে ফিরতে ?'

'আমি তো সঙ্গে থাকব।' না দাঁড়াও, বলা তো আর যাবে না আমি ছিলাম সঙ্গে। তবে ?'

তার ব্যবস্থা করে নিতে পারি।'

'কি রকম ?'

'বন্ধু আর বন্ধুর ভাই সঙ্গে এসেছিল পৌঁছুতে।'

'হুরে, তাই তো এত ভাল লাগে ফাল্গুনীকে' বলে অম্লান কাছে,

সরে এসে হাতটা ধরল।

'এই কি হচ্ছে এত লোকের মধ্যে।'

'এরকম ভাবে বললে কিন্তু একটা কিছু করে ফেলব' বলে হাসতে হাসতে অম্লান ওর হাত ছেড়ে দিয়েছিল।

এই ভাবে কখনও লেকের পাড়ে কখনও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কখনও গড়ের মাঠে ওদের কাটত সন্ধ্যাটা। কেউ যদি খেয়াল রাখত তবে দেখতে পেত অম্লান নামে একটি ছেলে ও ফাল্গুনী নামে একটি মেয়ে একসঙ্গে কলকাতায় বড়রাস্তা থেকে আরম্ভ করে অলিগলি কোন কিছুই বাকি না রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে—হাসি ও আনন্দের প্রতিমূর্তি হয়ে—

দিনগুলো বেশ হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখা গেল অম্লান বি এ পাস করে গিয়ে ঢুকেছে ইউনিভারসিটিতে আর ফাল্গুনী কলেজেই। এখন দেখা সাক্ষাৎটা তত সহজ নয়।

তবে অসহজও নয়। বাস স্টপেজ, ট্রাম ধরবার রাস্তায় দুজনের প্রোগ্রাম হয়ে যেত ঠিক। কবে কিসের দরজার কাছে, কোন্ রাস্তায়, কোন্ গাছের নিচে, কোন্ দোকানের গা ঘেঁসে অপেক্ষা করতে হবে ক'টার সময়।

এই ভাবে ওরা আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসতে লাগল। আর সেই সঙ্গে ধাপে ধাপে এগিয়েও যেতে লাগল। ফাল্গুনী বি এ. শেষ করল আর অম্লান এম. এ.।

এখন অম্লান গিয়ে ঢুকল উমেদারীর ক্লাসে, মানে চাকরীর চেষ্টায়। আর ফাল্গুনী পেয়ে গেল কাছাকাছি একটা বাচ্চাদের সাধারণ স্কুলের টিচারী।

ভাল স্কুলে ঢুকতে গেলে নার্সারীর ডিপ্লোমা চাই। বাবার এই রোজগারে আর সে-সব বড়মানুষী চলে না। তাই ঠিক করল মাষ্টারীর সঙ্গে সঙ্গে পড়াটা চালাবে।

বাবা মা-ও খুশী। মেয়ে দু-পয়সা আনতে থাকলে বড় সাশ্রয়। বিয়ে দিতে হবে। লাগবে টাকা। রোজগারের পয়সাটা আলাদা করে

যতটা সম্ভব রাখতে লাগল।

বিকাশবাবু একদিন বলছিলেন স্ত্রীকে, 'মেয়েটা তো বড় হল। বিয়ে দিতে তো জমা টাকা শেষ হলেও হবে না। আবার তার উপর করতে হবে কর্জ।'

'কেন পণ দেওয়া তো বারণ, নেওয়াও অবশ্য বারণ।'

'কে শুনছে বল? চুপে চুপে নিচ্ছে।'

'আমরা নিয়মের বাইরে যাব না।'

'তবে বসে থাক আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে।'

বিকাশবাবু এদিক সেদিক চেষ্টা আরম্ভ করে দিলেন। ফাল্গুনীর কানেও কথাটি উঠল ছোটবোনের কাছ থেকে।

ও অবশ্য ততটা কিছু বিচলিত হল না। বিয়ের বাজার ও জানে। চেষ্টা করতে করতে বছর ঘুরতে থাকবে। ততদিনে অম্লান কি কিছু একটা জোটাতে পারবে না?

এই ভাবেই দিন গড়িয়ে যাচ্ছিল। অম্লানও যেন কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল। ওর মত চটপটে চৌকস ছেলেও হালে পানি পাচ্ছিল না।

'ফাল্গুনী, কি যে হল কোনদিকেই যে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না।'

'তুমি বড় অধীর হয়ে পড়। ভাল একটা কিছু পেতে গেলে সময় একটু লাগে বইকি।'

'বুঝি তো সব। এক এক সময় মনে হয় সাধারণ কিছু নিয়ে ফেলি। এ ভাবে আর কতদিন চলে? চৌদ্দ মাস তো হল।'

ফাল্গুনীরও যেন কেমন উৎসাহের জোয়ারে ভাটা পড়ে আসছিল। তাছাড়া ওর বাবা উঠে পড়ে লেগেছিল বিয়ের জন্য।

ওর পরের বোনটিও বি এ পড়ছে। দেখতে ভাল, গান করে ভাল। কি যে বলবে, যেন ঠিক পায় না।

এই রকম যখন পরিস্থিতি হঠাৎ অম্লানের হয়ে গেল একটা মাঝারী মত চাকরি। ওর বাবার তুলনায় তো অনেক ভাল। ইন্টারভিউতে

অফিসাররা পছন্দ করেছে।

দুজনে গেল একসঙ্গে কালীবাড়িতে মানতের পুজো দিতে। কি আনন্দ সেদিন ওদের।

অম্লান ক'দিন খুব ব্যস্ত। সকাল সকাল অফিস যায়, দেরী করে ফেরে। ফাল্গুনী আর ওর দেখা পায় না। ফাল্গুনীর এতদিন ছিল এক চিন্তা অম্লান কবে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। কবে ওদের ছোট্ট সংসার শুরু হবে। এতটুকু বাসা, মনে ছিল আশা।

অম্লানের সঙ্গে অনেক করে যদি দেখাও হয়, মনে হয় বড় ব্যস্ত।

'ফাল্গুনী, ছুটির দিনে তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে হচ্ছে। ভাল চাকরী পেয়েছি, সকলে খুশী। সবাই দেখতে চায়। বাবা-মা বলছেন যেতে, কিছু মনে কোর না।

পরের হপ্তায়ও প্রায় একই অবস্থা। এদিক সেদিক কোথাও না কোথাও অম্লানের যাওয়ার তাগিদ থাকে।

উমেদার অম্লান তো নয়—যার ফাল্গুনী ছাড়া গতি ছিল না। এখন হচ্ছে ভাল চাকুরে অম্লান। ফাল্গুনীর বন্ধুমহলে সবাই প্রায় জানত অম্লান ফাল্গুনীর ব্যাপারটা। কয়েক বছর ধরেই তো চলছিল।

এমন অনেকেই জিজ্ঞাসা করে ফাল্গুনীকে, কি ব্যাপার ? এখন আর দেরী কিসের জন্যে ?'

'দাঁড়া না অত তাড়া কিসের।'

এই এক কথা বলেই ফাল্গুনীকে নিজের মান রাখতে হয়।

সত্যিই তো অম্লান যেন কেমন হয়ে গেছে চাকরী পাবার পরে। মনে হয় ছাড়া ছাড়া। আবার ভাবে মনের ভুল। সবে চাকরীতে ঢুকেছে, তাই ব্যস্ততা। ক'দিন কাটলে আগের অম্লানে ফিরে যাবে, তখন কথাটা পাড়া দরকার।

দিন কাটতে থাকে। ফাল্গুনী আর ওকে তেমন ভাবে পায় না। এদিকে কানে আসতে থাকে নানা কথা। অম্লানের ভাল ভাল সম্বন্ধ আসছে। ওর পরিবারের লোকেদের মেয়ে দেখার ধুম পড়ে গেছে। অবশ্য অম্লানের কথা কিছু শোনে নি।

ফাল্গুনীর মনের উপর বেশ আঘাত পড়াতে শরীরেও তার আভাষ দেখা দিচ্ছিল।

'কি রে ফাল্গুনী, তোর শরীরটা কেমন দিন দিন কাহিল হয়ে পড়ছে? ভাল করে খাস না। কি যেন ভাবিস। বল তো, মা খুলে, কি হয়েছে?'

'কিছু না মা। স্কুলে খাটুনী একটু বেশী পড়েছে।'

'মেয়েটার একটা বিয়ের ব্যবস্থা কর। কি যে ভাবে দিনরাত। কেমন যেন শুকিয়ে উঠছে।' স্বামীকে বললেন।

'তুমি কি মনে কর আমি চেষ্টা করছি না? বোঝ তো দিনকাল। তবে একটা সম্বন্ধ এগিয়ে আসছে মনে হচ্ছে। আশা করছি ক'দিনের মধ্যে মেয়ে দেখতে চাইবে।'

এই রকম যখন পরিস্থিতি হঠাৎ অম্লানের সঙ্গে ফাল্গুনীর দেখা হয়ে গেল আগের পরিবেশে। মানে, লেকের কাছে।

অম্লানের অফিসের ছুটি একটু আগে হওয়াতে লেকটা ঘুরে আসনে, আর ফাল্গুনীর স্কুলে কি কারণে হাফ হলিডে হয়েছে।

কোথাও না গিয়ে ফাল্গুনী গিয়ে লেকের পাড়ে বসেছিল। ভাবছি, ওর এক বন্ধুর দুবছর আগে বিয়ে হয়ে গেছে। বাবা মা-ই ঠিক করে দিয়েছে।

চেনা নেই জানা নেই। বিয়ের সময় বন্ধু বলেছিল, 'তুই বেশ আছিস ভালবেসে জেনে শুনে বিয়ে করবি। আর আমার অবস্থা দেখত, দুদণ্ড চোখের দেখাই শুধু দেখেছি।'

ফাল্গুনীরও মনে হয়েছিল—সত্যিই তো এভাবে বিয়েটা ঠিক জুৎসই নয়। চেনা জানা নেই। বিয়ের দিন যাবার সময় ওর মনটা বন্ধুর জন্য ব্যথিয়ে উঠেছিল। নিশ্চয়ই মন খারাপ করে রয়েছে। গিয়ে কিন্তু তার কোন আভাস পায়নি। হাসি খুশী চেহারা।

তখন মনে হয়েছিল না জানার মধ্যে আশা আছে। তাতেই বোধ হয় মন ভরে থকে।

তারপর বছর ঘুরতে দেখল দুজনে যে শুধু ভাল আছে তা নয় দুজন

দুজনকে সত্যিই ভালবাসে। মনের মিলও খুব।

আর তার কি হল? যে এত দিনের চেনা, এত বিপর্যয়ের মধ্যে জানা সে আজ মনে হয় অজানা। যাকে এত বছর খুব কাছের মনে হত তাকে মন খুলে দেখাতে পারছে না। কিন্তু কেন?

ঠিক সেই সময় অম্লান এসে পাশে বসল। দূর থেকেই অম্লান ওকে দেখেছিল। মুখটা এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ হয়েছিল নাকি? কিছু তো জানি না। জানবোই বা কি করে। ওর খোঁজ তো রাখি না।

নিজেকে কেমন দোষী মনে হতে লাগল।

আসতে আসতে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা চোখের সামনে ভেসে উঠল। কলেজে প্রথম দেখার দিন থেকে, দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর এক সূত্রে ছিল দুজনে বাঁধা। এমন কি ওর উমেদারীর দুঃসহ জীবনেও ও ছিল পাশে। তারপর কি যে হল! চাকরী পাবার পরে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াতে ও যেন কেমন গা ভাসিয়ে দিয়েছিল।

'এত ভাল চাকরী পেলি, ভাল করে বিয়ে কর। সব দিকে তোর উপযুক্ত হবে। তা ছাড়া নানা ভাবে শ্বশুরবাড়ির সাহায্য পাবি।'

'ফাল্গুনী?'

'দুদিন কষ্ট পাবে, তিন দিনের দিন চোখ মুছে তার উপযুক্ত মত ছেলেকে বিয়ে করে সুখে দিন কাটাবে। এই তো নিয়ম।'

'ঠিক বলেছে সরোজ। সেই জন্য তুই ঠকবি কেন?'

ও বলে, 'দাঁড়া, ভেবে দেখি।'

'এতে আর ভাববার কি আছে। এ তো সহজ কথা।'

ও শুধু চুপ করে হাসে। মনটা যে ওর একটু নড়েনি তা ঠিক নয়।

সেদিন বড়ঘরের একটি সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে চেনা হল। ওর সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছে। চায়ে ডেকেছিল অম্লানকে। আলাপ হল। পরে দুজনে বেড়াতেও গিয়েছিল।

মনে যে একেবারে দোলা লাগেনি তা বললে মিথ্যা বলা হবে।

কিন্তু সেইখানেই ফাল্গুনীর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। তাই কি ও ফাল্গুনীকে এড়িয়ে চলে, বুঝতে চেষ্টা করছে নিজেকে ?

আস্তে আস্তে এসে বসল ফাল্গুনীর পাশে।

'আজ কি তোমার স্কুল ছুটি ?' ফাল্গুনী যেন কেমন চমকে গিয়েছিল। যার কথা বসে বসে ভাবছিল তার স্বর এত কাছে থেকে ? এ কি মায়া, না স্বপ্ন ? ফাল্গুনী চোখ তুলে অম্লানের দিকে তাকাল। সেই অম্লান যাকে রোজ না দেখলে চলত না। যার সঙ্গে রোজ দেখা হত। আজকাল দিনের পর দিন কেটে যায়, চোখের দেখা পর্যন্ত হয় না।

চোখের দেখা যদি বা হয় কালে-ভদ্রে। নিজের মধ্যে ও দেখল যেন কেমন পরিবর্তন। কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব।

সত্যিকারের ভালবাসা একই থাকে কিন্তু প্রকাশটা আড়ষ্ট হয়ে আসে।

'কি হল ? কথা বলছ না কেন ? রাগ করেছ ? করাই উচিত আমি বুঝি। আমার সব ত্রুটি মাপ করে আজকে এস আমরা সেই আগের ফাল্গুনী আর অম্লান হই।'

অম্লান আস্তে আস্তে ফাল্গুনীর হাতটা তুলে নিল।

আকাশের কালো মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে দুজন দুজনের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে। যেন খুশীর জোয়ারে উছলে পড়ছে।

সুকুমার সিংহরায়

স্বপ্নের বাইরে

ঝুমুর যখন খিলখিল করে হাসতে হাসতে ধনুকের মত বেঁকে পড়ে, তখন মনে হয় ওর হাসি থেকে যেন তীর ছুটে যাচ্ছে। ও যখন তাকায় তখন ওর ভ্রমর কালো চোখ দু'টা নামী কোন চিত্রাভিনেত্রীর চোখের চাউনি অনুকরণ করে। ও যখন রাস্তায় বেরোয় তখন ওর শাড়ির গিঁট থাকে নাভির নীচে। গোল সিকির আকারে থলথলে নাভি হুমড়ি খেয়ে বেরিয়ে থাকে শাড়ির বাইরে। অনায়াসে



রাস্তার লোক তখন হাঁটতে হাঁটতে চোখ বুলিয়ে ওর নাভি চেটে নেয়। ঝুমুরের তখন খুব আনন্দ হয়। ও তখন নিজেকে খুব বেশি সুন্দরী ভেবে বসে। আবার ও যখন হাত-কাটা ব্লাউজ পরে বাসে ওঠে এবং বসার সিট না পেয়ে দুহাত তুলে রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন বাসের যাত্রীরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তখনও ঝুমুর ভাবে ও খুব সুন্দরী। নইলে যাত্রীরা তার দিকে তাকিয়ে থাকবে কেন?

ঝুমুরের এই বেহায়া হাসি, চোখের চাউনি, নাভির নীচে শাড়ি পরা, হাত-কাটা ব্লাউজ পরে সুন্দরী ভাবা—এ সব আমার ভাল লাগে না।

তবে ভাল না লাগলেও ঝুমুরকে কোন দিন আমি মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে পারিনি। এটাই ঝুমুরের কাছে আমার সবচেয়ে বড় অক্ষমতা।

তবু ঝুমুর যে আমার কাছে আসে এটা ভাবতেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। ঝুমুর ইচ্ছে মত যেমন সাজুক না কেন, ও না সাজলেও দেখতে খারাপ না। ওর সারা গায়ে কাঁচা হলুদ রঙের চটক আছে, সারা গা-টা যেন মোম দিয়ে মাজা। নড়লে চড়লে চক্‌চক্‌ করে ওঠে। উপচে পড়া যৌবন। ডিমের মত মুখে ঈষৎ বাঁকানো টিয়াপাখি নাক। মাথার চুলের ডগাগুলোকে কাস্তের মত বেঁকিয়ে ছাঁটা। পেশীবহুল প্রসারিত দুটি হাত। সুন্দর সিকির আকারে নাভি। ঠিক যেন চড়ুই পাখির ঘুলঘুলি। ভারি পাছার উপর টাইট করে যে কোন শাড়ি পরলেই ওকে ভাল মানায়।

এক কথায় ঝুমুর বেশ সুন্দর। ঝুমুরের কাছে আমি কিছুই না। আমার রূপ নেই—এ কথা অনেক মেয়ের মুখ দিয়ে শুনেছি। শুধু ঝুমুর এ কথা বলেনি। আমার গুণও নেই—এ কথাও অনেক মেয়ের মুখ দিয়ে শুনেছি। শুধু ঝুমুর শুনে এ কথাটা মেনে নেয়নি। ওর চোখে নাকি আমি অনেক বড়। আরো বড় হব। আমি মানি না। মানতে সাহস হয় না। নিজের বড় হবার কথা কি আগে থেকে ভাবতে পারা যায়? আমি মনে করি, আমি সাধারণ পাঁচজনের মত। শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে, আমি তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে পারি। ব্যাস, এই পর্যন্ত। বাড়িয়ে বললে বলা যেতে পারে—এখানে সেখানে আমার বেশ কয়েকটা ছবির একক প্রদর্শনী হয়েছে। এবং আমার ছবি দেখে নাকি অনেকে প্রশংসা করেছে। নিজে কানে কোন দিন শুনিনি। শোনার ভাগ্যও হয়নি। তবে ঝুমুর শুনেছে। শুনে এসে বলেছে, শিল্পী শান্ত রায়ের একক চিত্র প্রদর্শনীর প্রশংসা শুনে এলাম। বলতে বলতে ঝুমুরের গলা থেকে তখন আটকে থাকা এক মুখ খুশির উচ্ছ্বাস মাটিতে ফেটে পড়েছে।

ঝুমুরের এই উচ্ছ্বাসে যে স্বপ্ন ছিল তা আমার পক্ষে বুঝে নিতে একবিন্দুও কষ্ট হয়নি। শুধু ভেবেছি, স্বপ্ন দেখা ভাল। স্বপ্নতে

থাকে। কিন্তু স্বপ্ন ভাঙা? তাতে কোন সুখ থাকে না, থাকে বিষাদ। ঝুমুরের এই স্বপ্ন দেখা কিংবা আমার এই অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বপ্ন খুঁজে পাওয়া কি অবধারিত?

* * * *

ঝুমুর বাবার এক মেয়ে। বাবা রেলের অফিসার। মা স্কুলের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট টিচার। ওদের আভিজাত্যের একটা বড়াই আছে। ঝুমুরকে দেখলে তা বোঝা যায়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় শাড়ি ব্লাউজ বদলানো, মুখের উপর ইকড়ি-মিকড়ি সাজ। মুখ টিপে গুন গুন করে হিন্দী গানের সুর ভাঁজা। এ সব ঝুমুরের স্বেচ্ছার আধিপত্য। ঝুমুর যখন তখন আমায় বলে, আমি হলাম বাপী আর মামনির খেলার পুতুল। ওরা আমায় অনেক দেয়। তুমিও আমার সঙ্গে এলে তোমাকেও ওরা দেবে।

আমি কারো কিছু প্রত্যাশী কিংবা খেলার পুতুল হতে চাই না। সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জনের কথা ভাবতে হয়। উপার্জনই আমায় ভবিষ্যতে দূরদৃষ্টির শক্তি এনে দেয়। সময় আমার বরাবর কম। ঝুমুর এ কথাটা বুঝতে চায় না। চায় না বলেই আমার কাছে আসে। আর এসে এসে বিরক্ত করে। বিরক্ত ছাড়া কি বলব? ভাল না লাগলেই তো বিরক্ত ভাবে মানুষ। ঝুমুর বলে, ঘরে বসে বসে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। চল, কোথাও সিনেমা দেখে কিংবা বেড়িয়ে আসি।

এখন আমি ঝুমুরের মুখের ওপর এই কথা বলে ফেলি, না, ভাল লাগছে না। তুমি একা ঘুরে আসতে পারো।

ঝুমুরের মুখ কেমন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। ওর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার তখন মনে পড়ে যায়—ঝুমুরকে নিয়ে প্রথম যেদিন রাস্তায় বেরিয়েছিলাম সেই দৃশ্যটার কথা।

উড়ন্ত বকের মত শাড়ির আঁচল দুলিয়ে দুলিয়ে ঝুমুর হাঁটছিল। আমি হাঁটছিলাম। আমার দিকে রাস্তার কোন লোকই তাকিয়ে দেখেনি। ঝুমুরের দিকে সবাই কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে

দেখছিল।

মনে হয়েছে তখন রাস্তার লোকেরা ঝুমুরের লালিত্যময় নরম দেহটাকে গিলতে চাইছে। ঝুমুর দেখে বোকার মত বলেছে, দেখছো তো, তোমার দ্রব্যসামগ্রীতে কেমন নজর পড়ছে?

আমার রাগ হয়েছে। সে রাগ ঝুমুরের জন্যে। তবু রাগ দেখিয়ে বলতে পারিনি, ওরা তোমায় কেউই নজর দিচ্ছে না ঝুমুর। ওরা দেখছে তোমার নগ্নতা। তোমায় সুন্দরী বলতে ওদের বয়ে গেছে।

কেন বলতে পারিনি, আমার জানা নেই। এ কি মনের দুর্বলতা? না অন্য কিছু? ঝুমুর তো কতবার ঝড়ের মত দৌড়ে এসে আমার ঘরের নির্জনতায় বসে ওর আনন্দের গল্প করেছে। যে গল্প আমার ভাল লাগার মধ্যে পড়েনি। তবু প্রতিবাদ করতে পারিনি। ঝুমুর স্বাধীন ভাবে গল্প বলেছে, এ্যাই শুনবে? আজ একটা মজার কাণ্ড হয়েছে।

আমি বলেছি, কি?

পাশের বাড়ির নবাবকে তো চেনো তুমি?

বিশু?

হ্যাঁ। ও আমায় ফোন করেছিল। কি বলছিল জানো?

না বললে কি করে জানব?

বলছিল, তোমার চোখ দুটো কি সুন্দর, দেখলেই আমার বুকে চিন্‌চিনানি ধরিয়ে দেয়। তোমার হাসিটা না ভারি সুইট, চিনির চেয়েও। লাল শাড়ী পরলে তোমায় একসেলেন্ট লাগে। ঠিক যেন সুচিত্রা সেন। এই যে তুমি কথা বলছ, এখন আমার কি মনে হচ্ছে জানো? তোমার গলা থেকে যেন পিওর হনি ঝরছে। বলেই মুখ থেকে 'চুঃ' করে চুমু খাবার শব্দ করেছিল। আমি তখন কি করলাম জানো?

বললাম তো, না বললে আমি কি করে জানব। আমি কি অন্তর্যামী নাকি?

ঝুমুর বলেছে, বাবাঃ! কথা বলতে গেলে এই রকম একটু বলতে

হয়। নাও শোন—ঝুমুর বলেছে, আমার গলার স্বরটা এখন শুনতে পাচ্ছো? কি মনে হচ্ছে তোমার?

ঝুমুর যে এই রকম ভাবে গলার স্বর বদলাতে পারে তা আমার আগে জানা ছিল না, আমি! শুনে বলেছি, এ গলা তোমার নয় বুঝেছি। কিন্তু কার?

এ গলার স্বর আমাদের বাড়ীর রাঁধুনি মাসী মোক্ষদার। এই গলা করে তোমাদের নবাব কার্তিককে বলেছি, দিদিমনিরে কথাগুলান কইয়া দেব?

অপর প্রান্ত : কে? কে? কি বলছেন?

ঝুমুর : আমি দিদিমনির রাঁধুনী মোক্ষদা কইতেছি বাবু।

অপর প্রান্ত : ননসেন্স?

ব্যস, লাইন কেটে গেল। ঝুমুর কথা থামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শাড়ির আঁচলটাকে মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ধনুকের মত বেঁকে পড়েছে।

ঝুমুরের এই গল্প শুনে না হাসলে নয়, তাই একটু হেসেছি। আমি বুঝেছিলাম, ঝুমুর নিজের খ্যাতি বাড়াবার জন্যেই এ গল্পের ফাঁদ পেতেছে। তবু ঝুমুরকে মুখের উপর কিছু বলিনি, হ্যাঁ, হুঁ শব্দ করে ওর গল্প শুনেছি। আর ঘাড় নেড়ে নেড়ে সায় দিয়েছি। কিন্তু ঝুমুর যদি আজ আসে? ও তো আসবেই, কথা দিয়ে রেখেছে। এসে যদি বলে, চল, কোথাও ঘুরে আসি। ও তো একথা বলবেই। প্রতিদিনই বলে। আজ কেন বাদ পড়বে?

আমি কি আজ ঝুমুরকে বলে ফেলব? আমার মনের একান্ত গোপন ইচ্ছার কথা? কি করে বলব? বলব—না ঝমুর, তোমার সঙ্গে আমি কোন দিন কোথাও যাব না। ঝুমুর যদি জিজ্ঞেস করে, কেন তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও না? তখন কি করে বলব, থলথলে নাভির নীচে শাড়ী, হাত কাটা ব্লাউজ, খিলখিল বেহায়া হাসি, আমার মনকে কষ্ট দেয়। তুমি ঐ বেশে আমার সঙ্গে হাঁটলে রাস্তার লোক

তোমায় নগ্ন ভাবে। এ ভাবে বলব? না অন্য কোন ভাবে বলব? সেটা কি ভাবে বলা যায়?

ঐ তো সেই শব্দ। বিশেষ শব্দ। ঝুমুর আসার শব্দ। ঝুমুর যখন আমার ঘরে ঢোকে তার আগেই ওর পায়ের তোড়া থেকে ঝমর ঝমর শব্দ এসে আমাকে জানিয়ে দেয়—ঝুমুর আসছে। আমি তখন নিজেকে তৈরী করে নিই। ঝুমুরকে আজ কি বলব? আজ ঝুমুরকে যদি জীবনের একটা গল্প শোনাই।

ঝুমুর এসে ঘরে ঢুকল। আমার সামনের লাল সোফাতে বসতে বসতে বলল, কি করবে এখন?

ঠিক নেই।

চল, সিনেমা দেখে আসি।

না, বৃষ্টি নামবে এক্ষুনি।

জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে ঝুমুর চোখটাকে ছুঁড়ে দিল। রাশি রাশি কালো মেঘের ইতস্তত আনাগোনা। ঠাণ্ডা বাতাস বাইরে থেকে যুদ্ধ করে ফিরছে। চোখ ফিরিয়ে ঝুমুর বলল, তাহলে বোবা হয়ে থাকবে?

কেন, গল্প বল?

কি গল্প বলব? আমার কিছু মনে পড়ছে না। তোমার ইচ্ছে যদি বল।

আমি বলব? এই সুযোগে যদি ঝুমুরকে আমি আমার মনের গাথাটা শুনিয়ে দিই, তাহলে কেমন হয়? ঝুমুর কি আমার মনের অভিসন্ধি আমার গল্প থেকে বুঝতে পারবে? বলেই দেখি, ঝুমুর বোঝে কি না। বললাম, শুনবে গল্প? তোমার জন্যে আমার একটা ভাল গল্প মনে এসেছে—

ঝুমুর কথাটাতে জোর না দিয়ে হেলায় বলল, বল—

বললাম, কোন এক গল্পটার নাম কোন এক যুবক যুবতীর গল্প।

মনে কর, যুবকটা এক অতি সাধারণ। তার কোন বিশেষ স্বপ্ন থাকলেও সে সহজে তা প্রকাশ করে না। মনের ক্ষুধা মেটাতেই ইজেলে সে তুলির আঁচড় টানে। বেঁচে থাকাটাই তার কাছে সম্পদ। কিন্তু তার জীবনে রুচি আছে। সে শিল্পী, শিল্পী মন তার নগ্নতা পছন্দ করে। তবে প্রকাশ্যে নয়, গোপনে।

তার সঙ্গে এক যুবতীর আলাপ, যুবতীটি আভিজাত্যের ঢেউ খেয়ে মানুষ হয়েছে। সে শিল্পী মনের কথা বুঝতে চায় না। জানতেও চায়নি কোনদিন। এখানেই যুবকের সঙ্গে যুবতীটির পার্থক্য রয়ে গেছে।

যুবতী যখন যুবকের কাছে আসে, যুবকের ভাল লাগে না, যুবতীকে নয়, যুবতীর অশালীন সাজগোজ—নাভির নীচে শাড়ী পরা, হাত কাটা ব্লাউজ পরে বাসে ওঠা, সব সময় চাউনিতে চিত্রাভিনেত্রীর চোখের চাউনি অনুকরণ করা, কথায় কথায় খিলখিল করে বেহায়া হাসি হাসা —এ সব সময় যুবকের রুচির বিরুদ্ধ ঘোষণা করে। শেষে যুবক তার মনের কথা বলে ফেলে, এসবের জন্য তার ভাল লাগে না।

যুবতীর আশ্চর্য হয়ে যাবার কথা। আশ্চর্য হয়ে যায়। বিস্ময়-পূর্ণ গলায় জিজ্ঞেস করে ওঠে, ফ্যাশান ভালবাস না তুমি?

যুবক বলে, ফ্যাশন ভালবাসি, কিন্তু ফ্যাশনের মধ্যে নগ্নতাকে মোটেই ভালবাসি না।

যুবতীদের জিজ্ঞেস করে, কেন?

যুবক তখন তার একান্ত মনের কথা এক এক করে বলে ফেলে, তুমি যখন রাস্তা দিয়ে ঐ বেশে হাঁটো তখন রাস্তার লোকেরা তোমায় চোখ দিয়ে গিলে গিলে খায়। তুমি তখন নিজেকে সুন্দরী ভাবো। আর আমি ভাবি কি জানো? ওরা আমার ব্যক্তিগত অধিকার, যে অধিকার আমি ছাড়া আর কেউ ভোগ করতে পারবে না, সে অধিকারকে লুটে নিতে চাইছে। আর তুমি স্বেচ্ছায় ওদেরকে হাসতে হাসতে বিলিয়ে চলেছো। তখন আমার মনটা বলি দেওয়া পাঁঠার মত

যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে ! সে তুমি বুঝবে না। কোন দিনই বুঝবে না। যুবকটা তখন—

থাক্, বুঝেছি। আর বলতে হবে না। এ গল্প আগে বলনি কেন ? ঝুমুর আমার গল্প বলায় ব্যাঘাত ঘটাল।

বললাম, সুযোগ পাইনি।

ঝুমুর আর কথা বাড়াল না। গালে হাত দিয়ে ভাবনার অতল সাগরে তলিয়ে গেল। তলিয়ে গিয়ে সাগরের নীচ থেকে কিছু মণি-মুক্তো খুঁজতে চেষ্টা করল। পেল কিনা বুঝতে পারলাম না। তবে আর বসল না সে। সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে কাপড়টাকে টেনেটুনে ঠিক করে নিল। সামনের কপালে ঝুঁকে থাকা আঁকিবুঁকি চুলগুলোকে হাত দিয়ে পিছনে সরিয়ে দিল। ভাবলাম, ঝুমুর যাবার সময় অন্তত কিছু বলে যাবে। ও কিছু বলল না। নিঃশব্দে ঘরের বাইরে চলে গেল। বাইরে তখন মুসলধারে বৃষ্টি পড়ছে। ঝুমুর নিশ্চয়ই ভিজে যাবে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কলঙ্কবতী

আরাবল্লী পাহাড়টা দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত রাজস্থানকে যেন মাঝামাঝি চিরে দিয়ে গেছে।

র-পূর্ব পাহাড়ের গা ঘেঁষে প্রায় টঙের ওপর বসে আছে ভরতপুর। ছোট জায়গা। সকালের ঘুমভাঙা চোখে আকাশের দিকে চাইতে গেলে প্রথমেই পাহাড়ের গায়ে চোখ আটকে যায়।



একে ওকে জিজ্ঞাসা করতে বাড়িটা খুঁজে পাওয়া গেল।

অবশ্য যাকেই জিজ্ঞাসা করেছি সেই নিশানা বলে দিয়েছে। আমার কাছে সবই নতুন বলে হদিস পেতে সময় লেগেছিল। তবু এ জায়গায় ভদ্রলোকটির পরিচিত আছে বোঝা গেল। চার দিকে সুপরিচ্ছন্ন বাগান। মাঝখানের লাল মাটির রাস্তাটা একেবারে বাড়ির সিঁড়ির গায়ে গিয়ে ঠেকেছে।

গৃহ-স্বামীর নাম মাধব চতুর্বেদী।

আমার পরিচিত নন, কখনো দেখিওনি তাঁকে। আমার বিশেষ একজন পরিচিত ভদ্রলোক তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভরতপুরে এঁর সঙ্গে শুধু দেখা করার জন্যেই সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন নি, সঙ্গে চিঠিও দিয়েছেন। শুনেছি, প্রাক্ স্বাধীনতায় স্টেটের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন মাধব চতুর্বেদী। এখন অবসর নিয়েছেন।

এ জায়গায় একদিন থাকব কি সাতদিন, নিজেও জানতাম না। ভালো আস্তানা পেলে আর ভালো লাগলে দিন কতক কাটাতে পারি। নয়তো সেদিনই তল্পি-তল্পা গোটাতে পারি। মোট কথা, অবসরপ্রাপ্ত কোন ভদ্রলোকের ঘাড়ে চেপে বসার ইচ্ছে আমার আদৌ ছিল না।

তবু প্রথমেই এঁর কাছে এলাম, কারণ, স্থানীয় অভিজ্ঞ কারো কাছে জায়গাটার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া দরকার।

ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়ে এতবড় বাগান ঘেরা এমন ছবির মত বাড়িটার দিকে এগোতে এগোতে অস্বস্তি অনুভব করছি। পরনের খাকী ট্রাউজার, ছিটের বুসশার্টের মলিনতা যেন বেশী করে চোখে পড়তে লাগল নিজেরই। কাঁধের খাকী ঝোলার মধ্যে যা আছে তাও এমন বাড়িতে খুব চলনসই নয়।

পায়ে পায়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালাম। সিঁড়ির পরে প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দায় এক প্রস্থ টেবিল চেয়ার। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি চাকর বাকর যদি কাউকে দেখতে পাই। বারান্দার ওধারের ঘর থেকে একজন মহিলার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় ঘটল। দুই এক মুহূর্ত। মহিলা সরে গেলেন। একটু বাদেই তিনি ঘর থেকে বেরুলেন আবার। এবার শাড়ীর ওপর গায়ে মাথায় বুকে একটা ঘন আকাশী রঙের ওড়না আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়ানো। শুধু কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত অনাবৃত। ধীর শান্ত পায়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন। এমন ঢেকেঢুকে এলেন, অথচ কোথাও এতটুকু জড়তা আছে বলে মনে হল না। আমার নিজেরই কিছু বলা উচিত। কিন্তু বোকার মত দাঁড়িয়ে আছি দেখে তিনিই স্পষ্ট হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে চাই?

বললাম। তিনি স্বল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন

আমাকে। আমার দিক থেকে আর বাক্‌স্ফুরণ হল না দেখে বললেন, বস্থন, আমি খবর দিচ্ছি।

তেমনি শান্ত পায়ে প্রস্থান করলেন আবার। অনুমানে মনে হল ইনি গৃহস্বামিনী। শুধু মুখটুকু দেখে সঠিক বোঝা শক্ত। যৌবন যদি গিয়েও থাকে, যৌবনশ্রী প্রায় অটুট আছে। বারান্দায় একটা চেয়ারে বসলাম। কেন জানি ভদ্রলোককে ভাগ্যবান বলে মনে হল। মহিলার শান্ত ঋজু ভাবটুকুই বোধ করি মনে ছাপ ফেলে থাকবে। কিন্তু এমন কমনিয়তার ওপর এত বেশি আক্র চোখে কিরকম ধাক্কা দেয়। কান, এমন কি গলা পর্যন্ত ঢাকা। আবরণের আড়ালে থাকার প্রয়াসের থেকেও সরল নিষেধের ইঙ্গিতটাই যেন বেশি স্থস্পষ্ট ঠেকে। ভাবলাম, হয়ত এটাই আভিজাত্য।

মাধব চতুর্বেদী এলেন। নিজের অজ্ঞাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। প্রৌঢ় কিন্তু স্বাস্থ্যদৃপ্ত, সৌম্যদর্শন। পরনে ঢোলা-পাজামা আর পাঞ্জাবি। নমস্কার জানিয়ে পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে তাঁর হাতে দিলাম। আমায় বসতে আপ্যায়ন করে তিনি নিজেও বসলেন। চিঠি পড়ে সকৌতুকে তাকালেন আমার দিকে।

বেড়াতে এসেছেন?

পরিস্কার বাংলা শোনার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। ঘাড় নাড়লাম। পরে বলেই ফেললাম, আপনি তো স্থন্দর বাংলা বলেন দেখছি!

হাসলেন একটু। —একটু আধটু শিখেছি। রাজস্থানে, জয়পুর, উদয়পুর ছেড়ে ভরতপুরে বেড়াতে এলেন?

ওসব জায়গা ঘুরেই আসছি।

ও…এখানে কোথায় উঠেছেন?

বললাম, এই তো সবে আসছি, দেখে শুনে উঠব কোথাও, হোটেল আছে তো?

একটু যেন অপ্রস্তুত হলেন তিনি। জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার জিনিস কোথায় রেখে এলেন?

হেসে ঝোলাটা দেখিয়ে দিলাম, সব এতেই আছে, সাজ থেকে শয্যা।

ঈষৎ বিস্ময়ে তিনি একবার ঝোলাটা এবং একবার আমাকে নিরীক্ষণ করলেন। পরে বললেন, বাঙালীরা একটু বাবু মানুষ শুনেছিলাম, ভারী অন্যায় কথা। আপনি অনুগ্রহ করে এই বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলে সম্মানিত হব।

এ ধরনের সৌজন্যের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত। তাড়াতাড়ি বাধা দিলাম, সে কি কথা, আপনার নিশ্চয় অসুবিধা হবে। আমি বরং···

তিনি একখানা হাত তুলে নিরস্ত করলেন। বললেন, আমার নিশ্চয় কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। এত বড় বাড়িটিতে আমরা দুটি মাত্র প্রাণী থাকি। আপনি যে ক দিন খুশী এখানে থাকবেন। আপনার নিজের বাড়ি বলে মনে করবেন।

কি বলি ভেবে পাচ্ছিলাম না। তিনি একজন ভৃত্যকে আদেশ দিলেন মাইজীকে ডেকে দিতে। ক্ষণকাল পরে সেই মহিলাটিই এলেন আবার। শাড়ির ওপর তেমনি ওড়না আঁটা। আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম। তিনিও সবিনয়ে প্রত্যভিবাদন জানালেন। আমি ফিরে বসতে উনিও আসন নিলেন। মাধব চতুর্বেদী আমার পরিচয় জ্ঞাপন করলেন। এবারে অবশ্য হিন্দীতে।···বাঙালী লেখক, আমাদের হেমরাজের বন্ধু—এই হেমরাজের চিঠি—কলকাতা থেকে রাজস্থানে বেড়াতে এসেছেন। এখানে হোটেলের খোঁজ করছিলেন, আমি ওঁকে এখানেই থাকতে অনুরোধ করছি।

মহিলা জবাব দিলেন, আমরা চেষ্টা করব ওঁর কোন অসুবিধে যাতে না হয়, বা আতিথ্যে ত্রুটি না ঘটে।

চতুর্বেদী বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়।

মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, আমি এখুনি ওঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আর প্রাতরাশ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তিনি চলে গেলেন। ভারী বিব্রত বোধ করছিলাম। মহিলাটির মধ্যে একটা বিচিত্র রকম অভিব্যক্তি—যাকে বলে পারসন্যালিটি আছে

বটে। কিন্তু ওঁর ও-রকম ঠাণ্ডা ভাবটাও প্রায় অস্বস্তিকর। তাছাড়া, যাঁকে রীতিমত সুন্দরী বলে মনে হয় এবং ভালো করে দেখতে ইচ্ছে করে সে রকম একজন মহিলা আপনার সামনে বসে, অথচ তাঁর দুটি চোখ, নাক, ঠোঁট এবং চিবুকের একটুখানি অংশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, সেটাই বা কেমন লাগে? তারপরেও চেষ্টা করলে তাঁর ঐ আপদ মস্তক জড়ানো বসনই যেন আপনাকে চোখ রাঙাবে।

কিন্তু ঠিক কিনা জানিনে, আমার এও মনে হল মহিলাটিকে তাঁর স্বামীও রীতিমত সন্দেহ করেন। আমার পরিচয় দেওয়া, অথবা আতিথ্য গ্রহণের খবরটা দেবার সময়েও তাঁর মুখে একটু যেন বিনয় ভাব লক্ষ্য করেছি। মিসেস চতুর্বেদী ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতে তিনি দরাজ গলায় বললেন, বি অ্যাট হোম, স্যার। চান করবেন? না এই ঠাণ্ডায় আগে চান করে কাজ নেই, সহ্য হবে না। আমি রিটায়ার্ড ম্যান, এমনিতেই সময় কাটে না। তার ওপর আপনি লেখক শুনেছি, আর সহজে ছাড়ি? আপনাদের রবি ঠাকুবের কবিতা বোঝবার জন্যে আমি বাংলা শিখেছিলাম, জানেন? ·

জোরেই হেসে উঠলেন তিনি। এ রকম শুনলে কার না ভালো লাগে। বললাম, রবি ঠাকুরের কবিতা সব বুঝতে পারেন?

কই আর পারি! বাংলা শেখার জন্যে আমি অনেক টাকা খরচ করেছি কিন্তু অনুভূতিটা তো আর পয়সা দিয়ে কেনা যায় না! আপনাকে ধরে বেঁধে এবারে গোটা কতক লেখা বুঝে নেব।

খুব বিশ্বাস হল না। এরকম বাংলা যিনি বলেন, তিনি বাংলা লেখা ভাল বোঝেন বলেই আমার ধারণা।

প্রাতরাশ এলো। তারপর থাকবার ঘর দেখিয়ে দেওয়া হল আমাকে। সাজানো-গোছানো সুবিন্যস্ত ঘর। কোন কিছুরই অভাব নেই। দু'খানি কমল হাতের স্পর্শ সর্বত্র পরিস্ফুট। সেদিন কাটল। তার পরদিনও। সম-বয়স্ক হলেও ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গতা জন্মে গেল। চতুর্বেদী সেই ধরনের মানুষ যিনি সহজে সকল বয়সের সমবয়স্ক হতে পারেন।

মস্ত সুবিধে তাঁর গাড়ি আছে। সকালে-বিকালে সাগ্রহে নিজেই তিনি আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতে লাগলেন। এখানে পাহাড়ে বেড়াবার আকর্ষণটাই সব থেকে বড়। পাহাড়ের গা ধরে সরু এক একটা রাস্তার মত উঠে গেছে। ধারে ধারে বিশাল পাথর। সেখানে বসে গল্প-গুজব করা চলে, পিকনিক করা চলে, কিন্তু সেগুলির ধারে এসে নিচের দিকে তাকালে মাথাও ঘোরে।

গৃহস্বামী দেখলাম শুধু অতিথি পরায়ণ এবং সদাশয়ই নন্, বেশ গুণীও। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় কাব্য আলোচনায় বসে আলোচনায় এবং প্রশ্নে আমাকে প্রায় কোণঠাসা করে ফেললেন। বললাম, আপনাকে কবিতা বোঝাব কি, আপনার কাছে অনেক বাঙালী অনেক কিছু বুঝে নিতে পারেন।

তিনি সহাস্যে জবাব দিলেন, তোমার প্রশ্নটি দেখছি ভালো, এবারে আমার মুখ বন্ধ করলে। গতকাল থেকে উনি আমাকে তুমি বলছেন, আর সেটা আমার বেশ ভালোই লাগছে। তার পরদিন বিকেলে নির্জনে ওরকম একটা পাথরের ওপর দু'জনে বসে আছি। বললাম, মাধবজী, এবারে তো আমাকে যেতে হবে। কাল যাব ভাবছি।

কেন ভালো লাগছে না?

এর পরেও যার ভালো লাগবে না, সে নিতান্তই অমানুষ। যেতে মন সরে না।

তা হলে আর ক'টা দিন থেকে যাও না। বেড়াতে এসেছ যখন, একদিন যাবেই তো। আর হয়ত দেখাই হবে না।

কেন, আপনি কি ভরতপুর ছেড়ে নড়েন না?

তিনি ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, কই আর।

এই ক'টা দিনে আমার আর একটা অনুভূতি মনে জাগছে। এত হাসি-খুশীর মধ্যেও মানুষটি এক এক সময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন যেন। মেঘের ওপর যেমন রৌদ্র ওঠে, অনেকটা সেই রকম মনে হয় তখন তাঁকে। আজকের অন্যমনস্কতায় খানিকটা গাম্ভীর্যও আছে।

এ ক'দিনের মধ্যে মিসেস চতুর্বেদীর সঙ্গে আর চাক্ষুস-সাক্ষাৎও হয়নি। আড়াল থেকে তাঁর যত্নের আভাস পাই মাত্র। আর, সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে এক ঘুমোবার সময় ছাড়া ভদ্রলোকটিও প্রায় সারাক্ষণই আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। সে জন্যে নিজেই বেশি বিব্রত বোধ করতাম। ভদ্রমহিলা হয়তো বা অসন্তুষ্ট হচ্ছেন আমার ওপর। কিন্তু সব মিলিয়ে যে অনুভূতির কথা বলছি নিজের কাছেই সেটা সুস্পষ্ট নয় খুব।

চতুর্বেদী বললেন, এ দিকটায় একটু আধটু ডাকাতের উপদ্রব আছে বলে লোক চলাচল কম।

এমন শান্ত স্তব্ধ জায়গায় এ রকম সংবাদ কার ভালো লাগে। বললাম, তা হলে তো এ দিকটায় না এলেই হত ?

চতুর্বেদী হাসলেন।—ডাকাতরা জানে, আমিও খুব কম ডাকাত নই। আজ তবু দু'জন আছি, প্রায়ই তো একাই এসে বসি এখানে। ···অত ধারে যেও না, এ দিকটায় সরে এসো।

কেন পড়ে যেতে পারি ?

পড়ে যেতে পারো, ঠেলে ফেলেও দিতে পারি। হা হা করে হেসে উঠলেন তিনি।

হাসলাম আমিও।—শরীরখানা এ বয়সেও যা রেখেছেন, ঠেলে ফেলার কাজটুকু ধারে না বসলেও স্বচ্ছন্দে পারেন বোধ হয়।

তিনি জবাব দিলেন, এ বয়সের এ শরীরটা মিসেস চতুর্বেদীর হাত যশ, এর পিছনে আমার চেষ্টা নেই কিছু।

সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে নিচের দিকটা দেখলাম একবার। বললাম, একটা সুবিধে আছে, নিচে ওই পাথরের ওপর দিয়ে পড়লে প্রাণ বেরুতে একে মুহূর্তও সময় লাগবে না, সঙ্গে সঙ্গেই হাড় গুঁড়িয়ে আর মাথার খুলি চৌচির হয়ে সব শেষ।

চতুর্বেদী আস্তে আস্তে বললেন, সে রকম দৃশ্য এখানকার লোকে একবার দেখেছে।

অবাক বিস্ময়ে তাকালাম তাঁর দিকে। তিনি বললেন, প্রায় পঁচিশ

বছর আগেকার কথা, ঠিক ওই জায়গায় এখানকার একজন মস্ত আর্টিস্টকে ওরকম তাল গোল পাকানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

মনে মনে শিউরে উঠলাম। আমার জিজ্ঞাসু চোখে চোখ রেখে কি ভাবলেন তিনিই জানেন।—আচ্ছা, পরে এক সময় বলব'খন গল্পটা।

এখনই বলুন না?

না, এখন ভালো লাগছে না।

তারপর দু'দিন কেটে গেল। আর্টিস্টের প্রসঙ্গটা তিনিও আর উত্থাপন করলেন না, আমিও ভুলে গেলাম। যাবার আগের দিন রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে এঁদের কথা ভাবছিলাম। বিশেষ করে অদৃশ্য-বর্তিনীর কথা।

পরদিন সন্ধ্যায় গাড়ি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে প্রতিদিনের মত সেদিনও মাধবজী আমার কাছে বসে পাইপ ধরালেন। হঠাৎ আর্টিস্টের কথাটা মনে পড়ে গেল। বললাম, সেই গল্পটা তো শোনা হল না মাধবজী?

পাইপ টানতে টানতে তিনি বার কতক আড় চোখে নিরীক্ষণ করলেন আমাকে। পরে আমার দিকে ফিরে হাসিমুখে বললেন, গল্প পরে হবে, বিয়ে তো করোনি শুনেছি, কিন্তু কোন মেয়েকে ভালো বেসেছ কখনো?

এরকম একটা বেখাপ্পা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তবুও অম্লান বদনে বললাম, এন্তার—।

সে কি হে!

দেখতে ভালো হলে ভালোবেসে ফেলি।

দরাজ গলায় হাসলেন তিনি। তারপর সহসা হাসি থামিয়ে প্রশ্ন করে বসলেন, আমার স্ত্রীটিকে কেমন দেখলে?

আচ্ছা বিপদ! ভালো বললে নিজের কলে নিজে আটকাবো। হেসেই দিলাম, তাঁকে আর দেখলাম কোথায়? আপদ-মস্তক তো ঢাকা।

মৃদু হাসতে লাগলেন মাধবজী। বললেন, ইউ আর এ ক্লেভার

বয়। একটু থেমে, অনেকটা যেন আপন মনেই বললেন, একদিন ছিল জানো, যখন আমাদের মেয়েরা ইচ্ছা করে পর পুরুষের মুখ দেখলেও কলঙ্ক লাগত।

সে কী! আপনাদের মেয়েরা তো ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে যেতেন।

দরকার হলে যেত। অন্য সময়ে দেহে অন্য কারো কামনার আঁচ লাগতেও দিত না। আজকের দিনে অবশ্য এ নিয়ম আর নেই, থাকা উচিতও নয়।

কিন্তু আপনার ঘরেই তো এ নিয়ম মানছেন একজন।

তিনি অন্যমনস্কের মত চেয়ে রইলেন আমার দিকে। হঠাৎ মনে হল, ওই বিস্মৃতি বিলগ্ন ঘনায়ত চোখ দুটিতে যেন একটা ব্যথাতুর ভাব রয়েছে।

একটু বাদে বললেন, আর্টিস্টের গল্প শুনবে না? এসো।

গল্প শুনতে হলে আবার যেতে হবে কোথায় বুঝলাম না। তিনি আবারও আহ্বান করলেন, এসোই না।

অনুসরণ করলাম। ভিতরে আর কোনো দিন যাইনি। এদিকটা দেখলাম একটা আলাদা মহলের মত। একটা দরজা খুলে দিতে প্রকাণ্ড এক হলের মধ্যে এসে পড়লাম। দেয়ালের গায়ে গায়ে প্রকাণ্ড প্রমাণ আয়তনের তৈল চিত্র-সম্ভার। নারী-মূর্তি সব। হাস্যে লাস্যে যৌবন স্বরূপিনী নগ্ন নারী-মূর্তি। কারো দেহে এতটুকু আবরণ নেই।

মাধবজী বললেন, ভালো করে দেখ, লজ্জা কি···।

কিন্তু তবু লজ্জা পাচ্ছি। ইচ্ছে থাকলেও লজ্জা পাচ্ছি। এরই মধ্যে একটি নারী বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তাঁর তিন-চারখানি বিভিন্ন আলেখ্য টাঙানো। কানের কাছটা গরম ঠেকছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এঁরা সবাই কি এদেশেরই মেয়ে?

সবাই।

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শেষ প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ালাম। মাধবজী সামনের দেয়াল জোড়া তৈল চিত্রটি ইঙ্গিত করে বললেন, দেখো।

এবার নিষ্পলক চোখে স্তব্ধ অভিভুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

সম্পূর্ণ নগ্ন দুটি নারী-পুরুষ, কিন্তু বহুক্ষণ চেয়ে থাকলেও এতটুকু গ্লানি স্পর্শ করবে না। সহজ সরল শুচিতার প্রতিমূর্তি। লজ্জা, ভয়, গ্লানি-বিরহিত প্রথম নারী প্রথম পুরুষ। পুরুষটির হাতে জ্ঞান বৃক্ষের ফল। চোখে মুখে বিবেক এবং সংশয়ের অবিমিশ্র দ্বন্দ্ব। তার নগ্ন জানুতে দু'হাতে ভর করে মাটির ওপর বসে মুখের দিকে চেয়ে আছে প্রথম নারী। মুখে আশা আকাঙ্খার অনাবিল প্রতীক্ষা।

আশ মিটিয়ে দেখতে লাগলাম। তবু দেখে আশ মেটে না। ওই নারী মূর্তিটি কি আমি কোথাও দেখেছি? নাকি সকল পুরুষেরই মনের তলায় ওরকম একটি মূর্তি বিরাজ করছে, যাকে দেখলে মনে হয় বুঝি চিনি?

মাধবজী বললেন, এই ছবিখানা দেখাবার জন্যেই তোমাকে এখানে এনেছি। আচ্ছা, এবার এসো।

তাকে অনুসরণ করে ঘরে ফিরে এলাম। ফেরার সময় আর অন্য ছবিগুলোর দিকে তাকাতেও মন সরলো না। মাধবজী আবার আরাম কেদারায় শরীর ছেড়ে দিয়ে পাইপ ধরালেন। তারপর ধীরে ধীরে যে কাহিনীটি ব্যক্ত করলেন তিনি, শুনতে শুনতে আমার স্থান কাল ভুল হয়ে গেল।

* * *

প্রায় পঁচিশ বছর আগে। ভরতপুরের হাওয়ায় নারী প্রগতি দানা বেধে উঠছিল যাঁর জন্যে, তিনি এখানকার ডেপুটি পুলিশ সুপারের স্ত্রী কমলা দেবী। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোটাও যখন এদেশে ভালো করে চালু হয়নি, তখন স্বামীর সঙ্গে তিনি বিলেত ঘুরে এসেছেন। অনেক আব্রু, অনেক সংস্কার, অনেক ভ্রূকুটি সহজ অবহেলায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বনেদি ঘরের মেয়ে, বনেদি ঘরের বউ। মনের জোর আছে, তার চেয়েও বেশি রূপের। অনেক কিছুই সহজ ছিল তাঁর পক্ষে। মেয়েদের নিয়েই একটা ক্লাব করেছিলেন প্রথম। কিন্তু তার আনাচে-কানাচে ছেলেদের আনাগোনা উঁকি-ঝুঁকি দেখে সকলকে অবাক করে দিয়ে একদিন তিনি ঘোষণা করলেন, ছেলেরাও

ইচ্ছে করলে ক্লাবে এসে যোগ দিতে পারেন। তাঁর অনুগত স্বামী পর্যন্ত প্রথম প্রথম এটা খুব সহজ ভাবে নিতে পারেন নি। কমলা দেবী তর্ক করেন নি, হেসে বলেছেন, দেখই না সব রসাতলে যায় কিনা। মোট কথা অভিজাত মহলে ছেলে-মেয়েদের সহজ মেলা মেশায় তখন বেশ একটা রোমান্টিক হাওয়া বইছে।

সেই সময়ে এই শিল্পীটিকে আবিষ্কার করলেন তাঁরা, অবশ্য শিল্পী বলে জানতেন না। নির্জন পাহাড়ে বেড়ানোটা তখন খুব বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু ডেপুটি পুলিশ সুপার যাদের সাথী, স্বয়ং পুলিশ সুপারও যাঁদের অন্তরঙ্গ সঙ্গী, তাঁদের আর ভয়টা কিসের? একদিন যে পাহাড়টিতে মাধবজী এবং আমি গিয়ে বসেছিলাম, পঁচিশ বৎসর আগে সদলবলে সেখানে অভিযানে এসে তাঁরা দেখেন, লোকটি সেই নির্জন পাথরটিতে আকাশের দিকে চেয়ে একা শুয়ে আছেন। পাশে তাঁর ক্যামেরা।

এঁরা যেমন অবাক, লোকটিও তেমনি নারী-পুরুষের বাহিনীটি দেখে হকচকিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি একাই জয় করলেন এঁদের সকলকে। এমন সরল শিশু সুলভ মূর্তি বড় একটা দেখা যায় না। জলে ভেজা দু'টি ডাগর চোখ, শিশিরস্নাত মুখ, ঝাঁকড়া চুলে প্রায় বন্য সরলতা, সমগ্র কমনীয়তায় ভোরবেলাকার রূপের সঙ্গে কোথায় যেন মিল।

পুলিশ সুপারই প্রথম জেরা শুরু করলেন, তুমি কে?

আমি? আমি ডুগার—শোভন ডুগার।

এখানে কি করছ?

আকাশ দেখছি।

মেয়েরা কলস্বরে হেসে উঠলেন। কোথায় থাকেন, কি করেন ইত্যাদি জেনে নেবার পর তাঁকে বলা হল, এভাবে একা এখানে এসে যে আকাশ দেখা হচ্ছে, ডাকাতের খপ্পরে পড়লে?

তিনি চিন্তিত মুখে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন, ক্যামেরাটা—তাহলে যেত বোধ হয়…।

মেয়েদের সঙ্গে পুরুষরাও হেসে ফেললেন এবার। ফিরতি পথে সঙ্গী একজন বাড়ল। তার আগে শোভন ডুগার অনেকগুলো ছবি তুললেন সকলের।

এই ছবি তোলার ঝোঁক কত সেটা পরে ক্রমশঃ বোঝা গেল। কিন্তু ঝোঁকটা শুধু মেয়েদের ছবি তোলার প্রতিই। ছ'মাস না যেতে তিনি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন সকলেরই। মেয়েরা প্রথম প্রথম ছবি তুলতে দিতে হয়তো বা একটু-আধটু আপত্তি করতেন। কিন্তু তাঁদের নেত্রীই হাল ছেড়ে দিলেন একদিন।—নাও বাপু, এই বসলাম, যেমন করে খুশী যতক্ষণ খুশী ছবি তোলো। এরপর সঙ্গিনীদের আর বাধা থাকল না।

যেমন করে খুশী এবং যতক্ষণ ছবি তুলেও কিন্তু খুশী হতেন না ডুগার। বলতেন, তোমরা মেয়েরা কেউ সহজ 'পোজ্' দিতে জানো না ; সকলেরই চোখে মুখে কৃত্রিমতা। মেয়েরা চটতেন, কিন্তু ভালও বাসতেন ওঁকে।

তারপর একদিন দেখা গেল শোভন ডুগার ডুব মেরেছেন। মেয়েরা চিন্তিত হলেন। এবার সত্যিই কোনো ডাকাত তাঁকে খতম করে দিল কিনা কে জানে! কমলা দেবী উদ্বিগ্ন চিত্তে স্বামীকে তাগিদ দিতে লাগলেন, কোন বিপদ ঘটল কিনা অনুসন্ধান করতে।

শেষ পর্যন্ত তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল। তখনই শুধু জানা গেল আসলে উনি চিত্রশিল্পী। কিন্তু তাঁর শিল্পচর্চার বিষয়বস্তু শুনে ঝড়ের আগের স্তব্ধতার মত সবাই স্তব্ধ। শিল্পীর চতুর্দিকে মেয়েদের ফটো-গুলো ছড়ানো, তারই থেকে তুলি আর রঙে এক একটা নগ্নমূর্তির আবির্ভাব ঘটেছে। ফোটোর থেকে শুধু মুখ এবং অভিব্যক্তিটুকু তুলে নিচ্ছেন, বাকিটা কল্পনা। পুরুষদের অনেকেই এসে জোর করে ষ্টুডিওতে এসে ঢুকলেন, নিজের চোখে সত্য-মিথ্যা যাচাই করে গেলেন।

মেয়েরা একেবারে বোবা। এমন দেখতে অথচ শয়তানি! পুরুষদের বুকে আগুন জ্বলল। বড় বড় অভিজাত ঘরের মেয়েরা সংশ্লিষ্ট, কাজেই আইন-আদালত না করে নিজেরাই তাঁর বিচারের

পরামর্শ করলেন। সাদা-সিধে বিচার। মর্যাদা বা আত্মসম্মানের হানি ঘটলে এদেশের লোক নির্মম বিদায় দেওয়াটাই সাব্যস্ত করে।

স্বামীর মুখ থেকে কমলা দেবী শুনলেন সব। সকলের অজ্ঞাতে তিনি ষ্টুডিওতে এলেন। সাক্ষাৎ হল শোভন ডুগারের সঙ্গে। দেখলেন তাঁর শিল্পচর্চা। ডুগার চুপচাপ বসে আছেন। তিনি কাছে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন নিরীক্ষণ করে।

এইভাবে জীবনটা হারাতে বসলে?

ডুগার বললেন, জীবন যেতে পারে জানতাম, কিন্তু কাজটা হল না, এই দুঃখ।

কি কাজ?

যে কাজের মধ্যে বরাবর বেঁচে থাকতে পারতাম, সে রকম একখানা ছবি।

কমলা দেবী জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

ডুগার বললেন, দুটি নারী-পুরুষের মূর্তি আঁকব ভেবেছিলাম, যাদের মধ্যে পাপ ঢোকেনি। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক দুটি নারী-পুরুষ। কিন্তু দেখ, তোমাদের মুখ আমি অবিকৃত রেখেছি। অথচ নগ্ন প্রতিকৃতি কি বিষম নগ্ন।

কমলা দেবী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, নারীমূর্তি পেলে না, কিন্তু তেমন পুরুষমূর্তি পেয়েছ?

তোমাদের চোখ থাকলে সে মূর্তি দেখতে পেতে।

কিন্তু সত্যি চোখ আছে কমলা দেবীর। দেখেছেনও। শুধু খেয়াল করেন নি। আজ খেয়াল করলেন, আর দেখলেন। ধীর শান্ত দুই চোখ মেলে শুধু দেখলেনই।

এরপর কোথা দিয়ে কি হল কেউ হদিস পেল না। এমন কি কমলা দেবীর স্বামীও না। দেখা গেল, সশস্ত্র দুটি সৈনিক পুরুষ অষ্টপ্রহর ডুগারের ষ্টুডিও পাহারা দিচ্ছে। পুলিশ সুপার ছিলেন কমলা দেবীর একান্ত গুণমুগ্ধ—ব্যবস্থাটা তারই। কিন্তু, ডেপুটি পুলিশ সুপার অর্থাৎ কমলা দেবীর স্বামীর কাছেও তিনি কারণ প্রকাশ

করলেন না। শুধু বললেন, লোকটা এক ধরনের রোগগ্রস্ত, কি হবে তাকে হত্যা করে?

ক্রমশ অন্য সকলেরও উত্তাপ কমে এলো। শেষ পর্যন্ত বিকার-গ্রস্ত বলেই ধরে নিলেন তাঁকে। শুধু ভদ্রসমাজে আর মিশতে না এলেই হল। সমাজে আর মিশতে এলেনও না শোভন ডুগার। পুলিশ সুপার পাহারা তুলে নিলেন।

কিন্তু কমলা দেবীর মধ্যে কি যেন একটা পরিবর্তন এলো। তাঁর স্বামী এবং সঙ্গী-সঙ্গিনীরাও অনুভব করলেন যেটা। অনেকটা যেন স্থির হয়ে আসছেন। নিয়মিত ক্লাবে আসেন না, নিয়মিত বাড়িতেও থাকেন না।

ছ'মাস পরের কথা। শোভন ডুগারকে সবাই ভুলেছে। হঠাৎ একদিন রাষ্ট্র হল, জয়পুরে অতবড় ছবির এগ্‌জিবিশানে প্রথম হয়েছে শোভন ডুগারের একখানা ছবি, সে ছবির নাকি তুলনা নেই। দেশী-বিদেশী শিল্প—গুণভাজনরা বহু হাজার টাকা দাম দিতে চাইলেন ছবি খানার, কিন্তু শিল্পী সেটা বিক্রী করতে অসম্মত।

এখানে আবার একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল। সেটা আরো বাড়ল ছবিখানা এখানে ফিরে আসার পর। দলে দলে লোক আসতে লাগলো দেখতে। প্রথম মানব এবং প্রথম মানবী মূর্তি! নগ্ন, কিন্তু অপরূপ! এই মানব-মানবীকে এখান কার লোক চেনে। তবু অভিভূত হল, মুগ্ধ হল। রাগতে হল না। সেদিন যেন সবাই নতুন করে উপলব্ধি করল, কেন মানুষটা মেয়েদের ফটো তোলার জন্য এতখানি ব্যগ্রতা প্রকাশ করত। মনে মনে ভাবল, পাগল শিল্পীর কল্পনা সম্ভারের তুলনা নেই।

মুগ্ধ হলেন না, অভিভূত হলেন শুধু একজন। তিনি কমলা দেবীর স্বামী। ডেপুটি পুলিশসুপার। শুধু তিনি দেখলেন, শুধু তিনি জানলেন, কোনো ফোটোগ্রাফ থেকে রূপায়িত হয়নি ওই নারী মূর্তি।

এই পর্যন্ত বলে মাধব চতুর্বেদী থামলেন। আমি নিস্পন্দের মত

বসে আছি। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কি করলেন ডেপুটি পুলিশসুপার?

—ডেপুটি পুলিশসুপার শিল্পীকে একদিন কাঁচ পোকার মত টেনে নিয়ে এলেন সেই পাহাড়ের ওপর সেখানে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, যেখানে তুমি—আমি গিয়ে বসে ছিলাম। শিল্পী সত্য গোপন করলেন না।

তারপর? রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রশ্ন করি।

তারপর নির্মম পশুর মত তিনি দু'হাতে তাঁকে শূন্যে তুলে নিঃসীম অতল কঠিনের বুকে নিক্ষেপ করলেন।

বসে আছি।···বসেই আছি।

মাধবজী এক সময় উঠে গেলেন। বাইরের আলো এক সময় আবছা হয়ে আসতে লাগল। একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে আমিও উঠলাম। জিনিসপত্রগুলো সব ঝোলার মধ্যে গুছিয়ে প্রস্তুত হলাম।

মাধবজী এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, রেডি?

হ্যাঁ।

চলো, স্টেশনে তুলে দিয়ে আসি।

তার সঙ্গে বাইরে এসে থাকলাম। দ্বিধান্বিত ভাবে বললাম, মিসেস্ চতুর্বেদীর সঙ্গে একবার দেখা করে যাব না?

এক মুহূর্ত থেমে তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ওই ওঘরে আছেন, দেখা করে এসো, আমি গাড়িটা বার করি।

তিনি চলে গেলেন। আমি বিপদ গ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে রইলাম অল্পক্ষণ। পরে পায়ে পায়ে ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। চুপচাপ বসেছিলেন মিসেস্ চতুর্বেদী। আমায় দেখে সচকিত আলনা থেকে ওড়নাটা টেনে নিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে আর আবৃত করলেন না। ওটা হাতেই রইল। আমি কিছু একটা আভাস পাচ্ছি কিনা সঠিক বুঝছি না। পঁচিশটা বছর বাদ দিয়ে দেখা এক মুহূর্তে সহজ নয়। তা ছাড়া বাইরের আলোটা আরও কমেছে। নিঃশব্দে তাঁকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে ফিরে এলাম।

মাধবজী গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁর কাছে এসে বলেই ফেললাম, একটা অনুরোধ মাধবজী, ওই ছবিখানা যাবার আগে আর একবার দেখাবেন ?

মাধবজী গাড়ির দরজা খুলে দিলেন। বললেন, না, তোমার সময় হয়ে গেছে, ওঠো—।



কিন্নর রায়

আদম নয় ইভও নয়

রাজা-মহারাজার মতোই ডান হাতের কনুই ভুঁয়ে ঠেকিয়ে বোসে ছিলো বাওয়াল।

রাত এখনও ঘন হয়নি। সামনে অল্প দূরে এবড়ো-খেবড়ো পাঁচ রাস্তার ওপর দিয়ে একটা-দুটো সাইকেল রিক্সা হুট-পটাং শব্দ করে হর্ণ বাজিয়ে চলে যাচ্ছে। দু-একজন অফিস, কলকাতা ফেরত মানুষ বালী স্টেশনে নেমে এ রাস্তা পেরিয়ে পদ্মবাবু রোডের দিকে চলে যায়। পেছনে রেল লাইনের ওপর দিয়ে গুমগুমিয়ে যায় ট্রেন, আপ এবং ডাউন লাইনে। এভাবেই শুধু যাওয়া আর আসা।

আকাশের চাঁদ ঘামে। জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ে।

জষ্ঠির মাঝামাঝি এখনও ফিকে গরম। দু-চারদিন বৃষ্টি হোলে গরম আরও কমবে। পাঁচ রাস্তার ওপারে কোণের পাকা দোতলা বাড়ির বাগান থেকে বেলফুল আর গন্ধরাজের সুঘ্রাণ ভাসে।

উল্টোবাগে হাওয়া বইলে হাত পনের দূরের মেথর পাড়া থেকে জমা ছাই, বিষ্ঠা, শূয়োরের ময়লা, কাঁচা নর্দমার পাঁক—সব মিলিয়ে একটা গা ঘিন-ঘিনে গন্ধ নাকে ঢুকে পড়ে। গা কেমন করে। চাঁদের ঘাম চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে পাঁচ রাস্তার ওপারে তরুণ সংঘ মাঠের ঘাসে, বারপোস্টে। আরও পেছনে নবীন সংঘের মাঠ, গাঙ্গুলী পাড়া যাবার রাস্তা, ধোপাদের টালি ছাওয়া ইটের ঘর, এক আধটা দাঁড়িয়ে থাকা রিক্সা চাঁদের স্বেদবিন্দুতে সিক্ত হয়।

বাওয়াল বোসেই থাকে। ওর চোখে তাড়ির নেশা জল কাটায়। ফুরফুরে হাল্কা মনে হয় চারপাশটা। সব কিছু। চিন্তা-ভাবনা কিছুটা ফিকে হয়। খোচড়-হামলা, মামলা, মালমুদ্দার হিস্যা—সব কিছুই বেশ নরম হয়ে আসে। ওর সামনে রুমালে ঢাকা তাড়ির

মাঝারি কলসি আস্তে আস্তে খালি হয়। পুঁচকে কাঁচের গেলাসে থেকে যায় কিছু তলানি। এক গাছের তাড়ি গরমকালে নিয়ম করে খেলে নাকি পেট ঠাণ্ডা থাকে, শরীর ভালো হয়, চুল ওঠে না। বছর দশ-বারো আগে শোনা এ কথাটা পঁচিশ পেরুনো একটু টিপসি বাওয়ালের পেটের মধ্যে হাসির বুড়বুড়ি তোলে।

বাওয়ালের পাশে বসা নগা তাড়ি ঢালে ওই একই গেলাসে। চুমুক দেয়। ঠোঙায় রাখা কয়েকটা মৌরলা মাছ ভাজা মুখে ফেলে। এ ব্যাপারে মুখের এঁটোর বালাই নেই। চৈতন শুয়ে পড়ে মাটির ওপর, ফুরফুরে হাওয়া ওর নেশায় ফিনিক কাটে।

একটু ঝিম ধরলে মহম্মদ রফির গান দারুণ গায় বাওয়াল। হঠাৎই ও শুরু করে—সুহানি রাত ঢল চুকি/না জানে তুম কব আওগে........। আস্তে আস্তে খালি পেটে নগা। কিছুক্ষণ পরেই বলে, গুরু চিনির কাজটা কিন্তু মন্দ হলো না। বাওয়ালের গান থামে। দৃষ্টি স্থির হয়। থতমত খেয়ে নগা প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায়।

আবছা জোছনায় তরুণ সংঘ মাঠ, পাঁচ রাস্তা ভেঙে ভেঙে আসে কিশোরীয়া। বাওয়ালের মনে হয় যেন কেউ মেঘ মাড়িয়ে আসছে। সামনে এসে ওর হাতে কলাইয়ের বাটি ঢাকা কাগজটা ফেলে বাটিটা বাওয়ালের সামনে মেলে ধরে কিশোরীয়া। বাল, খা।

ভুঁই থেকে কনুই তুলে সোজা হয় বাওয়াল। তারপর বাটির মধ্যে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী-মধ্যমা ডুবিয়ে ঘন ঝোলের ভেতর থেকে কিছু তোলে। মুখে দিয়ে বোঝে শোল মাছের ঝাল। বড্ড ভালো রাঁধে কিশোরীয়া। নগা, চৈতনও ঝালে ভাগ বসায়।

কিশোরীয়া বাওয়ালের বয়েসী। দাড়ি-গোঁফ কামানো ভাঙা মুখ। মাথার লম্বা বাবড়ি চুল চুড়ো পাকিয়ে বাঁধা। হাত-পা সরু সরু মেয়েলি মেয়েলি। গলার স্বর কেমন যেন হিজড়ে-মার্কা। কিশোরীয়া দারুণ সুন্দর খোঁপা বাঁধতে পারে, ভালো রাঁধতে জানে আসন সেলাই, সোয়েটার বোনা ওর কাছে মেয়েদের মতোই জলভাত

কিশোরীয়া বিড়ি চায় বাওয়ালের কাছে। লুঙ্গীর কষি থেকে বিড়ি বের করে দেয় বাওয়াল, দেশলাই দেয়। তারপর ওর হাত ধরে আলতো টান দিয়ে কাছে টেনে এনে বলে, পাগলি, নাচবি! নাচ না। মেয়েদের মতো কপালের ওপরের কুচো চুল ডান হাতে সরিয়ে দিতে দিতে ঘাড় ঝাঁকিয়ে কিশোরীয়া বলে, বাঃ বেতমিজ। একটু দূরে সরে যায়।

বাওয়াল শিকারী চিতার মতো লাফিয়ে আসে। ওর কোমর জড়িয়ে ধরে বলে, চুমু দেবো শালি। নাচ।

মাটি থেকে উঠে পড়ে চেতন। নগা হৈ-হৈ করে হাততালি দেয়, জিভের তলায় ডান হাতের মধ্যমা ও বুড়ো আঙুল পুরে হুই-হুই সিটি দিয়ে ওঠে। তারপর বলে, লিঃ।

কিশোরীয়া লাজুক ভঙ্গী নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপরে ঘুরে-ফিরে হাত নেড়ে হিজড়ে-নাচ নাচে। ফাটা বাঁশের মতো বেসুরো গলায় গায়,—সারা রাতি জ্বালিয়ে বাতি/বসে ছিলুম গো/আর আসবি বলে, বোলে কেন না এলি গো।

গানের ধুয়ো ঘোরে-ফেরো। ওরা তিন মাতাল এই চিৎকারে গলা মেলায়। তাড়ির হাঁড়ি খালি হয় নিমেষে। খালি হাঁড়িতে তাল দেয় চৈতন।

বাওয়ালের মনে পড়ে হোলির এক মাস আগে থেকে নাচ-গানের কথা। কিশোরীয়ার তখন আরও কম বয়েস। গাল ভাঙেনি। চোখের কোলে কালি ছিলো না। গোলাপি শাড়ি, ব্লাউজ পরে ঠোঁটে রং, গালে পাউডার মেখে, চোখে কাজল টেনে মেহেদী আঁকা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে কিশোরীয়া ঢঙ করে নাচত, গাইত,—পান খায় সাঁইয়া হামারো । গানের গলা ভালো না হলেও ঢঙে চোখে রঙ লাগত বাওয়ালের। কাজ করা নতুন পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে ভিড় ঠেলে সামনে যেতে ইচ্ছে হতো।

ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে কিশোরীয়া। খেলার মাঠ, রাস্তা পেরিয়ে এই মাঠে এসে দাঁড়ায়। কলাইকরা বাটি কুড়িয়ে নেয়।

কি ভাবে খানিক। তারপর আস্তে আস্তে বাওয়ালকে ঠেলা দিতে দিতে বলে, এই ঘরে যা। ঘরে গিয়ে শো। খোচড়-বিলা হলে রাতে এভাবে পড়ে থাকতে দেখলেই তুলে নিয়ে যাবে।

মোতির সঙ্গে আবছা অন্ধকারে গুজগুজ করে বাওয়াল। ঝুটো পাথরের নাকছাবি নাকে মোতি হাতমুখ নেড়ে কত কি বলে বাওয়ালকে। বিহার থেকে দু-দুটো স্বামী তাড়িয়ে এখানে চাচার কাছে মাসখানেক হলো এসেছে মোতি। ধোবির কাজকাম করে যদি কিছু পয়সা পাওয়া যায়। বাপ মরে যাবার পর বসিয়ে বসিয়ে কে খাওয়াবে! দূর করে দিয়েছে ভাইয়েরাও।

বাওয়াল এখন প্রায় রোজই সন্ধ্যে হলে গুজগুজ ফুসফুস করে মোতির সঙ্গে। চাচেরা খুড়তুতো বোনের ওপর ভীষণ রাগ হয় কিশোরীয়ার। গাল পাড়ে—রাণ্ডী, এখানে এসেও ছেলে ফাঁসানোর রোগ গেলো না।

কিশোরীয়ার গলার ওপর তিনগুণ গলা তুলে চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করে মোতি, তোর কি রে হিজড়া কাঁহিকা। মরদরা আমার পেছনে ঘোরে। তাদের কি কোরে ভেড়া বকরা বানিয়ে রাখতে হয় আমি জানি। তুই তোর নিজের কাজে মন দে।

একদিন সকালে বাওয়ালকে চুপি চুপি বলে কিশোরীয়া, বাওয়াল, মোতি আমার চাচেরা বহিন হলে কি হবে। ও শালি আস্‌লি চুড়েল পেত্নী। মরদ দেখলেই ওর ভুখ লাগে। তুই মারা যাবি দোস্ত। আমার কথা শোন, রাণ্ডীটাকে তুই ... ।

কিশোরীয়ার কথা ফুরোয় না। ওর ঝুলনো হাত নিজের পিঠ থেকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বাওয়াল বলে—যা, আপনা রোটি সেঁক। এ ব্যাপারে টাঙ পা বাড়াস না। মেয়েমানুষ নাচাতে আমি জানি। তোর মতো মোগা নাকি আমি!

জষ্টিতেও কিশোরীয়ার চোখে পৌষের কুয়াশা ঘনায়। এক অদ্ভুত কষ্ট ওর বুক থেকে দলা পাকিয়ে গলার কাছে উঠে আটকে যায়।

নিজেকে এখনই ওর মনে হয় কোন নারী। যার চোখের জল ফেলা ছাড়া কিছুই করার নেই।

মোতিকে নিয়ে রিক্সা করে নাইট শো-এ সিনেমা দেখে ফেরে বাওয়াল। কিশোরীয়া অন্ধকারে তরুণ সংঘ মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। আজকাল আর নাচগানের মহোৎফল বসে না। মোতির হাসিতে কাঁচের বাসন ভাঙে। বাওয়ালও কি যেন কি বলে।

কিশোরীয়ার সহ্য হয় না। মাঠ পেরিয়ে পীচ রাস্তা ভেঙেও ছুটে যায় রিক্সার কাছে। চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসে মোতিকে। এলোপাথাড়ি কিল চড় ঘুষি চালায়, সঙ্গে অশ্রাব্য গালা-গালির ফোয়ারা ছোটে।

মোতিও কম যায় না। পাল্টা হামলা চালায় কিশোরীয়ার ওপর। আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেবার চেষ্টা করে। গালাগালি দিয়ে ভুষ্টি নাশ করে কিশোরীয়ার।

একটু থমকে গিয়েই বাঘাটে গলায় চিৎকার করে বাওয়াল কিশোরীয়া, ছেড়ে দে।

এ লড়াই থামে না। মোতি-কিশোরীয়া জাপ্টাজাপ্টি করতে করতে পীচ রাস্তার ওপর গড়িয়ে পড়ে। কিশোরীয়ার জামা ছেঁড়ার শব্দ হয়—ফ্যাঁস।

জামার কলার ধরে কিশোরীয়াকে টেনে তোলে বাওয়াল। ওর মুখে বদাম বদাম করে তুটো ঘুষি মারে। টাল-মাটাল পায়ে পাক খেয়ে রাস্তার ওপর চিত হয়ে পড়ে কিশোরীয়া। ওর ঠোঁটের পাশ দিয়ে চুঁইয়ে পড়া রক্তের সঙ্গে বাওয়ালের চোখের রঙ এক হয়ে যায়।

নাকের পাটা ফুলে ওঠে বাওয়ালের। কিশোরীয়ার বুকের ওপর ডান পা তুলে দিয়ে দাঁড়ায়। বলে, শালা, একদম কাঁচা খেয়ে ফেলবো। ফের যদি মোতির ব্যাপারে তুই টাঙ বাড়াস, বহুত বুরা হাল হবে।

মোতি বুকের কাপড় সামলে উঠে শাড়ির ধুলো ঝাড়ে। হাত দিয়ে চুল ঠিক কোরে নেয়। মাটিতে পড়ে থাকা কিশোরীয়ার মুখে পিচকেটে

এক ধ্যাবড়া থুতু ফেলে বলে, হিজড়াটার মরণ হয় না। তারপর বাওয়ালের হাত ধরে টান দেয়।

অনেকক্ষণ রাস্তার ওপর আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকে কিশোরীয়া। অসহ্য যন্ত্রণা সারা দেহে, মনে। সত্যি সত্যি বৃহন্নলা না হোয়েও নিজেকে তার তাই মনে হয়।

সেকেণ্ড অফিসার দাসবাবুর কথাটা কানে ভেসে আসে, লাইনের খবর-টবর ..। টিফিন বাজারে চিনির ব্যাপারটা বোলে দেবো নাকি। কে কে ছিলো, কে আর্মস দিয়েছে, চিনি বিক্রীর সব টাকা কার কার কাছে ..।

কি ভেবে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় কিশোরীয়া।

বাওয়াল কোন কথা না বোলে নীট বাংলা মদ খেয়ে যাচ্ছে। খবরটা পাওয়ার পর থেকেই আগুন জ্বলেছে মাথায়। কোমর থেকে রিভলবার বার কোরে একবার ঘাসের ওপর রাখলো। তারপর আবার গুঁজলো কোমরে।

রাত ঘন হচ্ছে ক্রমেই। রাস্তায় কমে আসছে মানুষজন। চৈতন এলো পা টিপে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘোলাটে চোখ তুলে তাকায় বাওয়াল।

চৈতন ঘাড় নাড়ে, না ? কোন খবরই নেই।

গেলাসের আধ খাওয়া মাল পুরোপুরি গলায় ঢেলে বাওয়াল বললো, যেভাবেই হোক আমার খবর চাই। ও সব নও দো এগারো শুনতে চাই না আমি। নগা কোথায় পালাতে পারে মোতিকে নিয়ে ?

চৈতন আবার উল্টো বাগে হাঁটা দিলো।

চুপচাপ মদ খেয়ে যায় বাওয়াল। মোতিকে নিয়ে পালানোর জন্য সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ে নগার ওপর। দোস্ত ইয়ার হোয়ে এরকম গদ্দারি (বেইমান)। মোতির ওপর ভুলেও এতটুকুন রাগ হয় না বাওয়ালের ! ভালোবাসা বোধ হয় মানুষকে এরকমই মোহান্ধ কোরে তোলে।

পা টিপে টিপে হাজির হয় কিশোরীয়া। হাতে কোরে আনা কোন খাবার পেছনে লুকিয়ে রাখে। কিছুক্ষণ চুপ কোরে থাকার পর

একটা ভাজা মাছ ভেঙে বাওয়ালের মুখে আস্তে আস্তে পুরে দেয়।

বাওয়াল চিবোয়। তারপর কিশোরীয়ার হাত ধরে টেনে ওর পাশে বসায়। বলে আরও খাবার দে।

কিশোরীয়া বাটি থেকে ভাজা মাছ কাঁটা বেছে বেছে খাওয়ায়। খেতে খেতে হঠাৎ বাওয়াল বলে, নগাটা এমন গদ্দার, এক গেলাসের দোস্ত হোয়ে মোতিকে নিয়ে ভাগলো।

কিশোরীয়া বাওয়ালের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, আজ আমি একটু মাল খাবো।

বাওয়াল চমকে ওঠে। হাজার সাধ্যি-সাধনা কোরেও বিড়ি-সিগারেট-গাঁজা ছাড়া কিস্যু খাওয়ানো যায় নি কিশোরীয়াকে।

গেলাসে মদ ঢালে বাওয়াল। কিশোরীয়াকে বাড়িয়ে দেয়।

আতুরে গলায় কিশোরীয়া বলে, তুই খেয়ে নে মাইরি।

এক চুমুক খেয়ে গেলাস দেয় বাওয়াল। কিশোরিয়া ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করে। মাছ ভাজা ভেঙে মুখে দেয়। একটা বিড়ি চেয়ে ধরায়।

বাওয়াল স্থির চোখে দেখেই যায় কিশোরীয়াকে। ওর মনে পড়ে, বহুদিন আগের দোলের নাচ-গান। গোলাপী শাড়ি-ব্লাউজ পরা কিশোরীয়া গাইছে, পান খায় সাঁইয়া হামারো ...।

বাওয়াল নিশ্বাস দ্রুতলয়ে নিয়ে দু'হাতে কিশোরীয়াকে জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঠেকায়। পা দিয়ে শরীর পেঁচিয়ে আদর......।

কিশোরীয়াও দু'হাতের শক্ত বাঁধনে বাঁধে বাওয়ালকে। ওর হৃদ-স্পন্দন দ্রুত হয়।

সেকেণ্ড পাঁচেক পর আপনা থেকেই শিথিল হোয়ে আসে কিশোরীয়ার দু'হাত। বাওয়ালের মাথায়-পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, বুরা লাইন ছেড়ে এবার তুই একটা বিয়ে কর বাওয়াল। নয় মাগী রাখ। আমার বুকে জ্বালা আছে। লেকিন আমি তো তোকে সুখ দিতে পারবো না।

অল্প দূরে মেথরপাড়ার চার পা, মুখ বাঁধা জ্যান্ত শূয়োর ছানাকে আগুনে ফেলে দেয় কেউ। তার চাপা গোঙানি কানে আসে।

চাঁদের জ্যোৎস্না কান্না হোয়ে গড়িয়ে পড়ে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

স্বাতী ও সাপ

কোয়ার্টারের সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা লন। আগের রাতে স্বাতী সেখানে একটা সাপ দেখেছিল। অবশ্য তার ভুল হতেও পারে। কারণ রাতটা ছিল প্রচণ্ড জ্যোৎস্নার। হাওয়া দিচ্ছিল। বুগানভিলিয়ার ঝাড় দুলছিল গেটের মাথায়। দুলছিল আরও সব বিদেশী ফুলের গাছ। ছায়া পড়েছিল ঘাসের বুকে। সেই সব ছায়াও দুলছিল।



তবু সতর্কতার দরকার আছে। যে মাটিতে এই ব্লক ডেভালাপ-মেণ্ট অফিস আর কোয়ার্টারগুলো হয়েছে, সেখানে এক সময় দারুণ জঙ্গল ছিল নাকি। ওভারসিয়ার হাজরা বাবু সাহেবকে সেই গল্প শুনিয়ে ভয় দেখিয়ে দিয়েছেন। হাজরা বলেছেন, সাপ থাকা উচিত স্যার। থাকবে না কেন? আমার সুপারভিসনেই তো এসব এলাহি কারবার ঘটেছে। তখন ওই জায়গাটা বাঁশবন ছিল। সেখানে প্রায়ই একটা সবুজ সাপ দেখতুম স্যার। আর এই যে খালটা দেখছেন, তখন স্যার ডাইরেক্ট ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই স্যার, বর্ষায়

যত সাপ ভেসে এসে এই খালের বাঁকে জঙ্গলে সেলটার নিত। স্বচক্ষে দেখেছি স্যার। একরাতে আমার মশারির গায়ে সাড়ে তিন হাত লম্বা গোখরো জড়িয়ে গিয়েছিল স্যার। আর স্যার···

বি ডি ও সায়েব অর্থাৎ শ্যামলেন্দু ওকে থামিয়ে দিয়েছিল। সামনে স্বাতীর মুখটা তখন সাদা হয়ে গেছে। হাজরা অবশ্য আরও কিছু গল্প বলে এবং কি কি করতে হবে পরামর্শ দিয়ে কেটে গেলেন। তখন স্বাতী বলেছিল— তাহলে এই সাপের আড্ডায় এসে পড়া গেল! ভালো।

স্বাতী কথা স্বভাবত কম বলে। শ্যামলেন্দু স্ত্রীর এই স্বল্পভাষিতাকে ভাবে নিছক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু গতরাতে জ্যোৎস্নার লনে পায়চারি করতে করতে স্বাতী যা হই চই করে বসেছিল, পরে ভাবতে বেশ অদ্ভুত লেগেছে শ্যামলেন্দুর। স্বাতী যে অমন আর্ত চিৎকার করতে পারে, কল্পনাও করেনি সে।

শিগগির বদলির চেষ্টা করতেই হবে। ডেপুটেশনে এসে দায়িত্বও তো কম বাড়ে নি। আগে বরং বাড়তি-মহকুমা শাসক ছিল,ভালই ছিল। মফস্বল হলেও মোটামুটি শহরে থাকা গেছে। কিন্তু হায়, তখন তো স্বাতী তার ঘরে আসে নি। শ্যামলেন্দুর মনে এই দুঃখভাবটা খচখচ করছে এখন। তার ওপর উৎপাত এই প্রায় দুর্ভিক্ষ অবস্থা। গ্রাম-গুলো দিনে দিনে বড় ক্ষুধার্ত হয়ে উঠছে। মিছিলের পর মিছিল আসছে প্রতিদিন খাদ্য দাও, খাদ্য দাও। উঃ অসহ্য। তার ওপর আবার সাপের উৎপাত এসে পড়ল। শ্যামলেন্দুর মেজাজ সকাল থেকেই তিরিক্ষি।

হাজরা এক জনের কথা পই পই করে বলে গেছেন—আপাতত সেই লোকটাই উদ্ধার। তাকে ডাকতে গেছে আর্দালি গণেশ। বেদে না হলেও সে নাকি সাপের ব্যাপারে ওস্তাদ লোক। সাপ ধরে এবং বিষ চালান দেয় কলকাতায়। আগে ছিল মিলিটারিতে। এখনও নাকি পেনসন পায়। কারণ, তার বাঁ হাতটা কাটা—বহুমূল থেকে স্রেপ বাদ দেওয়া হয়েছে। হাজরা বলেছেন, গুলি লেগেছিল স্যার

বর্মাফ্রণ্টে। তবে একটা হাতেই যেভাবে সাপ ধরে, দেখলে আপনি আঁতকে উঠবেন। আর, সাপটা বিযাক্ত না নির্বিষ, কোথায় আছে কিংবা সরে গেছে—মাটি পরীক্ষা করে নির্ভুল বলে দেবে।

শ্যামলেন্দু যখন শোবার ঘরে গেল, দেখল স্বাতী জানালার কাছে চুপচাপ গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামলেন্দু বলল—গণেশ এসে যাবে ওকে নিয়ে। কারবলিক অ্যাসিডও আনতে বলেছি। ছড়ানো হবে। তারপর লেবার দিয়ে সব গর্ত বন্ধ করে দেবো। ব্যস।

স্বাতী সেকথার কোন জবাব দিল না। ঘুরে বলল—আজ কোথায় প্রোগ্রাম আছে যেন তোমার। যাবে না?

—ও হ্যাঁ। পলাশপুরে ইরিগেশন স্কিম দেখতে। দেখেছ, সব ভুলে গেছি। ইয়ে—তুমিও তো যাবে বলেছিলে।

—না। থাক। শরীরটা ভাল নেই।

শ্যামলেন্দু স্ত্রীর গ্রীবায় দ্রুত হাত রেখে উষ্ণতা পরীক্ষা করে বলল—জ্বরটর নয় নিশ্চয়। দুর্বল লাগছে নাকি? ও কিছু না—রাতের ব্যাপারে নার্ভাস হয়ে পড়েছ। বরং চুপচাপ হয়ে থাকো। আমি দেখি প্রোগ্রামটা ক্যানসেল করা যায় নাকি।

স্বাতী ঘুরে বলল—না, না। তুমি যেও। আমার কিছু হয় নি।

শ্যামলেন্দু বউকে কাছে টানে এবং তখনই বাইরে গণেশের সাড়া পাওয়া যায়। শ্যামলেন্দু ওকে ছেড়ে দেয়।—ওই! এসে পড়েছে তাহলে। এক মিনিট।

সে বাইরের ঘরে চলে যায়।

হ্যাঁ, এসেছে। অবাক হয়ে লোকটাকে দেখে নেন তরুণ বি ডি ও সায়েব। বয়েস অনুমান করা কঠিন—চল্লিশ হতে পারে, পঞ্চাশও হতে পারে। কিন্তু এযে রীতিমতো ভদ্রলোক। টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ, লম্বা, স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। অপূর্ব সুন্দর মুখের গড়ন। কিছু পোড়খাওয়া ভাব আছে অবশ্য। কিন্তু ভীড়ের মাঝে এ সব চেহারা চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। পরনে ধূসর আঁটো প্যাণ্ট, গায়ে ফিকে ব্রাউন শার্ট—বাঁ হাতটা নেই, তা স্পষ্ট। পায়ে গামবুট আছে।

ডানহাতে একটা ছোট্ট ছড়ি—মুঠোটা সাদা কোন ধাতুতে মোড়া। ছড়িটা বগলে আটকে হাসিমুখে একহাত ঈষৎ তুলে হ্যাণ্ডশেকের ভঙ্গী করে সে। কিন্তু বি ডি ও সায়েব হাত বাড়ায় না শুধু মাথা তুলিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গী করে—আসুন। আপনারই অপেক্ষা করছিলুম। ইয়ে—আপনিই তো সন্দীপবাবু?

—হ্যাঁ। সন্দীপ ব্যানার্জী।

শ্যামলেন্দু অকারণে হাসে। —সন্দীপ ব্যানার্জী নামে আমার এক বন্ধু ছিল। আশ্চর্য, সেও মিলিটারির লোক। অবশ্য সে সাপটাপ ধরতে পারত না।

—তাহলে আমাকেও বন্ধু বলে জানবেন।

এ উক্তি অবশ্য স্পর্ধা। বি ডি ও সায়েব হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়। —ঠিক আছে চলুন, আপনাকে জায়গাটা দেখিয়ে দিই।

—সাপ তো আপনার স্ত্রী দেখেছিলেন শুনলুম।

—ও হ্যাঁ।

—প্লীজ, তাহলে তাঁকেই আমার দরকার হবে।

—সে কী।

—আমার নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে এ সব ব্যাপারে। তাঁর মুখেই ব্যাপারটা শুনব এবং তিনিই একজ্যাক্ট জায়গাটা দেখিয়ে দেবেন।

শ্যামলেন্দু ইতস্তত করছে দেখে সে আবার বলে—এটা সায়েন্টিফিক প্রসেস!

অগত্যা গণেশ মেমসাবকে খবর দেয়। ততক্ষণে বাইরে বেরিয়েছে দুজনে। কোয়ার্টারের সামনে প্রশস্ত লনে সকালের রোদ্দুরে ঝকমক করছে। হাল্কা হাওয়ায় দুলছে ফুলগাছগুলো। এই ব্যাপক পরিচ্ছন্ন শ্রীতে কোথায় লুকিয়ে আছে একটা সাপ, বিশ্বাস করা কঠিন। শ্যামলেন্দুর দিকে তাকিয়ে লোকটা হঠাৎ বলে—এটাই মানুষের বরাবরের অভ্যাস শ্যামলেন্দুবাবু।

স্যার না বলে বাবু বলার লোক এলাকায় এটা প্রথম দেখল

সায়েব। তার কেমন খারাপ লাগে। তবু মেনে নেয়। সাপ বলে কথা। শুধু বলে—কী ?

এভিল সম্পর্কে মানুষ সব সময় সতর্ক। খুলে বলি, এই জায়গাটা কেমন পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। অথচ যে মুহূর্তে শুনলেন এখানে সাপ আছে, অমনি সব সৌন্দর্য ঘুলিয়ে গেল। অস্বস্তি জাগল। তার মানে, এই চেঞ্জটা নির্ভর করছে আপনার একটা জ্ঞানের ওপর। জ্ঞানটা হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। একটা সাপ আছে—এটা প্রত্যক্ষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ এল মনের সৌন্দর্য বোধে। অথচ সাপ থাকতেও পারে, এই সম্ভাবনা আপনার মনে কিন্তু বরাবর আছে। থাকা সত্ত্বেও সৌন্দর্যবোধ আপনার অক্ষুণ্ণ রাখার অসুবিধে হয় নি।

লোকটা ফিলসফি আওড়াচ্ছে। শ্যামলেন্দু বিরক্ত হয়। কিন্তু স্বাতী আসতে দেরী করছে কেন ? কাপড় বদলাচ্ছে নাকি ?

আমরা মনে সাপ নিয়ে বেঁচে আছি শ্যামলেন্দুবাবু। দিব্যি বেঁচে আছি। কিন্তু সাপটা প্রত্যক্ষ হলেই বিপদ।

হা হা করে হাসে সর্পবিদ্ সন্দীপ ব্যানার্জী। সেই সময় স্বাতী বেরিয়ে আসে। শ্যামলেন্দুর চোখ জ্বলে যায়। সত্যি কাপড় বদলেছে স্বাতী। কিন্তু ওকে হঠাৎ উজ্জ্বল আর সুন্দর দেখাচ্ছে কেন ? সে বুঝতে পারে না।

স্বাতী এসে করজোড়ে, ঠোঁটে হাসি নিয়ে, নমস্কার করে। সর্পবিদ মাথাটা নোয়ায়।—আসুন। প্রথমে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব কিন্তু।

স্বাতী বলে—বেশতো। করুন।

—আপনি ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে সাপটা দেখেছিলেন ?

স্বাতী হাল্কা পায়ে এগিয়ে একপাশে দাঁড়াল।—একজ্যাক্ট বলা কঠিন। মনে হচ্ছে এখানে।

—তাহলে চাঁদ আপনার পিছনে ছিল ?

—হয়তো।

—কোথায় দেখলেন সাপ এবং কিভাবে বলুন।

—ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখ গেল পায়ের কাছে। দেখি কী একটা চলে আসছে—ঠিক ওখানটায়। তারপর বুঝলুম, সাপ। তারপর চেঁচিয়ে ডাকলুম গণেশকে।

—যখন ডাকলেন, তখনও কি সাপটার দিকে চোখ ছিল আপনার ?

—না। সরে গিয়েছিলুম ওখানে। গণেশ এসে সাপটা দেখতে পেল না।

—ভেবে বলুন, ভুল দেখেন নি তো ?

—অসম্ভব। আমার আইসাইট ভাল।

—জ্যোৎস্নায় এই চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়টা ছায়া ফেলেছিল এখানে।

না, ছায়া চলাফেরা করে নাকি ? আমি ওটা এগিয়ে আসতে দেখছি। আর - ওটা লম্বা আঁকাবাঁকা ছিল।

লোকটা হাঁটু দুমড়ে ঘাসের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি সব পরীক্ষা করে যেন। তারপর অদ্ভুত ভঙ্গীতে এগোতে থাকে ? ততক্ষণ কাছে ও দূরে একটা ভিড় হয়েছে। সব কোয়ার্টার থেকে লোকেরা এসে গেছে। সবাই চুপচাপ দেখছে।

একটু এগিয়ে গিয়ে সর্পবিদ বি ডি ওর স্ত্রীকে ডাকে। স্বাতী প্রায় দৌড়ে তার কাছে যায়। এসময় শ্যামলেন্দুও আসতে থাকে। লোকটা হাত নেড়ে তাকে আসতে নিষেধ করে। তখন শ্যামলেন্দু তোঁতোমুখে দাঁড়িয়ে যায়। সাপটাপের ব্যাপার না হলে এমন নিষেধাজ্ঞা সে মানত নাকি ? তার চোখের সামনে সর্পবিদ আর স্বাতী বাউণ্ডারীর দিকে এগোতে থাকে। নিচু কাঠের বেড়া আছে ওখানে। তার নিচেই খাল। বেড়ার ধারে অজস্র ঝোপঝাড়! দুটি মূর্তি কেমন ধূসর লাগে ওখানে।

—তারপর ? কেন ডেকেছে !

—তোমাকে একবার দেখতে চেয়েছিলুম।

—আমি গ্রামে এসেছি, কে বলল তোমাকে ? কার শুনলে ?

—গতকাল সন্ধ্যায় আমরা জিপে আসছিলুম।। দেখলুম তুমি

বন্দুক কাঁধে নিয়ে আসছ। দেখে চমকে উঠেছিলুম। পরে মনে পড়ল, 'হ্যাঁ—তোমার গ্রাম তো এটাই।

—সরাসরি আমায় সঙ্গে দেখা করলেই পারতে।

—পারতুম না ও কী ভাবত?

—হুঁ। কিছু বলতে চাও?

—চাই, কিংবা চাইনে।

—হেঁয়ালি কোরো না স্বাতী। কলকাতা ছেড়েছি তোমার স্মৃতি ভুলে যাব বলে। কিন্তু এখানেও তুমি?

—ও কথা থাক্। রিসার্চের কী হল?

—দেখতেই পাচ্ছ। চলছে।

—ভিয়েনায় যে কী সব পেপার পাঠিয়েছিলে?

—সামনের মাসে ডেকেছে। স্বাতী, ওরা কী ভাবছে। এখন এ পর্যন্তই থাক।

—তোমার সাপগুলো কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছ নাকি?

—হ্যাঁ। আরও অনেক যোগাড় করেছি এখানে।

—আমার আবার দেখতে ইচ্ছে করছে। কতকাল দেখিনি।

—তুমি এত নির্বিকার মেয়ে স্বাতী!

—মোটেই না। হঠাৎ তোমাকে কাল আবিষ্কার করার পর থেকে বিকারে ভুগছি।

—তুমি থাক্। চলো জানিয়ে দিই—সাপটা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে।

—আর এক মিনিট।

—হুঁ, বলো।

—আজ বিকেলে ও কোথায় ইরিগেশন দেখতে যাবে। তখ আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। স্যুটেবল্ জায়গা কোথায় ব দাও।

—কেন দেখা করতে চাও?

—আমার অনেক কথা আছে। কৈফিয়ৎ আছে।

—কৈফিয়ৎ আমি চাই। কখনও চেয়েছি?

—তবু দিতে হবে। না হলে —

—না হলে?

—ভয় হয় বড্ড —

বিবেকের পীড়ন? ভাল যেও। আমার ভাল লাগবে। গ্রামের বাইরে গিয়ে মাঠে একটা ব্রিজ পড়বে। সেখানেগিয়ে আমার দেখা পাবে। নদী আছে। কটায় যাবে?

—সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে।

—যদি আর ফিরতে না দিই?

—তুমি আমাকে রাখবেনা, জানি।

—কে জানে। কোন গ্যারান্টি নেই।

—সন্দীপ।

—বলো।

তোমার জুলফির চুল সাদা হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি এখনও তাই থেকে গেছ। সেই বেবিফেস সেই কচি-কচি গড়ন।

—হেসোনা। কী ভাবছে। এস—এখন আর নয়।

গতকাল পূর্ণিমা গেছে। ইরিগেশন স্কীম দেখে এবং গ্রাম্য প্রধানদের সঙ্গে নানান ব্যাপার আলোচনা করে ফিরতে চাঁদ উঠে এল দিগন্তে। মস্তো থালার মতন চাঁদ। প্রথমে ঘোর লাল—তারপর হলুদ হতে থাকল। ধু ধু মাঠ দুপাশে—মধ্যে পাকা সড়ক। জিপে ফিরে আসছে বি ডি ও সায়েব। বেশ দেবী হয়ে গেল। স্বাতী হয়তো উৎকণ্ঠায় অস্থির। সাপটা পালিয়েছে—আবার ফিরে আসতেও তো পারে। অবশ্য কার্বলিক এ্যাসিডের গন্ধে টিকতে পারবে না।

নদীর ব্রিজে এসে ব্রেক কষে ড্রাইভার। শ্যামলেন্দু বলে—কী হলো?

—অপূর্ব দৃশ্য স্যার। দেখুন দেখুন।

শ্যামলেন্দু তাকান। আর চমকে ওঠেন। সামনে দশ হাত

দূরে বাঁদিকের কালভার্টের নিচে একটা জমি—ঘাসে ভরা। শুকনো রুক্ষ ঘাস। শেষ গ্রীষ্মের টানে এলাকার মাটি নীরস হয়ে পড়েছে। নদীও প্রায় শুকনো। জমিটা নদী থেকেই ঢালু হয়ে উঠে ব্রিজের শেষ প্রান্তে মিশেছে। আর সেখানে দুটো সাপ জোড় বেঁধে ফোঁস ফোঁস করছে। অভিভূত হয় বি ডি ও—এদৃশ্য কখনও দেখেনি। হেড লাইটের আলোয় কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে আবার জড়াজড়ি শুরু করে সাপদুটো। ড্রাইভার মুকুন্দ প্রণাম করে বলে— শিগগির বৃষ্টি নামবে স্যার। দেখবেন।

জিপ থেকে সতর্ক ভাবে নামে শ্যামলেন্দু। হাতে টর্চ। একবার ভাবে সাপ দুটোর ওপর আলো ফেলবে। ফেলতে গিয়ে কী ভেবে নদীতে ফেলে। দূরে নিচে চড়ার উপর কারা বসে আছে মনে হয়। আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে কে বলে ওঠে—কে রে?

আঁতে ঘা লাগে বি ডি ওর। পাল্টা চড়া গলায় বলে—তোমরা কে? ওখানে কি করছ?

—বসে আছি। তোর বাপের কিরে শালা?

মুকুন্দ ডাকে—চলে আসুন স্যার। সন্দীপ ব্যানার্জী মনে হচ্ছে। শালা রাত এলেই মাতাল হয়। ছেড়ে দিন। পাগল ছাগল লোক!

শ্যামলেন্দু উঠে এসে জীপে বসে। রাগে দুঃখ ছটপট করে সে গাল দিল লোকটা? বি ডি ওকে শালা বলল? পরে ভাবে—চিনতে পারেনি, তাই তাছাড়া মাতাল মানুষ।

একটু পরেই হো হো করে প্রচুর হাসে সে। মুকুন্দ বলে—হাসছেন কেন স্যার?

পলকে গম্ভীর হয়ে বি ডি ও—কিছু না।

ফিরে গিয়ে কাণ্ডটা বলবে। দুটোই সমান থ্রিলিং। সাপের জোড় বাঁধা এবং নদীর চড়ায় মাতাল একটা লোক। কিন্তু ও ফিরবে কোন পথে? এসেই তো সাপের মুখে পড়বে।

মুকুন্দ গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে বলে—লোচ্চা লোক স্যার। হল, আর কে যেন আছে সঙ্গে।

—হ্যাঁ, দুজন মনে হল।

—তবে নির্ঘাত মেয়েমানুষ নিয়ে এসেছে।

ড্রাইভার মুকুন্দর এই অশালীন মন্তব্যে ক্ষিপ্ত বি ডি ও বলে—ওসব ছাড়ো তো মুকুন্দ।

সবুজ লনে আজ জ্যোৎস্নায় পায়চারি করছিল স্বয়ং বি ডি ও সায়েব। হাতে টর্চ। গেট পেরিয়ে এক সময় স্বাতী আসে।—এসে গেছ? কতক্ষণ? আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। ঘরে চুপচাপ ভাল লাগছিল না। কী নির্জন জায়গা! কী হল? কথা বলছ না যে? রাগ করেছ—তাই না? না গো না—বেশি দূর যাই নি। ওই রাস্তায় ঘুরলুম কিছুক্ষণ—মাত্র আধঘণ্টা।

মুহূর্তে শ্যামলেন্দু স্বাভাবিক হয়ে ওঠে—তোমার ভয় করল না? একটা আলোটালো নিলেও পারতে!

—আলো হাতে নিয়ে বেড়াতে যায় নাকি কেউ? স্বাতী হাসে।—চলে এস। সাপটাপ আসবে আবার।

শ্যামলেন্দুর হাতটা ধরে স্বাতী ঘরে যায়। শ্যামলেন্দু এবার স্ত্রীকে সাপের জোড়বাঁধার খেলাটা বর্ণনা করে শোনাবে। তারপর বলবে সন্দীপ ব্যানার্জির কথা। মাতালের কাণ্ড। এবং হঠাৎ শ্যামলেন্দু হো হো করে হেসে ওঠে।

স্বাতী ঘুরে বলে—হাসছ যে?

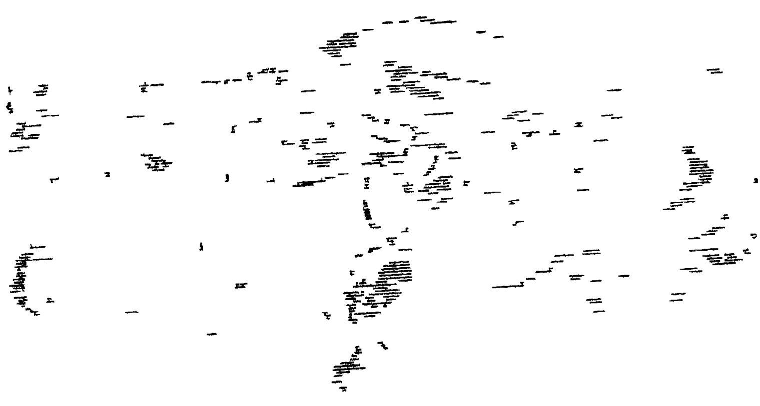
—কিছু না। এমনি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেমিক ও স্বামী

যুবকটির সঙ্গে দোকানটায় ঢোকার মুখেই দেখা হয়েছিল নিখিলের। তখন যুবকটি নিখিলের চোখের দিকে দু'এক পলক তাকিয়ে থেকেই চোখ ফিরিয়ে নেয়। কোনো কথা বলেনি।

নিখিলও ঠিক মনে করতে পারলো না যুবকটিকে আগে কোথাও দেখেছে কিংবা তার নাম কি। অথচ চেনা চেনা মনে হচ্ছে। যাকগে,



নিখিল আর ও নিয়ে মাথা ঘামালো না। সিঁড়ির ওপর একটা লোহার টুকরো পড়েছিল, নিখিল শান্তাকে বললে, দেখো, হোঁচট খেয়ো না।

রবিবারের সকাল। নিখিল শান্তাকে নিয়ে পার্ক স্ট্রীটের একটা নিলামের দোকানে এসেছে। বিশেষ কোনো কিছু যে কেনার উদ্দেশ্য আছে তা নয়। যদি হঠাৎ কিছু চোখে লেগে যায়। এখানে সাহেব বাড়ির রুপো বাঁধানো আয়না থেকে শুরু করে শ্বেতপাথরের টেবিল পর্যন্ত অনেক কিছুই পাওয়া যায়। সবাই বেশ সেজেগুজে আসে, কিছু না কিনেও দু'একবার দাম হাঁকতে মন্দ লাগে না।

রোজ-উডের একটা ছোট্ট বেডসাইড টেব্‌ল খুব পছন্দ হয়েছে শান্তার ; সে দাম বলতে শুরু করেছে। আরম্ভ হয়েছে পনেরো টাকা থেকে—একজন স্থূলকায় মাড়োয়ারী এবং একজন গম্ভীর চেহারার পার্শী মহিলা অনবরত দাম বাড়িয়ে যাচ্ছেন—পঞ্চান্ন টাকা পর্যন্ত দর ওঠার পর নিখিল ইশারা করলো শান্তাকে। এরপর জেদাজেদির জন্য দাম বেড়ে যাবে—সাধারণতঃ এরকমই হয়। শান্তা তবু বললো, ষাট টাকা। তারপর থেমে গেল। শেষ পর্যন্ত পার্শী মহিলাই সেটা কিনে নিলেন একানব্বই টাকায়।

শান্তা নিখিলের দিকে ফিরে ফিসফিস করে বললো, তুমি বারণ করলে কেন? জিনিষটা ভাল ছিল কিন্তু!

নিখিল বললো, তা বলে অত দাম দেবার কোনো মানে হয় না। রোজউড হোক আর যাই হোক—এইটুকু তো জিনিষ, পঞ্চাশ টাকার বেশী দাম হয় না।

এই সময় সেই যুবকটি এসে ওদের পাশে দাঁড়ালো। শান্তার দিকে তাকিয়ে বললো কেমন আছেন? চিনতে পারছেন আমাকে?

শান্তা চিনতে পেরেছে। হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো, ওমা, আপনি? বাঃ, কেন চিনতে পারবো না! আপনি এখন কলকাতায় আছেন?

যুবকটি এবার নিখিলের দিকে তাকিয়ে ভদ্রতাসম্মত হাসি দিয়ে বললো, আপনি ভালো?

নিখিল এবার সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলো ওকে। ছেলেটির নাম অলোক ব্যানার্জি, দু'বছর আগে দেখা হয়েছিল দার্জিলিং-এ।

নিখিল চট্‌ করে একটা মজার ব্যাপার ভেবে নিল। মজাটা হচ্ছে এই, দোকানে ঢোকার মুখে সে ছেলেটিকে চিনতে পারেনি—ছেলেটিও নিশ্চয়ই চিনতে পারে নি।—তা হলে কথা বলতো। ছেলেটি তখন শান্তাকে দেখেনি। কিন্তু ছেলেটি শান্তাকে দেখেই চিনতে পেরেছে—এবং শান্তাও চিনতে পেরেছে ওকে। অথচ একসঙ্গেই তো আলাপ।

দেখা হয়েছিল দার্জিলিং-এ। নিখিল আর শান্তা সদ্য বিয়ে করে গিয়েছিল হনিমুনে। তখন বর্ষাকাল—বিশেষ লোকজন নেই।

হোটেলে পাশের ঘরটাতেই থাকতো এই অলোক ব্যানার্জি। নিজে থেকেই যেচে আলাপ করেছিল।

অলোক শান্তাকে বললো, টেবলটা না কিনে ভালই করেছেন। ওর লক্‌টা খারাপ, আমি আগেই দেখেছি।

শান্তা জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখন কলকাতায় থাকেন?

অলোক বললো, হ্যাঁ, আপাততঃ দু'এক বছরের জন্য কলকাতায়।

দার্জিলিং-এ যখন প্রথম আলাপ হয়, তখন অলোক বলেছিল, ও জামসেদপুরে থাকে। একলা একলা দার্জিলিং-এ গিয়েছিল কেন? সে সম্পর্কে অলোক জানিয়েছিল যে, প্রায়ই সে একা একা নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কোন এক জায়গায় বেশীদিন থাকতে তার ভালো লাগেনা। কখনো পাহাড়ী জায়গায়, কখনো সমুদ্রের ধারে ছুটি পেলেই সে চলে যায়।

ব্যাপারটা খুব রোমান্টিক মনে হয়েছিল ওদের কাছে। যুবা বয়েসে সাধারণতঃ কেউ একা একা বেড়াতে যায়না। নিখিল যেমন কখনো যায়নি। হয় যাওয়া হয় বন্ধু-বান্ধব মিলে দল বেঁধে—অথবা বিবাহিত হলে স্ত্রীর সঙ্গে।

একদিন জলাপাহাড় অঞ্চলে একটা পাথরের ওপর একা অলোক ব্যানার্জিকে অন্যমনস্কভাবে বসে থাকতে দেখে শান্তা পরিহাসের সঙ্গে বলেছিল, ছাখো, ছাখো, ভদ্রলোক নিশ্চয় ব্যর্থ প্রেমিক। কিংবা কবি-টবি নয় তো! নইলে সন্ধ্যেবেলা কেউ ঐরকম একা বসে থাকে?

শান্তা আর নিখিল দার্জিলিং-এ ছিল দশদিন। এর মধ্যে অলোক ব্যানার্জির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়েছে। কখনো বেড়াতে যাবার মুখেই দেখা হওয়ায় অলোক ব্যানার্জি বলেছে, কোন্ দিকে যাচ্ছেন? চলুন না, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।

নতুন বিয়ের পর যারা হনিমুনে গেছে—অন্যদের উচিত নয় তাদের সঙ্গে বেশী দেখা করা। তাদের নিরালায় থাকতে দেওয়া উচিত। কিন্তু অলোক ব্যানার্জি তা বোঝেনি। এ নিয়ে শান্তা প্রথম প্রথম দু'একবার বলেছে, ভদ্রলোক বড্ড গায়েপড়া-আমরা আলাদা কোথাও—

যাবো—তার উপায় নেই। ঠিক ওর সঙ্গে দেখা হবেই। নিখিল উদারভাবে বলেছে তাতে কি হয়েছে; লোকটা তো খারাপ নয়! কথাবার্তা বেশ ভদ্র! পৃথিবীতে একেবারে নিরালা জায়গা আর তুমি কোথায় পাবে?

কয়েকদিনের মধ্যেই অবশ্য শান্তা লোকটিকে মোটামুটি সহ্য করে নেয়। অলোক ব্যানার্জি সবসময় বেশ ফিটফাট সেজেগুজে থাকে, ব্যবহার খুবই ভদ্র, নানারকম বিষয়ে কথাবার্তা বলতে পারে। এরকম লোক গায়ে পড়া হলেও এড়ানো যায় না।

নিখিল দু'চারদিনের মধ্যেই একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলেছিল। অলোক ব্যানার্জি পেশায় সেল্‌স্ রি.প্রেজেন্টেটিভ। নানা জায়গায় ওকে একা একা ঘুরে বেড়াতে হয় চাকরির কারণে। সেটাকেই ও একটু রোমান্টিক রূপ দিয়ে বলেছে। হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে অলোক ব্যানার্জির কথাবার্তা শুনে নিখিল বুঝতে পেরেছে—এই হোটেলেই সে বছরে দু'তিনবার আসে। অথচ শান্তার কাছে কথায় কথায় ও একবার বলেছিল, দার্জিলিং-এ এই ওর প্রথম আসা। ওদের সঙ্গে একসঙ্গে ঘুম-এ গিয়েছিল, শুধু ওদের সঙ্গ পাবার জন্যই। নইলে দার্জিলিং-এ বারবার এসে কেউ প্রতিবার ঘুম কিংবা টাইগার হিল্‌স দেখতে যায় না।

নিখিল অবশ্য এ কথাটা বলেনি শান্তাকে। এটুকু মিথ্যে কথা বলে লোকটি এমন কিছু দোষ করেনি। শুধু ওর সম্পর্কে শান্তার ধারণা খারাপ করে দেবার কোন মানে হয় না। নিখিল শান্তার স্বামী, আর অলোক ব্যানার্জির চোখে শান্তা একজন সদ্য পরিচিতা সুন্দরী মহিলা। একজন সদ্য পরিচিতা সুন্দরী মহিলার কাছে নিজেকে কিছুটা উল্লেখ-যোগ্য করে তোলার জন্য ওরকম একটু-আধটু মিথ্যে কথা সব পুরুষ মানুষই বলে। নিখিলও হয়তো বলতো। সংসারে মন টেকে না এমন একজন যুবক সমুদ্র কিংবা পাহাড়ী জায়গায় ঘুরে বেড়ায়—এই চরিত্রটি মেয়েদের পছন্দ হবে। তার বদলে, চাকরির জন্য নানা জায়গায় টুরে যেতে হয়—এই সাদা সত্যি কথাটা এমন কিছুনা।

যুবকটি শেষপর্যন্ত শান্তার প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল বোধহয়। শেষের দিকে শান্তাকে দেখলেই একটা গদ্‌গদভাব এসে যেত। মাথা নুইয়ে নুইয়ে এমনভাবে কথা বলতো যে দেখলেই প্রেমিক প্রেমিক মনে হয়। কখন নিখিল একটু দূরে যাবে—শান্তার সঙ্গে একটু নিরালায় কথা বলা সম্ভব হবে—সেই সুযোগ খুঁজতো।

সদ্য বিবাহিত এবং স্বামী সঙ্গে উপস্থিত—এমন মেয়ের প্রেমে পড়া যে উচিত নয় সেটা বুঝতে পারেনি ছেলেটি। তা আর কি করা যাবে। প্রেমে তো সবাই হিসেব করে পড়ে না! ভালবাসা অন্ধ—একথা আর তাহলে বলে কেন? নিখিল এইসব ভাবতো। নিখিল মনে মনে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করতো। হঠাৎ বেড়াতে এসে দেখা, একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে মনটা একটু নরম হয়ে যাও-য়ায়—তার সঙ্গ পাবার একটু ইচ্ছে—এরবেশী কিছু তো নয়! এতে দোষেরকিছু নেই।

নিখিল অবশ্য মনে মনে বুঝতে পারলো, অলক ব্যানার্জি মনে মনে তাকে অপছন্দ করে। তা তো করবেই। মনে মনে কোনো মেয়েকে ভালোবাসলে তার স্বামীকে কেই বা পছন্দ করে। স্বামীরা অত্যন্ত দুর্ভাগ প্রাণী। তাদের কেউ-ই পছন্দ করেনা। নিখিল মাঝে মাঝে নিজেকে অলোক ব্যানার্জির জায়গায় বসিয়ে ভাবতো. সে যদি শান্তার মতন কোনো মেয়ের সঙ্গে এইরকম প্রেমে পড়তো তাহলে সেও কি মনে মনে চাইতো না—স্বামীটা এখানে না থাকলেই ভালো হয়! বস্তুত এরকম ঘটনা তো নিখিলের জীবনেও ঘটেছে।

নিখিল অবশ্য অলোক ব্যানার্জিকে খুব বেশী খুশী করতে পারেনি। অলোকের সঙ্গে শান্তাকে বেশীক্ষণ একা থাকার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। সদ্য বিবাহিত স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে পরপুরুষের কাছে রেখে দূরে সরে থাকা মোটেই স্বাভাবিক নয়। সেটা কি ভাল দেখায়? ভদ্রতা সভ্যতা মেনে যতদূর যা করা যায়, নিখিল তাই করেছে।

শান্তাও কি ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি? নিশ্চয়ই বুঝেছিল এবং বুঝেও না বোঝার ভান করেছিল। একটা ফিটফাট চেহারার সুদর্শন

যুবক সবসময় খাতির করে, প্রসংসা করে কথা বলছে—এটা কোন্ মেয়ের না ভালো লাগে? এমন কি সদ্য বিবাহিতা মেয়েদেরও ভালো লাগে। এর প্রতিদান হিসাবে শান্তা আর কি-ই বা দিতে পারে, টুকরো টুকরো হাসি আর দু'চারটে রহস্য-ঘেঁষা সংলাপ। মেয়েদের বিশেষ কিছু দিতে হয় না। মেয়েরা যে মেয়ে—এটাই তাদের মস্তবড় গুণ, ছেলেদের কাছে। সুন্দরী হলে তো কথাই নেই। নিখিল জানতো, শান্তা কক্ষনো চুপিচুপি রাত্তির বেলা অলোক ব্যানার্জির ঘরে ঢুকবে না। শান্তা ভালো মেয়ে এবং সে নিখিলকে সত্যই ভালোবাসে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকারের ভালোবাসা থাকলে এই রকম দু'একটা ছোট-খাটো প্রেমিক-প্রেমিকার সাইড ক্যারেক্টার এলেও কোন ক্ষতি হয় না।

জলাপাহাড়েই আর একদিন একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। সেদিনও ওখানে অলোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। নিখিল অবশ্য বুঝতে পেরেছিল অলোক ইচ্ছে করেই সেখানে আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছে। অলোক জানতো ওরা ওদিকেই আসবে। এরকম অনেকেই করে। অলোক ওদের দেখে বললো, আরেঃ! আপনারাও আজ এদিকে এসেছেন? আমার কিছু করার উপায় নেই, তাই ঘুরতে ঘুরতে এদিকটায় এলাম।

নিখিল বললো, চলুন, একসঙ্গে বেড়ানো যাক।

শান্তা বললো, বেড়াবার কি উপায় আছে? সারাদিন ধরেই তো বৃষ্টি! এতদিনে একবারও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পেলাম না।

অলোক বললো, আজ মেঘ সরে যাচ্ছে! দেখুন, দেখুন-কি রকম উড়ে যাচ্ছে হালকা হালকা মেঘ। আজ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যেতে পারে।

নিখিল ওকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি রেন-কোট কিংবা ছাতা আনেন নি কেন? শুধু শুধু ভিজছেন।

অলোক বললো, একটু ভিজলে কি আর হবে!

নিখিলদের সঙ্গে একটা মাত্র ছাতা। তাতে তারা স্বামী-স্ত্রী গা ঘেঁষাঘেঁসি করে গেলে কোন দোষ নেই। হনিমুনের সময় সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পাশাপাশি আর একজন ভিজতে ভিজতে গেলে

অস্বস্তি লাগে। নিখিল বললো, আপনিও আসুন না!

অলোক খুব আপত্তি করা সত্ত্বেও নিখিল তাকে টেনে আনলো। তবে, এক ছাতার তলায় স্বামী-স্ত্রী আর স্ত্রী-র প্রেমিক কিছুতেই ধরানো যায়না—তাতে তিনজনেরই অসুবিধে। যাই হোক একটু বাদে বৃষ্টি কমে গেল অনেকটা। পাউডারের মত মিহি মিহি বৃষ্টি এসে লাগছে গায়ে—নিখিল ছাতা গুটিয়ে ফেলেছে। বহুদূর পর্যন্ত নিচু উপত্যকায় যেন হালকা একটা জাল বেছানো রয়েছে।

'একদিকটা খুবই নির্জন, আর কোন ভ্রমণ-পিপাসুকে দেখা যায় না। এই সময় শান্তার হঠাৎ বাথরুম পেয়ে গেল। সৌভাগ্যের বিষয় ছোট বাথরুম। শান্তা ইশারায় নিখিলকে জানালো সে কথা—এখন নিখিলকে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। এসব কথা শৌখিন প্রেমিকদের কাছে বলা যায় না, স্বামীকেই বলতে হয়।

এমনিতে কোনো অসুবিধা ছিলনা। কাছাকাছি মানুষজন নেই—একটা কোনো গাছের আড়ালে শান্তা বসে পড়তে পারতো। নিখিল দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিত। কিন্তু অলোক রয়েছে যে। অলোকের সামনে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করাই যে লজ্জার ব্যাপার। নিখিল শান্তাকে ইশারায় জিজ্ঞেস করলো, হোটেলে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে না?

—না। শান্তা অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে না। ওরা অনেকটা দূরে চলে এসেছে।

অগত্যা নিখিলকে ব্যবস্থা করতেই হলো। একটা সুবিধামতন গাছ দেখে নিখিল গম্ভীর মুখকরে শান্তাকে বললো তুমি কোথায় যাবে বলেছিলে যাও, আমি আর অলোকবাবু রাস্তায় দাঁড়াচ্ছি।

অলোক প্রথমটায় বুঝতে পারে নি। অবাক হয়ে শান্তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ভাগ্যিস কিছু জিজ্ঞেস করেনি। অলোক যেমন সব সময় শান্তার জন্য কিছু না কিছু করার জন্য ব্যস্ত, এ ব্যাপারেও সে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়ে ফেললে হয়েছিল আর কি। যাই হোক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বেচারা খুব লজ্জা পেয়ে গেল।

নিখিল অলোককে নিয়ে একটু দূরে এসে দাঁড়িয়ে বললো, এই নিন, সিগারেট নিন।

তারপর আজেবাজে কথা বলতে লাগলো। দু'জনের মধ্যে কোনোরকম মতের মিল নেই—কথাবার্তা আর কি হবে। নিখিল হঠাৎ লক্ষ্য করলো, অলোক বেশ চঞ্চল হয়ে পড়েছে। কথা বলায় তার একটুও মন নেই। যেন তার ভেতরের একটা দুর্বার ইচ্ছে চাইছে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখতে শান্তাকে। এটাও তো স্বাভাবিক। নিখিল তার স্ত্রীকে প্রতি রাত্রে দেখে—তার এখন ওরকম ইচ্ছে জাগবার কথা নয়। কিন্তু একজন সুন্দরী মহিলা সম্পর্কে একজন অনাত্মীয় পুরুষের তো সেরকম মনোভাব হবে না। ভদ্রতা সভ্যতার মোড়ক দিয়ে এটাকে যতই ঢেকে রাখা যাক—ব্যাপারটা তো জলের মত সোজা। বেশ কৌতুক বোধ করে নিখিল মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

যাইহোক, সেবার নিখিলরা চলে আসবার পরও অলোক ব্যানার্জি দার্জিলিং-এ থেকে যায়। অলোক ওদের স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছিল। ঠিকানা বিনিময়, আবার দেখা হবার আশ্বাস ইত্যাদি যা যা হয়—সেবার তো হয়েছিলই। অলোক জামসেদপুরে বেড়াতে যাবার জন্য বারবার অনুরোধ করেছিল ওদের। নিখিলও বলেছিল, কলকাতায় এলে অলোক যেন নিশ্চয়ই ওদের বাড়িতে আসে। চিঠিপত্রেও নিশ্চয়ই যোগাযোগ থাকবে ইত্যাদি। ট্রেন ছেড়ে দেবার পরও নিখিল দেখলো, অলোক তখনও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। শান্তার প্রেমিক পেছনে পড়ে রইলো।

চলে আসবার আগের দিন নিখিল টের পেয়েছিল যে অলোক ব্যানার্জি বিবাহিত। কি একটা কথা প্রসঙ্গে ব্যাপারটা বোঝা গিয়েছিল। এটা জানার জন্য নিখিলের কৌতূহল ছিল, অথচ জিজ্ঞেস করাও যায় না সরাসরি—তাই সে প্রসঙ্গটা ধরে ঠিক বুঝে নিয়েছে। অলোক অবশ্য কোনদিনই বলে নি যে সে বিবাহিত নয়—কিন্তু নিজের স্ত্রীর কথা সে একবারও উচ্চারণ করেনি এবং তার ঐ একা-একা ভাবটার জন্য যেন ধরেই নিতে হয় যে সংসারেও সে একা। শান্তার সেই রকমই ধারণা।

নিখিল অবশ্য শান্তার এই ভুলটাও ভেঙে দেয় নি। অলোক ব্যানার্জি এ কথাটা চেপে গেছে, বেশ করেছে। এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বিবাহিত লোকদের কি প্রেমে পড়া নিষিদ্ধ? পৃথিবীতে ঢের ঢের বিবহিত পুরুষই প্রেম করে। তবে মেয়েরা তাদের প্রেমিক হিসেবে বিবাহিত পুরুষদের চেয়ে অবিবাহিত ছেলেদেরই বেশী পছন্দ করে। প্রেমিক—এই ধারনাটাই বিবাহের সম্পর্কের উর্ধ্বে যেন। নিখিল চেয়েছিল শান্তার এই শৌখিন প্রেম-প্রেম খেলাটুকু অবিকৃতই থাক। শেষ মুহূর্তে ধারণা ভেঙে দেওয়া নিষ্ঠুরতা।

অলোকের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রাখা হয়নি অবশ্য। বেড়াতে গিয়ে যাদের সঙ্গে আলাপ—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেই আলাপ আর বেশীদূর গড়ায় না। তাছাড়া দার্জিলিং-এ যাকে ভালো লাগে, কলকাতায় তাকে আর ভালো না-ও লাগতে পারে। কখনো কখনো ওরা স্বামী-স্ত্রীতে অলোক ব্যানার্জির প্রসঙ্গ তুলে হাসাহাসি করেছে বটে—তবে তার বেশী আর কিছু না।

আবার হঠাৎ এই নিলামের দোকানে দেখা। অনেকক্ষণ ওরা একসঙ্গে রইলো। অলোক কিনে ফেললো একটা বুক কেস এবং প্রায় তার পেড়াপীড়িতেই শান্তাকে কিনতে হলো একজোড়া ফুলদানি। দার্জিলিং-এর গল্পও হলো অনেকক্ষণ এবং অলোককে একদিন তাদের বাড়ীতে অবশ্যই আসতে বলা হলো।

কিন্তু আসতে বলা মানেই নেমন্তন্ন করা নয়। বিশেষ কোনো দিন ঠিক করে নেমন্তন্ন করা। আর, আপনি একদিন আসবেন—এই বলার মধ্যে অনেক তফাত। নিখিল নেমন্তন্ন করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় নি। শুধু তাই নয়, অলোক ব্যানার্জিকে আজ দেখে সে খুশী হয়নি। শান্তা আর অলোকের মধ্যে কথা হয়। তাকে স্বামী সেজে পাশে সারাক্ষণ বোকা বোকা ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তাছাড়া ভদ্রলোকের যে রকম প্রেমে পড়ার বাতিক, তাতে বেশী প্রেম জমিয়ে ফেললেই মুশকিল। দার্জিলিং-এ ছুটির সময় সে এ ব্যাপারটাতে মজা পেয়েছিল—কলকাতায় নানা কাজের ঝামেলায় এসব ঠিক সহ্য করা যায় না। কোনো

ভদ্রলোক কি তার স্ত্রীকে সব সময় পাহারা দিতে পারে? তাছাড়া, কলকাতায় শান্তার তো পুরনো দিনের দু'তিন জন বন্ধু আছেই— দার্জিলিং-এর বন্ধুকে তার কলকাতায় দরকার নেই।

নিখিল আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিল। অলোক যদিও একবার বলেছে যে সে কলকাতায় ফার্ণ রোডে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে কিন্তু সেখানে তাদের একবারও যেতে বলেনি। ভদ্রলোকের স্ত্রী কি খুব কুৎসিত দেখতে?

বাড়ি ফিরে শান্তা বললো, ভদ্রলোক বেশ মজার, তাই না? সবসময় এত বেশী বেশী ভদ্রতা দেখাতে চায় যে বোকা বোকা দেখায়!

নিখিল গম্ভীরভাবে বললো, ও দেখছি, এখনো তোমার প্রেমে পড়ে আছে।

শান্তা চোখ কুঁচকে হাসিমুখে বললো, তবে? তুমি ভাবো কি? এখনো লোকে আমার প্রেমে পড়ে!

নিখিলও না হেসে পারলো না। হাসতে হাসতে বললো, দুপুরবেলা যখন আমি বাড়ি থাকব না—তখন যেন না আসা শুরু করে! দেখো বাবা!

শান্তা নিখিলকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো, তুমি বড় অসভ্য।

আসবার আগেই আর একদিন নিখিলের সঙ্গে তার রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। ছুটির দিন, তবু নিখিলের অফিস ছিল। অফিস থেকে ফেরার পথে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে দেখলো, সঙ্গে একজন মহিলাকে নিয়ে অলোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিখিল আগে দেখেও কথা বলেনি – হয়তো ছেলেটি আর একটি প্রেমিকা জুটিয়েছে—এ সময় কথা বলতে গেলে বিব্রত হবে। মহিলাটি বিবাহিতা—বিবাহিতা মহিলাদের সঙ্গেই প্রেমে পড়ার ঝোঁক আছে ওর।

অলোক ব্যানার্জিই নিজে কথা বললো। ডেকে বললো, এই যে নিখিলবাবু, কি খবর?

আলাপ হলো। মহিলাটি অলোকের স্ত্রী। মনে হয় সাত আট

বছরের পুরনো বিয়ে—এর আগে যে অলোক নিজেকে অবিবাহিত হিসেবে পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছে, সে সম্পর্কে এখন আর তার মুখে কোনো লজ্জার চিহ্ন নেই। কোথাও বসে চা খাবার প্রস্তাব দিল অলোকই—কিন্তু নিখিলের তাড়া আছে। তখন ঠিক হলো, ট্যাক্সি পাওয়া তো একটা সমস্যা—সুতরাং একটা ট্যাক্সি পেলে তাতে ওরা একসঙ্গে যাবে। নিখিলের বাড়িই দূরে, নিখিল ওদের নামিয়ে দেবে।

অলোকের স্ত্রীর নাম মমতা, ভারী সরল আর ছেলেমানুষ ধরনের। খুব সহজেই আলাপ জমিয়ে নিতে পারে। নিখিলকে বললো, আপনাদের কথা ওর কাছে অনেক শুনেছি। আপনার স্ত্রী তো খুব সুন্দরী। একদিন নিয়ে আসুন না আমাদের বাড়ী।

নিখিল বললে, তার আগে আপনারা একদিন আসুন।

ট্যাক্সি পাওয়া গেল অতি কষ্টে। নিখিল সামনে বসতে যাচ্ছিল, অলোক বললো, না, না, আপনি ভেতরে আসুন। অনেক জায়গা আছে।

মমতা মাঝখানে বসলো, দু'পাশে দু'জন। কিছুক্ষণ গল্প করার পর নিখিল হঠাৎ লক্ষ্য করলো যে অলোক খুব কম কথা বলছে। মাঝে মাঝে হুঁ হাঁ দিয়ে যাচ্ছে শুধু। অথচ দার্জিলিং-এ দেখছে, তার সুন্দর কথার ফোয়ারা ছোটে, এমন কি এ কথাও বোঝা যাচ্ছে, অলোক তার স্ত্রীকে একটু একটু ভয় পায়।

নিখিল হঠাৎ দুম করে মমতাকে বলে ফেললো আপনি ভারি সুন্দর সেণ্ট মেখেছেন তো। চমৎকার গন্ধটা।

মমতা একটু লজ্জা পেল। নিখিল তাকালো অলোকের দিকে। অলোকের মুখখানা উদাসীন ধরণের। ভূমিকা বদলে গেছে—অলোক এখন আর প্রেমিক নয়, সে স্বামী। যে-কোন স্বামীর মতনই গো-বেচারা ভঙ্গিতে সে অন্য লোকের মুখে স্ত্রীর প্রশংসা শুনতে বাধ্য হচ্ছে।

ব্যাপারটায় নিখিল এত উৎসাহ পেয়ে গেল যে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে মমতাকে বললো, শুনুন, সামনের সোমবার আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভারসারি। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়িতে আপনারা

খাবেন। আসতেই হবে কিন্তু, বুঝলেন!

বাকিটা রাস্তা শিখিল আর মমতাই শুধু কথা বলে গেল। অলোকের আর কোন উৎসাহ নেই, সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সিগারেট টানতে লাগলো অন্যমনস্কভাবে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সাইডিং

টিফিনের সময় সোমনাথ বললে, 'আমার মনে হয় যুথিকা তোর প্রেমে পড়েছে।'

যুথিকা আমাদের নতুন টাইপিস্ট। এই মাসখানেক হল চাকরি পেয়েছে। শ্যামবর্ণা কিন্তু মুখটি ভারি মিষ্টি। দেহটিও মন্দ নয়। না লম্বা না বেঁটে। মাথায় অনেক চুল, তা না হলে অত বড় খোঁপা হয় কি



করে। চোখে সোনালী ফ্রেমের ফিনফিনে চশমা। হাসলে গালে টোল পড়ে। সামনে দিয়ে চলে গেলে হৃদয়ে দোলা লাগে। অফিসে আরও মেয়ে আছে তবে তাদের কেউ না কেউ দখল করে বসে আছে। যেমন সোমনাথ রেবাকে। একমাত্র যুথিকাই ফ্রি আছে। আর অপর পক্ষে

আমরা দুজন, আমি আর বিধান। বিধানের সম্প্রতি ফ্লু হয়েছে। অফিসে আসছে না।

'কি করে বুঝলি?'

'টাইপ করতে করতে মাঝে মাঝেই তোর দিকে তাকিয়ে থাকে।'

আমি যেখানে বসি তার পেছনেই বিশাল একটা জানলা। সেই জানলায় হাওড়ার পোল আটকে আছে। যুথিকা হয়ত পোলটাই দেখে। মেয়েরা অত সহজে প্রেমে পড়বে বলে বিশ্বাসই হয় না। বহুত কাঠখড় পুড়িয়ে তবে প্রেম! প্রেম কি যাচিলে মেলে, আপনি উদয় হয় শুভ যোগ পেলে।

'আমার দিকে তাকায় না আমার পেছনের হাওড়ার পোলের দিকে তাকায়?'

'তোর দিকেই। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই কেমন ঘাবড়ে যায়।'

'ঠিক বলছিস?'

'ডেড সিওর।'

হতেও পারে। সোমনাথ ভেটারেন প্রেমিক। প্রেম কা কচে। হিন্দি ছবিতে এইরকমই যেন কি একটা বলে। মেয়েছেলে একসপার্ট। মেয়েদের চোখে চোখ রেখে মনের গভীরে ঢুকে যেতে পারে। কথায় বলে, এই সংসার সমুদ্রে এমন কোন মেয়ে নেই যাকে আমার চারে ভেড়াতে না পারি! বলে বলে লটকে আনব।

সেই সোমনাথ যখন বলছে তখন সত্যিই হয়ত যুথিকা আমার প্রেমে পড়েছে।

'আমার এখন তাহলে কি করা উচিত!' প্রশ্নটা করে কেমন যেন বেখাপ্পা লাগল! মেয়ে যেন প্রথম গর্ভবতী হয়ে ডাক্তারের পরামর্শ চাইছে।

সোমনাথ গম্ভীর মুখে বললে, 'নট ব্যাড। মেয়েটা ভালই। পটাতে পারলে সহজেই পটবে। তবে প্রেম আর মামলা মকর্দমা একই নেচারের জিনিস। সময় দিতে হবে। ভাল খেলোয়াড়ের মত

খেলতে হবে, খেলাতে হবে। তোকে একটু স্মার্ট হতে হবে। এই ম্যাদামারা, ভিজে বেড়াল ভাবটা সামলাতে হবে। বি এ সোডা ওয়াটার বট্‌ল। মুখ খুললেই ভাব আর ভাষার গ্যাঁজলা বুজবুজ করে বেরোতে থাকবে।'

'কিন্তু ব্যাপারটা ত এখনও মুখোমুখি হয় নি। চোখাচোখি হয়েছে বললেও ভুল হবে। চোখা হয়েছে চুখি হয়নি।

'ছাটস ট্রু। তোমার সেই চোখকে এবার কায়দা দেখাতে হবে। চোখে চোখ মারতে হবে।'

'ছি ছি ছি চোখ মারা খুব গর্হিত কাজ, লোফারদের কাজ। আমাদের পাড়ায় একটা মেয়ে আছে সে চোখ মারে বলে তার নামই হয়ে গেছে চোখমারা মিনু। ও ভাই আমি পারব না। ভীষণ শক্ত কাজ। একটা চোখ খোলা রেখে আর একটা চোখ পিচিক করে বোজান।'

'আরে সে চোখ মারা নয়। এ হল নজরোকা তীর মারে কষ কষ কষ এক নেহি, দো নেহি, আট নও দশ। স্ট্রেট তাকিয়ে থাকবি প্রেমিকের পাওয়ারফুল দৃষ্টিতে। বিবেকানন্দের চোখ, মজনুর হৃদয় এই হল প্রেমিকের অ্যানাটমি।'

আমরা দুজনে পাশাপাশি বসে কথা বলছি। চা দিয়ে গেছে চা খাচ্ছি। ওদিকে আমাদের আলোচনার সাবজেকট উল্টো দিকের দু সার টেবিলের ওপারে বসে খুট্‌স খুট্‌স করে টাইপ করে চলেছে। সোমনাথের কথা শোনার পর আমি একবারও ওদিকে তাকাই নি। যুথিকার পাশে বকুল, বকুলের পাশে রমা, রমার পাশে আশা। সারি সারি যুবতী, যৌবন যায় যায় এমন সব মহিলা। সকলেরই কিছু না কিছু অ্যাফেয়ারস আছে।

সোমনাথ বললে, 'তোর ড্রেসটাও পালটাতে হবে। এই মালকোঁচা মারা ধুতি আর দাদু মার্কা শার্ট চলবে না। কেমব্রিকের পাঞ্জাবি গোটা চারেক বানা। স্টিম লণ্ড্রিতে কাচাবি। তিন দিনের বেশি পরবি না।'

'বেশ কস্টলি হয়ে যাবে না?'

'তা একটু হবে ভাই। প্রেম আর ব্যবসায় 'ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেণ্ট কিছু থাকবেই। বিনা পয়সায় হয় না। সে হয় মেয়েছেলেদের। মেয়েরা হল রিসিভার। আমরা দিয়ে যাব ওরা নিয়ে যাবে।'

'কি দেবে?'

সোমনাথ বেমক্কা প্রশ্ন শুনে রাগরাগ মুখে তাকাল।

'তুমি শালা জাননা কি দেবে? যা দেবার তাই দেবে। প্রেম পাকলে বিয়ে হবে। বিয়ে হলে বলতে পারবি বুক ফুলিয়ে লাভ ম্যারেজ। লাভ ম্যারেজে একটা ছেলের ইজ্জত কত বেড়ে যায় জানিস! লাভার হল হিরো, টক অফ দি টাউন।'

আমি একটু ঘাবড়ে গেলুম। প্রেম এবং বিবাহ। প্রেম জিনিসটা মন্দ নয়; কিন্তু বিয়ে। যুথিকার সঙ্গে বিয়ে মানে অসবর্ণ বিবাহ। মেরে ফেলবে। বাড়ি থেকে লাথি মেরে দূর করে দেবে। ত্যজ্যপুত্তুর করে দেবে। আমার কোষ্ঠীটাও আবার তেমন ভাল নয়। বদনামের যোগ আছে। চরিত্র নাকি চোট খাবে।

'আচ্ছা সোমনাথ শুধু প্রেম হয় না ভাই, বিয়ে ফিয়ে বড় ঝামেলা ব্যাপার। ওটা এভয়েড করা যায় না?'

'যায়, তবে কিছু স্টীকি মেয়ে আছে, আঠাপাতার মত গায়ে লেপটে যায়, ছাড়ান যায় না।'

'যুথিকাকে তোর কি মনে হয়!'

'আর একটু স্টাডি করে বলব। তবে জেনে রাখ প্রেমে অনেক হোঁচট থাকে। কটা প্রেম ম্যাচিওর করে রে! হাতে গোনা যায়। আমাদের ইনসিওরেনসের মত। প্রিমিয়াম ল্যাপস করবেই। কেস কঁ্যাচ। ভেরি ডিফিকালট সাবজেক্ট। মেয়েরা প্রথম প্রেমে ধাত পাকায়, দ্বিতীয় প্রেমে খেলা করে, তৃতীয় প্রেমে দাগা খায় তারপর যখন দেখে যৌবন যায় যায় তখন নাছোড়বান্দা হয়ে ঝুলে পড়ে। বি... ভয়ে পেছিয়ে যাসনি। সিমটম যখন দেখা গেছে তখন ব্যাপার নিয়ে একটু ড্রিবল কর।'

'কি ভাবে করব বলবি ত?'

'ও কাজ করতে করতে যখন তখন তাকাবি। চোখে চোখ ঠেকলে উদোবক্কার মত ভয়ে চোখ নামিয়ে নিবিনা। ধরে রাখবি। আস্তে আস্তে সময় বাড়াবি। চোখে চোখে হাসবি।'

'চোখে হাসব কি রে! লোকে ত মুখেই হাসে!'

'আজ্ঞে না স্যার। প্রেমিকের হাসি চোখে। রোজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করবি।'

'ভয় করে।'

'কি ভয় করে? কাকে ভয় করে? ভয়ের কি আছে রে। প্রেমে আর রনে ভয় পেলে চলবে না।'

'আমাদের পাড়ার মধুকে একটা মেয়ে একবার জুতো মেরেছিল। মধুর অপরাধ সে মেয়েটাকে দেখলেই মুচকি মুচকি হাসত।'

'মধু ইডিয়েট।'

'ইডিয়েট! কেন ইডিয়েট!'

'প্রথমে চোখে চোখে সইয়ে নিয়ে তারপর হাসতে হয়। দেওয়ালে পেরেক ঠোকা। প্রথমে ঠুকুর ঠুকুর তারপর ঠকাস ঠকাস।'

'যদি আবার ঠকে যাই!'

'ঠকে যাই মানে?'

'এই ত তিন চার দিন আগে। আমি যাচ্ছি, উলট দিক থেকে একটা মেয়ে আসছে। পাড়ারই মেয়ে। মুখ চেনা। হঠাৎ হাসল। আমিও হাসলুম। আমি হাসতেই তার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। খুব নার্ভাস হয়ে গেলুম। ভয়ে ভয়ে পেছন ফিরে তাকালুম। আমাকে দেখে হাসে নি। সে হেসেছে আমার পেছনে একটা ছেলে আসছিল তাকে দেখে। মনটা এত খারাপ হয়ে গেল মাইরি! আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে কি হয়েছিল! মেয়েটা এত নিষ্ঠুর! কুকুরের মত। ওয়ান মাস্টার ডগ।'

সোমনাথ সিগারেট খেতে খেতে বলল, 'ও রকম একটু আধটু মিসফায়ার হবেই। ভাল শিকারীর বন্দুক থেকেও মাঝে মধ্যে শিকার

ফসকে যায়। প্রেমের পেছনে চোখ নেই। সাকসেসের রাস্তা হল লিপ বিফোর ইউ লুক। জহর ব্রতের মত, জয় মা বলে ঝাঁপ মার আগুনে।'

সোমনাথ মেয়ে মহলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সিগারেট টানছে। যুথিকা বকুলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। একদিন আমার সঙ্গেও হয়ত হেসে হেসে ওইভাবে কথা বলবে? জলজ্যান্ত একটা মেয়ে! চুল, খোঁপা অাঁচল। ভাবা যায় না। ভেতরটা কিরকম গুড়ুগুড়ু করে উঠছে। প্রেমের উপন্যাসে যা পড়েছি তা এবার সত্য হবে। হবে তো?

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে চেপে ধরে সোমনাথ উঠে দাঁড়াল। আমার মাথার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কি দেখছে রে বাবা! লোকে হাত দেখে, কপাল দেখে, মুখ দেখে। মাথা দেখে বলে জানা ছিলনা। সোমনাথ অ্যাসট্রলজি করে শুনেছি। অবশ্য নিজে কখনও সামনে হাত ফেলে পরীক্ষা করে দেখিনি। অ্যাসট্রলজি না হেয়ারোলজি!

সোমনাথ হাতের একটা আঙুল আমার মাথার চুলে ঠেকিয়েই চাটনি চাখার মত করে তুলে নিল। 'ইস হি হি, তুই চুলে তেল মাখিস? থার্ডক্লাস। কবে যে তুই মানুষ হবি! নো তেল। চুলে তেল মেখে প্রেম হয় না। প্রেম হল ফুরফুরে ব্যাপার। চুল ফুরফুরে, মন ফুরফুরে, প্রেম ফুরফুরে।'

সোমনাথ চলে গেল। আজ আবার ময়দানে খেলা। খেলার মাঠে যাবে। ঠিক ম্যানেজ করে অফিস কাটবে। আমাদের অত সাহস নেই। সাহস না থাকলে পৃথিবীতে কিছু করা যায় না। কৃতদাস হয়ে অফিসে ফাইল রগড়াও। একবার আড়চোখে যুথিকার দিকে তাকালুম। না আমার দিকে তাকিয়ে নেই। মাথা নীচু করে টাইপ করছে। কানের দুল নড়ছে টিনিটিনি করে। কে কার প্রেমে পড়েছে! আমি যুথিকার না যুথিকা আমার! ভেবে লাভ নেই। দেখা যাক কি হয়।

টিফিনের পর দেখা গেল, ছোট্ট লেডিজ রুমাল বের করে ঠোঁটের ঘাম মুছতে মুছতে যুথিকা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ মাথা ঠোকাঠুকির মত চোখে চোখে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে চোখ নামিয়ে নিলুম। চোখ নামালেও মন ঘুড়িটা যুথিকার আকাশেই লাট খেতে লাগল। কমলালেবু রঙের শাড়ি পড়েছে। সাদা ব্লাউজের হাতা ওপর বাহুতে খাপ হয়ে বসে আছে? একপলকের দেখা? কি জানি, আমাকে দেখছিল, না আমার পেছনে আকাশের টঙে হাওড়ার পোলের সদ্য রঙ করা ঝলমলে মাথা? সোমনাথ বলে যায় নি কতক্ষণ অন্তর অন্তর দেখা উচিত। পরেরবার যখন চোখ তুলে তাকালুম যুথিকা নেই। শূন্য চেয়ার। যার তেরিকা গেল কোথায়! এখন ত সবে তিনটে। ছুটি হতে পাক্কা দুঘণ্টা বাকি। এর নাম প্রেম! গঁদের আঠার মত চেয়ারে যদি আটকেই না রইল তাহলে আর প্রেম হল কি! বড় অভিমান হল। সোমনাথ বলার পর থেকে আমি একবারও সিট থেকে উঠিনি। সামান্য অদর্শনে প্রেম যদি চটকে যায়? সব সময় চোখের সামনে নিজেকে হাজির রেখেছি। দুয়ারে খাড়া এক যোগী। ধুর প্রেম ফেম সব ফল্‌স। আসলে ক্লান্ত চোখটাকে নীল আকাশে একটু খেলিয়ে নেয়। আমার দিকে তাকাবে কেন? আমি কি সিনেমার হিরো! মেয়েরা হয় হিরোর প্রেমে পড়ে না হয় ভিলেনের! আমি ত কোনটাই নয়। মাছি মারা কেরানি।

॥ দুই ॥

আমার একটু সকাল সকাল অফিসে আসা অভ্যাস। বাসে ট্রামে ভিড় কম থাকে। তাছাড়া চড়া রোদে রঙ কালো হবার ভয় থাকে না। দরজা দিয়ে ঢুকতেই বুকটা ছাঁত করে উঠল। যুথিকা এসে গেছে। কেউ কোথাও নেই। বহু দূরে নৃপেনবাবু টেবিলে জোড়া হাঁটু ঠেকিয়ে উট হয়ে খবরের কাগজ পড়েছেন। একটা পিওন খালি এসেছে। পকেট থেকে একগাদা কাগজ বের করে একমনে সারা মাসের ধুসর হিসেবে ব্যস্ত। আড়চোখে যুথিকাকে একবার দেখে নিলুম। বেশি দেখব না। কালকের ঘটনায় আমার ভীষণ অভিমান হয়েছে। কথা বললে বন্ধ করে দিতুম। বলিনা বলে বেঁচে গেল।

যুথিকা নীচু হয়ে টেবিলের নীচের ড্রয়ারটা ধরে টানাটানি করছে। সরকারী টেবিল। মাঝে মাঝেই ড্রয়ার আটকে যায়। আমাদেরও আটকায়। লাথালাথি করলে তবে খোলে। খেলোয়াড় না হলে যেমন প্রেম হয় না, সরকারী চাকরিও করা যায় না। সবে একমাস চাকরি হয়েছে মহিলার এখনও অনেক কিছু শিখতে বাকি।

হঠাৎ মনে হল এই সুযোগ। নাও অর নেভার। পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

'কি খুলছে না? আটকে গেছে?

উঃ যুথিকা ওই নিচু অবস্থাতেই ঘাড় বেঁকিয়ে খোঁপা লতপতিয়ে আমার দিকে তাকাল। কি মনোরম, কি অপূর্ব, কি অসাধারণ!

'দেখুন না খুলছে না। চাবি ঘুরে যাচ্ছে অ চ ··

'একেই বলে কলের গ্যাঁড়াকল!' বাঃ বেশ বলেছি। স্ট্রেট বলেছি একটুও আটকায়নি।

'দেখি সরুন। এসব লোয়েস্ট কোটেশানের মাল। খোলার কায়দা আছে।'

যুথিকা সোজা হল। এতক্ষণ হেঁট হয়েছিল। আহা মুখটা বেগুন হয়ে গেছে। আমি উবু হয়ে চেয়ারের পাশে বসে পড়লুম। ধুতি পরার ঐ সুবিধে। আমার মুণ্ডুর একবারে পাশেই যুথিকার জোড়া কোল। সেন্টের কি প্রসাধনের গুমোট গন্ধ। ফ্লোরে শাড়ির ঘের ছড়িয়ে আছে। ভেবেছিলুম আমাকে বসতে দেখে ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধুর মত একটা ভাব করে সরে বসবে। না সে সব কিছুই করল না। একেবারে সহজ। যেমন ছিল তেমনিই বসে রইল জমাটি হয়ে। উঃ সোমনাথ, মার দিয়া কেল্লা। যুথিকার একটা হাত তখনও চাবির ওপর।

'কই দেখি।'

গলাটা একটু কাঁপা কাঁপা মনে হল। হাতে হাত ঠেকল। যেন শক খেলুম। ঠিকই, মেয়েদের শরীরে বিদ্যুৎ আছে। ঠেকলেই ঝটাস করে মেরে দেয়। প্রথম প্রথম ডি সি। তারপর কনভার্টারে পড়ে

এ সি! আঁকড়ে মাঁকড়ে ধরে।

চাবিটা বোঁ করে ঘুরে গেল। বাঃ বেশ কল তো! জয় মা, দেখো মা, খুলে দাও মা। প্রেম একবারই জীবনে আসে। বেইজ্জত করে দিও না। খুলতে পারলেই হিরো। ডানদিকে ঘোরাচ্ছি আর কায়দা করে টানছি। আমার ড্রয়ারটারও এই একই অবস্থা ওয়ান, টু, থ্রি। কি গুরুবল! খুস করে খুলে গেছে।

'এই নিন।' আমার সারা মুখে বিজয়ীর হাসি। দাও শ্যামা সুন্দরী, গলায় বরমাল্য পরিয়ে দাও। এত বড় একটা দুরূহ কাজ করে দিলুম। হরধনু ভঙ্গের মত ব্যাপার।

'খুলেছে?' যুথিকা ঝুঁকে পড়ল। ডান গালটি আমার মুখের কাছে। ধন্যবাদ টন্যবাদ দেবার কোনও ইচ্ছেই নেই। কাগজ, কার্বন বের করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল! জাত টাইপিস্ট কোথায় প্রেম? উঠে দাঁড়ালুম। পা ব্যথা হয়ে গেছে। আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি! এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল, মনে কোন রেখাপাত করল না। কি মনরে বাবা! মা কালীর মত পাষাণী! এদিকে বকুল এসে গেছে। আমাকে যুথিকার চেয়ার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেছে। আমার কৃতিত্বটা জানিয়ে দেওয়া দরকার।

'বুঝলেন আটকে গিয়েছিল। ঘোরে কিন্তু খোলে না।'

বকুল হাতব্যাগ রাখতে রাখতে বললে, 'কি আটকে ছিল?'

আমাকে উত্তর দিতে হল না, যুথিকা টাইপ মেশিনে কাগজ আর কার্বন পরাতে পরাতে বললে, 'ড্রয়ারের চাবি।'

বকুল বললে, 'মুখপোড়া ড্রয়ার, ভেঙে ফেলে দেনা?'

আমি হেলে দুলে ধীরে সুস্থে বেশ খেলে খেলে নিজের সিটে গিয়ে বসলুম। চোখ বুজিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভাববার মত ব্যাপার। এর পর কি! সোমনাথ আসুক। বেলা বারোটার আগে আসবে না। ততক্ষণ একটু কাজের অভিনয় করা যাক। তাড়াতাড়ি একটা প্রমোশন চাই। বলা যায়না, যদি ফেঁসে যাই বিয়ে করতে হবে। বিয়ে করলে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে। তখন এ মাইনেতে সংসার চলবে না।

সোমনাথ এসে গেল। বসতে না বসতেই শুরু করে দিলুম। সিগারেট খেতে খেতে মন দিয়ে শুনল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এইবার ? হোয়াট নেকসট।' বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সোমনাথ বললে, 'কত আছে ?'

'কি কত আছে ?'

'হার্ড ক্যাশ ?'

সে আবার কি ! হার্ড ক্যাশ দিয়ে কি হবে ? ছ দশ টাকা পড়ে আছে ! মাস শেষ হতে চলেছে !

'গোটা পনের টাকা পড়ে আছে। কোন রকমে মাসটা চলবে।

'এতে হবে না রে ! তোর একটা প্রেম ফাণ্ড তৈরী করতে হবে। মিনিমাম পাঁচশ নিয়ে নামতে হবে।'

পাঁচশো ! অত টাকা পাব কোথা থেকে ?'

'কো-অপারেটিভ থেকে লোন নে, আমি গ্যারান্টার দাঁড়াচ্ছি '

'ধার করে প্রেম !'

'শাস্ত্রেই আছে ঋণ করে বি। প্রথমে পাঁচশো তার পর কেস বেশ জমে গেল কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে ! তোর পাড়ায় লাইব্রেরী আছে !'

'হ্যাঁ আছে।'

'মেমবার ?'

'এক সময় ছিলুম। চাঁদা বাকী পড়ায় ছেড়ে দিয়েছি, একটা বই মেরে দিয়েছি।'

'বেশ করেছিস। আজই আবার মেমবার হয়ে যা।'

'লাইব্রেরীর মেমবার হবার সঙ্গে প্রেমের কি সম্পর্ক ! লেখা পড়া করতে হবে না কি !'

'আজ্ঞে না। অফিসের মেয়ের বই পড়তে ভীষণ ভালোবাসে। কালকে তুই ... ...'

কালকে তুই কি করবি !'

'তুই একটা বই হাতে, মলাটের দিকটা সামনে করে যুথিকার

সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করবি, হেসে জিজ্ঞেস করবি—কি ড্রয়ার আটকে গেছে নাকি !'

'তারপর ?'

তারপর বইটা হল টোপ। কি বই দেখি ? ব্যস বইটা দিবি পড়তে। দিবি আর নিবি, নিবি আর দিবি। দেবে আর নেবে মেলাবে মিলিবে।'

ভীষণ ভয় পাইরে ? ছাত্র জীবনে এক পড়ুয়া মেয়ের পাল্লায় পড়েছিলুম। বইয়ের পর বই দিয়েই যাই ফেরত আর পাইনা। সাহস করে চাইতেও পারিনা। বই পেয়ে খুশি খুশি ভাব। মেয়েদের খুশি করে ছেলেরা কি রকম আনন্দ পায় ভাব ! বই ফেরত চাইলে যদি রেগে যায় ! সেই ভয়ে মাইরি দিয়েই যাই। আমি দিতে থাকি সে নিতে থাকে। হাতে তেমন পয়সাও নেই। জলখাবারের জন্য রোজ এক আনা বরাদ্দ। তিরিশ দিনে তিরিশ আনা। পাঁচটা রোববারে পাঁচ আনা বাদ। তার মানে পঁচিশ আনা। এদিকে যাদের যাদের কাছ থেকে বই এনে পড়তে দিয়েছি তারা বই চেয়ে চেয়ে না পেয়ে খেপে বোম। একদিন সবাই মিলে রাস্তায় চেপে ধরে বেধড়ক ধোলাই দিলে। তিনমাস জলখাবার বন্ধ রেখে যার যার বই কিনে ফেরত দিলুম। আর তারা কুমকুম।'

'কুমকুমটা কে ?

'আরে সেই বই মারা মেয়েটা। কি জিনিস মাইরী। পরে জেনেছিলুম ওই মেয়েটা আমাদের মত এক একটা বোকা ছেলে ধরে ধরে বই মেরে মেরে নিজের বাড়িতে একটা লাইব্রেরী তৈরি করছিল, একটু মিষ্টি হাসি, সুর করে টেনে কথা, উয়ুয়ু কি সুন্দর, কি সুন্দর, ব্যস আমরা কাত। গিলোটিনে মাথা পেতে বে হেড।'

সোমনাথ ফুস্ করে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে ; তোর প্রেম নেই। তোর দ্বারা প্রেম হবে না। শালা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনেদের মত মেন্টালিটি। প্রেমিক আর যোগী একই মনের মানুষ। একজন মেয়ে পাগল আর একজন ব্রহ্ম পাগল। দুজনেই পাগল।

পাগল না হলে প্রেম হয় না। শ্যাম পাগল বুঁচকি আগল হারা, তাদের জন্যে সংসার, হিসেবের খাতা, বগলে ছাতা, মুতো কাঁথা।'

'তুই বুঝছিস না, আমার এখন এক্সট্রা খরচ করার মত টাকা নেই ভাই। এক একটা বইয়ের দাম আট টাকা, দশ টাকা, পঁচিশ টাকা। মেরে দিলেই হাতে হ্যারিকেন।'

'তবে হাঁ করে বসে থাক। ওদিকে বিধান ভিড়ে পড়ুক।'

সোমনাথ আর কথা না বাড়িয়ে একটা পুরোন বস্তু পচা ফাইল খুলে বসল। ওরকম ফাইল আমার টেবিলেও গোটা কতক আছে। একটা খুললেই সারাদিন হেসেখেলে চলে যাবে। বাইরের আকাশে চাঁপা ফুলের মত রোদ খেলে যাচ্ছে। ফুরফুরে বাতাস। এমন দিনে কি মানুষের দুঃখ কষ্টের ফাইল খুলে বসে থাকা যায়। রাজ্যের আরজি। পশ্চিমবঙ্গের সমাজ চিত্র ছুটো বাদামী মলাটের তলায় যতদিন চাপা থাকে ততদিনই ভাল। কল্পনায় যুথিকাকে নিয়ে বোটানিকসে ঘুরে বেড়াই।

সোমনাথ চিঠি ড্রাফট করছে। আজ দেখছি কাজে খুব আঠা! দেশের উন্নতি না করে ছাড়বে না। ওদিকে প্রসূন গিয়ে যুথিকার টেবিল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। মুক্তোর মত দাঁত বের করে খুব হাসছে। যুথিকাও হাসছে। কোনও মানে হয়! প্রসূন আবার ভাল রবীন্দ্র সংগীত করে। চাকরিতে যেমন প্রতিযোগিতা প্রেমেও তেমনি। কোনও মেয়েয় সঙ্গে একা প্রেম করার উপায় নেই। ফোড়ে, ফেউ জুটবেই। কেকের টুকরো। ডিশে রাখলেই পিল পিল পিঁপড়ে। এখুনি এক কলি গান গেয়ে কেল্লা দখল করে নেবে। দাঁত বড়, গাল ভাঙা, চোখ বসা, এসবের কোনটাই যুথিকার চোখে পড়বে না। গান গাইতে পারে, বাস সাতখুন মাপ। আমি নাচ দেখাব। ভাঙড়া নাচ। ধূর্ত প্রসূনটা আচ্ছা হারামজাদা! কিছুতেই নড়তে চাইছে না।

'সোমনাথ!'

'বল।'

'গান শিখব ?'

'গান শিখে কি করবি ?'

'ওই দেখ, প্রসূন ব্যাটা পাকাধানে মই দিতে গেছে।'

'যাক না, তাতে তোর কি ? ভ্যাকুয়ামে প্রেম করবি ভেবেছিস। ফেউএর পর ফেউ আসবে। লড়ে জিততে হবে। রোপ ওয়াক। গেল গেল, এল এল। কোন দিন ঘুড়ি উড়িয়েছিস ? তুমি ত শালা জীবনে কিছুই করনি। শুধু জন্মে বসে আছে, প্রেম হল ঘুড়ির প্যাঁচ। কাটতে থাক, কাটতে থাক একসময় ফাঁকা নীল আকাশ, প্রাণ খুলে ওড়া। নীলাকাশের সঙ্গে প্রেম।'

সোমনাথ আবার খসখস করে চিঠি লিখতে শুরু করল। আমি টেবিল থেকে উঠে পড়লুম। ওদের পাশ দিয়ে একবার চলে যাই। নন প্লেয়িং ক্যাপটেন হয়ে বসে থাকলে চলবে না। যা ভেবেছি তাই। প্রেমে পড়লে সিকসথ সেনস বেড়ে যায় প্রসূন বলছে, 'এ মণিহার আমার নাহি সাজে রেকর্ডটা আমার কাছে। কালই এনে দেবো ' ঢং করে একটা সিকি পায়ের কাছে পড়ল। উঃ কি লাক ! যুথিকার পয়সা ব্যাগ থেকে ছিটকে এসেছে। তাড়াতাড়ি তুলে দুবার ফুঁ মেরে হাসি হাসি মুখে এগিয়ে গেলুম,

'আপনার পয়সা।'

প্রসূন হাত বাড়িয়ে সিকিটা নিয়ে পকেটে ফেলে গম্ভীর মুখে বললে,

'ধন্যবাদ। হ্যাঁ হ্যাঁ আকাশ ভরা সূর্য তারাটাও আছে। কি নেই আমার কাছে !'

যাঃ শালা। কি বরাত। প্রসূনের পয়সা জানলে কে তুলত ! পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যেতুম। প্রেম তুমি আমাকে উদার কর। বেশ জমিয়ে প্রেমে পড়ার আগেই কেন হিংসে এসে যাচ্ছে। কেন মনে হচ্ছে প্রেম বড় এক তরফা। প্রেমে গলি কি ওয়ান ওয়ে ? হৃদয়ের গাড়ি ঢোকে। ঢুকে আটকে যায়। বেরোতে গেলে ব্যাক করে বেরিয়ে আসতে হয়। আপাতত ব্যাক করে নিজের জায়গায়

চলে যাই। মাথায় কিছু আসছেনা। সোমনাথই ভরসা।

মুখ খোলার আগেই সোমনাথ বুঝে গেছে।

'প্রসূন লাইন দিয়েছে। দেখেছি। তোর চেয়ে ভাল ক্যানডিডেট। শীতকালে কাশ্মিরী শাল গায়ে দেয়। পাঞ্জাবিটা দেখেছিস, চিকনের কাজ করা। ভাল গান গায়। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বেশ শক্তিশালী। বেশ কায়দা করে লড়তে হবে রে! মেয়েছেলের মন পদ্মপাতায় জল। যাক, তোর আর একটা সুযোগ করে দি। এই চিঠিটা টাইপ করতে দিয়ে আয়। বলবি ডবল স্পেসিং, দুপাশে মার্জিন। আর ফট করে জিজ্ঞেস করবি, বিকেলে কি করছেন?'

'যদি বলে কেন? কেনটা আবার যদি খুব চিৎকার করে বলে! পাশে যারা বসে আছে তারা যদি শুনতে পায়!'

'অ মোলো।' সোমনাথ মেয়েলী ভাষায় গালাগাল দিয়ে উঠল। 'রাশকেল যদি যদি করেই তোর জীবনটা যাবে। যদি ফদি আবার কি! জীবন হল ধর তক্তা মার পেরেক।'

'যদি বলে কেন!'

'আবার শালার যদি। বলবি সোমনাথ কোরবানীর টিকিট কেটেছে।'

'একেবারেই জামপ করে অতদূর!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একেই বলে বশিষ্ঠ অ্যাপ্রোচ। শেকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা। যা যা।' যুথিকাকে চিঠিটা টাইপ করার জন্যে দিতেই, সোমনাথের সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। সোমনাথ ইসারায় হাতের ভঙ্গী মুখের হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিল টাইপ। যুথিকা চোখের সামনে মেলে ধরে বললে, 'কি সাংঘাতিক হাতের লেখা!'

আমি অমনি ফট করে বলে ফেললুম, 'আমার হাতের লেখা খুব ভাল। মুক্তোর মত। বলে ফেলেই ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলুম। প্রেম মানুষকে জাহির করতে শেখায়। অহমটাকে খুঁচিয়ে তোলে। ভেরি ব্যাড।

যুথিকা বললো, 'দেখেছি। শিল্পী শিল্পী চেহারা, শিল্পী শিল্পী কথা

মানানসই লেখা।'

যুথিকার কথা শুনে পা কাঁপছে। উরে বাব্বা, প্রেমের ঘণ্টা বেজেছে ঢং করে। মুখে কথা সরছে না। কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে ফিরে এলুম।

সোমনাথ বললে, 'কি হল? জিজ্ঞেস করেছিস? কি বললে? বিকেলে কি করছে?'

'দাড়া এক গেলাস জল খাই।'

'কেন? খিস্তি করেছে?'

জলের গেলাসটা নামিয়ে রেখে, হাত দিয়ে ঠোঁট মুছে ফিস ফিস করে বললুম,

'মরে গেছি। ফিনিশ। বুকটা কেমন করছে।'

'পেটে উইণ্ড হয়েছে। একটা পান খা।'

'ভাগ শালা। বুকে হিল্লোল বইছে, হিল্লোল।'

'কেন রে। চোখ মেরেছে!'

'মোর ড্যান ড্যাট। তীর মেরেছে। তোর হাতের লেখার নিন্দে করে আমায় বললে, যেমন আপনার শিল্পী শিল্পী চেহারা, ঠিক সেই রকম আপনার কথাবার্তা, ঠিক সেই রকম আপনার মুক্তোর মত হাতের লেখা।'

'এইতেই তোর বুক ধড়ফড়। ওর গদিতে তোকে দিয়ে খাতা লেখাবে না কি! তোর গালে হাত দিলে কি করবি। দম ফেল করে মরে যাবি। শোন, কোনটা মেয়েদের কথা আর কোনটা কথার কথা আগে বুঝতে শেখ। যা জিজ্ঞেস করে আয়।'

এবার আমার সাহস বেড়ে গেছে। বরফ যখন গলতে শুরু করেছে তখন আর ভয় কি। নদী বইবে কুলু কুলু। পাখি গাইবে গান, পিউ কাঁহা। গড়গড়িয়ে চলে গেলুম।

'আজ বিকেলে কি করছেন?'

'ক্লাস আছে।'

'কিসের?'

'স্টেনোগ্রাফার।'

'ও।'

সোমনাথের কাছে ফিরে এলুম। 'ওরে স্টেনোগ্রাফির ক্লাস আছে।'

'বলে আয় ক্লাসফ্লাস যাই থাক। আজ সিনেমা।'

আবার যেতে হল, 'ক্লাসফ্লাস যাই থাক, আজ সিনেমা। কোরবানী।'

'কোরবানী।' যেন লাফিয়ে উঠল। 'কে বললে?'

'গ্রেট সোমনাথ।'

'ঠিক আছে।'

সোমনাথকে এসে বললুম, 'সিনেমার কথায় যে মেয়ে না বলবে জানবি সে অসুস্থ। স্রী রোগে ভুগছে।'

সারাটা দুপুর পেটটা কেমন কেমন করতে লাগল। নার্ভাস ডায়েরিয়া। বেয়ারাকে দিয়ে দুটো ট্যাবলেট আনিয়ে খেয়ে নিলুম। বলা যায় না হলে বসে প্রকৃতির বেগ এসে গেলে লজ্জার এক শেষ হবে। একেই মেয়েরা গ্ল্যাডিয়েটার কিম্বা বুল ফাইটার কিম্বা কাউ-বয়দেরই ভালবাসে। আমার আবার একটু মেয়েলী ভাব। হরমোন খেয়ে পুরুষ পুরুষ হতে হবে।

দেখতে দেখতে বিকেল। সোমনাথের দু প্যাকেট সিগারেট উড়ে গেছে। অফিস প্রায় ফাঁকা। আমরা তিন জনে লিফটে করে নিচে নেমে এলুম। রাস্তায় সোমনাথ হাঁটছে আগে আগে। লিডার অফ দি টিম। পেছনে আমি। আমার এক কদম পেছনে যূথিকা। সোমনাথ আমাকে প্রেম করাতে নিয়ে যাচ্ছে। একেই বলে বন্ধুর মত বন্ধু। বন্ধু হো তো অ্যায়সা।

বাইরের আলোয় যূথিকাকে একটু বেশি শ্যামবর্ণ মনে হচ্ছে। হলেও খারাপ লাগছেনা। হাতে ফোল্ডিং লেডিজ ছাতাটা না থাকলেই ভাল হত। ছাতা হাতে তেমন রোম্যান্টিক লাগে না। যাকগে, যা করে ফেলেছে। সিনেমায় যাব বলে ত আর বাড়ি থেকে বেরোয় নি। বেরিয়েছিল অফিসে।

সোমনাথ ভস ভস করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আগে গটগট ক'রে চলেছে। স্টীম ইঞ্জিন চলেছে। আমরা যেন দুটো বগি। পেছন পেছন চলেছি লাফাতে লাফাতে। ইঞ্জিন যে দিকে যাবে বগিও সেই দিকে যাবে। ইঞ্জিন হেলেদুলে একটা নামজাদ রেস্তোরাঁর অন্ধকার গর্তে গিয়ে ঢুকল। বেশ মনোরম পরিবেশ। প্রেমের সুখপাখি এমন জায়গাতেই পাখা মুড়ে বসতে পারে। ফিসফাস, খুসখাস, ঘেঁষাঘেঁষি। চুল, চুড়ি গোঁফ, দাড়ি, ঘাড়, গলা, চিবুক সব একাকার।

সোমনাথ তখুব গাটাগটিয়ে মেয়ে বগলে ঢুকল। মেয়ে ঢুকল ছাতা বগলে। আমি ঢুকলুম কোঁচা বগলে। কিন্তু। কিন্তু আর যদিতেই আমার জীবনটা শোঁয়াপোকার মত কুঁকড়েই রয়ে গেল। প্রজাপতি আর হল না। কত বিল হবে কে জানে। টাকা কে দেবে! আমার পকেটে পনের টাকা পড়ে আছে।

সোমনাথের বাঁ পাশে যূথিকা। আমি বসেছি উল্টো দিকে একা। সোমনাথ মেজর জেনারেলের মত হাঁকল, 'ওয়েটার'। বাবা কি দাপট! 'মেনু প্লিজ' মেনুটা হাতে নিতে নিতে সোমনাথ বললে, 'জিরাপানি। সেট আবার কি রে বাবা! মেনুর ওপর আবছা চোখ বুলিয়ে পরের অর্ডার 'রোগনজুস। নান। স্যালাড। আইসক্রীম ভ্যানিলা।' মেনুটা ওয়েটারের দিকে ঠেলে দিল। হাতটা নিস্‌পিস্ ক'রে উঠল। একবার টেনে নিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল, কটাকার ধাক্কা। দেখার সুযোগ পাওয়া গেল না। নেভি ব্লু সুট পরা ময়ূর ছাড়া কার্তিকের মত ওয়েটার টুক করে তুলে নিয়ে আলোছায়া ঘেরা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

'তারপর ম্যাডাম!' সোমনাথ সব মেয়ের সঙ্গেই ম্যাডাম দিয়ে শুরু করে। এইটাই হল ওর টেকনিক। বিরাট পার্সোন্যালিটি, মেগালোম্যানিয়াক। ম্যাডাম বলে যূথিকাকে দেয়ালঠাসা করে বসল। ম্যাডাম টেবিলের ওপর হাত রেখে আঙুলে আঙুলে কিলিবিলি খেলছেন। নাকছাবি, চুল, চশমা, আলো, পড়ে চিক চিক করছে। স্বপ্ন, স্বপ্ন।

সোমনাথ হঠাৎ ছাতাটা যুথিকার কোল থেকে তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বললে, 'ফরেন?'

'হ্যাঁ ফরেন। আমার এক পিসতুতো দাদা আমেরিকা থেকে এনে দিয়েছে।'

সোমনাথ ছাতটা আবার যুথিকার কোলে খচর মচর করে গুঁজে দিল। মেয়েটা সোমনাথের হাতের স্পর্শে কেঁপে কেঁপে উঠল। উঃ ভাবা যায় না। সোমনাথের কি সাহসরে বাবা। মেয়েরা বোধ হয় এই রকম হাতকেই বলে অ্যাগ্রেসিভ হ্যাণ্ড। আমি একটা ভ্যাবাচ্যাকা জড়দগবের মত উলট দিকে বসে আছি। প্রেম ফ্রেম মাথায় উঠে গেছে। বেশ বুঝতে পারি প্রেমের মাঠে আমি এক নাবালক।

ঠক ঠক করে তিন গেলাস জিরাপানি ওয়েটার আমাদের সামনে নামিয়ে রেখে গেল। সোমনাথ বললে 'নে খেতে থাক। অ্যাপেটাইজার।'

পৃথিবীতে কত রকমের যে খাদ্য আছে, পানীয় আছে। এই পঁচিশটা বছর ধরে শুধু ভাত ডাল আর ডাল ভাত খেতে খেতেই জীবনে অরুচি ধরে গিয়েছিল। জিরাপানিতে চুমুক মেরে পঁচিশ বছরের বোদা মুখ ছেড়ে গেল। বিশেষ একটা সময়ে মেয়েদের স্বাদ না সাধ কি একটা হয় না! মনে হল আজ আমার তাই হচ্ছে।

খাবার এসে গেল? সে এক এলাহি ব্যাপার। ব্যাঙের মত ফুলো ফুলো নান না কি যেন ওই। মাঝখানে ঘি, কালো জিরে। রোগনজুস। স্যালাড। সোমনাথ গপাগপ খেতে শুরু করল। যুথিকাও কম যায় না। আমি মাঝে মাঝে আড় চোখে দেখছি। মনে হচ্ছে আমার সামনে বসে আছে জামাইবাবু আর দিদি। আমি যেন ছোট্ট শ্যালকটি। দুজনে বেশ জমে গেছে। কথা চলছে, হাসি চলছে। সোমনাথ মাঝে মাঝে বাঁ হাতে চামচে দিয়ে যুথিকার প্লেটে স্যালাড তুলে দিচ্ছে। কোলের ওপর ন্যাপকিন পেতে দিচ্ছে। সোমনাথের কাণ্ড দেখে আমার মুখ শুকিয়ে আসছে। হয়ে গেল আমার প্রেম। নদী এখন অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে।

আইসক্রীম এসে গেল। মাঝখানে আবার কায়দা করে পাতলা পিচ বার্ড গোঁজা। সোমনাথ বললে পিচবোর্ড নয়রে, ওটা বিস্কুট। ওকে ব'ল ওয়াফার। যুথিকা আদুরে গলায় বললে, 'আইসক্রীম খাব না। গলা ধরে যাবে।'

সোমনাথ বললে, 'কিচ্ছু হবেনা ম্যাডাম। ঠাণ্ডা ঘরে বসে আইসক্রীম খলে গলায় ঠাণ্ডা লাগে না।'

সোমনাথের কথা যেন বেদবাক্য। যুথিকা হেসে হেসে, খেলে খেলে আইসক্রীম খেতে লাগল। হাত ধোবার গরম জল এল বাটিতে। এক টুকরো লেবু ভাসছে। আমি ভেবেছিলুম গুরুপাক খাওয়া হল ত, তাই জির পানির মত লেবুপানি এসেছে। সোমনাথ বললে, 'মূর্খ একে বলে ফিঙ্গার বোল। লেবুটা হাতে চটকে দে। ইট কাটস দি গ্রিজ।' পেছন দিকে মুণ্ডু ঘুরিয়ে চিৎকার করে উঠল. 'বেয়ারা বিল।'

কি আদেশর সুর! এ সব ছেলে পৃথিবী শাসন করতে পারে। যুথিকা ত সামান্য মহিলা। বিল এল। আমার জিভেতে তালুতে আটকে গেছে। আমাকে দিতে হলে ঘড়ি খুলে দিতে হবে। না সোমনাথই পকেট থেকে এক গোছা নোট বের করল। ঠোঁটে সিগারেট বাঁকা। নাক ছুঁয়ে ধোঁয়া উঠছে চোখের সামনে দিয়ে। নাকের কাছটা কোঁচকান। চোখ ছুটো হয়ে আছে গ্রেট গ্যাম্বলারের তাসের চাল দেবার মত। বিল সমেত পঞ্চাশ টাকার একটা নোট প্লেটের ওপর ফেলে দিল।

রেস্তোর থেকে বেরোবার সময় যুথিকার পিঠে তবলায় তেহাই মারার মত করে আঙুলের তিনটে চাপড় মেরে বললে 'চল, চল।'

বাঃ ভাই। কত কায়দাই জান? আমার প্রেমিকার পিঠে তবলা বাজানো। আমার আর কি রইল। যুথিকা যে ভাবে তোমার বক্ষলগ্না, তৃতীয় চোখে দেখলে মনে হবে পারফেক্ট স্বামী-স্ত্রী।

রেস্তোরাঁর উলট দিকেই পান সিগারেটের দোকান। বরফের চাঙড়ার ওপর হলদে হলদে পান পাতা শোয়ান। বিশাল দোকান।

বিশাল আয়না। বোতলের জল। জর্দার গন্ধ। ধূপ জ্বলছে। সোমনাথ বললে, 'তিনটে মঘাই পান। একটায় কিমাপাতি জর্দা। আর এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আয়।'

'আমি পান খাই না।'

'তাহলে দুটো নিয়ে আয়।'

বুঝলুম এটা আমার ইনভেস্টমেণ্ট। সাড়ে তিন টাকা খসে গেল। যুথিকা পান চিবোচ্ছে আর ঠোঁট উলটে উলটে দেখছে কি রকম লাল হল।

সোমনাথ আমাকে ফুটপাথের একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বললে, 'শোন আমার কাছে দুটো টিকিট আছে। ব্যাপারটা তোর জন্যে প্রায় সড়গড় করে এনেছি বাকিটা সিনেমা হলে গিয়ে করব। একটু ইঙ্গি না করে দিলে তুই সামলাতে পারবি না। আমরা চলি কাল তোকে সব বলব। হয়ে এসেছে। যেটুকু বাকি আছে হলে হয়ে যাবে।'

সোমনাথ ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলেছে। পেছনে এবার একটা বগি। আর একটা বগি সাইডিং-এ পড়ে রইল। সেই বগির ভেতর কে একজন হই হই করে হেসে উঠল, মূর্খ মূর্খ। প্রেম বলে কিছু নেই। আছে লটকালটকি। আছে শানটিং।

"দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন ॥ ১ ॥"

"কুচ কর পরশনে আকুল মাধব
ভুজেভুজে বন্ধন কেল"